মেয়েলি পাঠ

সুতপা ভট্টাচার্য

২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

লেখিকার অন্যান্য বই :

কবির চোখে কবি
সে নহি নহি
কথাসাহিত্যের একলা পথিক : বিভূতিভূষণ
রোকেয়া
রূপ থেকে ভাবে

সম্পাদিত বই :

চিঠিপত্র (১৬)
বাঙালী মেয়ের ভাবনা জগৎ : উনিশ শতক

কবিতার বই :

অন্য পরিচয়
দু ফোঁটা আতর

ভূমিকা

মেয়েদের পাঠ কোথাও কোথাও পুরুষের পাঠের থেকে কিছুটা পৃথক হয়ে যায়। পৃথক হয়ে যায় সেইখানে, যেখানে মেয়েদের পাঠে নিজস্ব যাপনের সঙ্গে সাহিত্যকে মিলিয়ে দেখার প্রয়াস থাকে। এ পাঠের মধ্য দিয়ে মেয়েরা সাহিত্যে মেয়েদের উপস্থাপনাকে নিজেদের অনুভব-অভিজ্ঞতার নিরিখে খুঁজে নিতে চায়। এ পাঠের ভিত্তিতে যে সমালোচনা তৈরি হয়, সে সমালোচনা তাই নিছকই বিষয়গত, মেয়েই তারই বিষয়।

এইরকমই মেয়েলি পাঠের কয়েকটি নিদর্শন নিয়ে এই বই। বইয়ের প্রথম অংশে মেয়েদের লেখায়, দ্বিতীয় অংশে পুরুষের লেখায় মেয়েদের উপস্থাপনাকে বুঝে নিতে চেয়েছি। এ বইয়ের অধিকাংশ আলোচনার বিষয়বস্তু এতটাই বিস্তার দাবি করে যে, এক-একটি প্রবন্ধের শিরোনাম নিয়ে পুরো পুরো গবেষণাগ্রন্থ লিখে ফেলা যায়। ছোটো প্রবন্ধের পরিসরে, আমার পাঠের সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে, বিষয়গুলির কিছু কিছু প্রবণতার কথা বলতে পেরেছি মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। এমনও নয় যে, পুরো কোনো পরিকল্পনা নিয়ে লেখা হয়েছে এই বই। দশ-বারো বছর ধরে, নানারকম উপলক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে লিখেছি, কখনো পত্রিকা-সম্পাদকদের চাহিদা অনুসারে, কখনো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা-চক্রে আমন্ত্রণ পেয়ে।

যাঁদের ইচ্ছায়, তাগাদায়, আমন্ত্রণে লেখাগুলি নানা সময়ে লেখা হয়েছে, তাঁদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। লেখাগুলিকে এক মলাটে একত্রিত করা গেল, এর জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাই 'পুস্তক বিপণি'র অনুপকুমার মাহিন্দারকে।

কলকাতা
১ জানুয়ারি ২০০০

সুতপা ভট্টাচার্য

সূচি

নারীর কলমে নারী

নারীর কলমে নারী : উপন্যাসে ১৩
মেয়েদের গল্পে মেয়েদের কথা ৩৩
কবিতায় নারী, নারীর কবিতা ৪৪
তসলিমা নাসরিনের লেখা ৬২

পুরুষের কলমে নারী

বিভূতিভূষণের উপন্যাসের মেয়েরা ৭৫
তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে নারী ৮১
নারীমুক্তি আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৮
কুসুম আর কপিলা ৯৫
ধূর্জটিপ্রসাদ কি নারীবিদ্বেষী ছিলেন? ১০২
পরশুরামের গল্পের মেয়েরা ১০৭
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'-র গল্পর একটি মেয়েলি পাঠ ১১৫
পুরুষের কলমে নারী : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ১২১

প রি শি ষ্ট

রামমোহন এবং আজকের নারীভাবনা ১২৯
উনিশ শতকের নারী-আলোচনা এবং
স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত 'ভারতী' ১৩৫
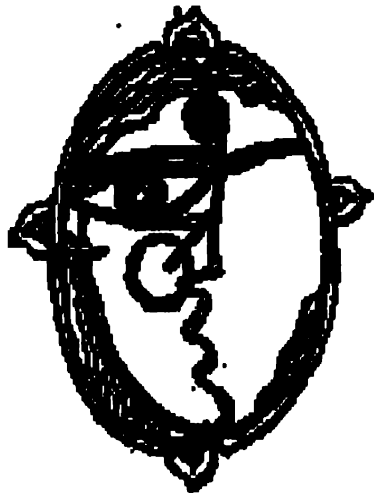
নারীর কলমে নারী

নারীর কলমে নারী : উপন্যাসে

শুরুর কথা

মেয়েদের কি কোনো পৃথক ইতিহাস আছে, যেমন ভেবেছিল সুপ্রিয়া, জ্যোতির্ময়ী দেবীর একটি চরিত্র? সে ভেবেছিল : 'ওরাও যেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় 'আত্মবিস্মৃত জাতি'। ওদের অতীত কোনো ইতিহাস নেই, কোনো ভবিষ্যৎ নেই, কোনো স্বপ্ন নেই।' সত্যিই কি নেই? বরং বলা চলে সে ইতিহাস খুঁজিনি, খুঁজি না আমরা। ইদানীং শুরু হয়েছে সেই প্রয়াস, গবেষকরা পড়তে চাইছেন সেই ইতিহাস—সাহিত্যের সাক্ষ্য থেকে খুঁজে খুঁজে।[১]

কিন্তু সাহিত্যের সাক্ষ্য কি নির্বিচারে গ্রহণ করা যায়? ইংরেজরা তাদের উপনিবেশের যে ইতিহাস রচনা করেছিল, তা কি অভ্রান্তভাবে মেনে নিতে পারি আমরা? পরাধীন ভারতের ইংরেজ-বাঙালি সম্পর্কের সঙ্গে পুরুষ-নারী সম্পর্কের সমান্তরাল রচনা করেন যে বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা রবীন্দ্রনাথ,[২] এখানেও তো সে তাৎপর্য থেকে যায়। তাই, আশ্চর্য নয়, পুরুষের রচনায় নারীর যে পরিচয় পাই, আর নারীর নিজের রচনায় যে পরিচয় সে দেয় নিজের—তার মধ্যে যোজন-দূর ভিন্নতা থেকে যায়। যদিও, সেই সুপ্রিয়া এও তো মানতো : 'মেয়েদের লেখা কিছু হয় না, কেননা মেয়েরা কেবলই ভাবে : মনে করি, কে কি বলবে।' হ্যাঁ, প্রবচন তো তাই বলে—মেয়েদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না।

মুখ ফোটে না, না মুখ ফুটতে দেওয়া হয় না? ঠাকুরবাড়ি কিংবা কেশবচন্দ্র-পরিবার কিংবা প্রমথনাথ চৌধুরীদের মতো কোনো কোনো অভিজাত পরিবারের মেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ এবং লেখার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাচ্ছিলেন নিশ্চয়ই ; কিন্তু সমাজের তাঁরা কতটুকুই বা অংশ। কীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় মেয়েদের আত্মপ্রকাশ, তার একটি শ্লেষময় দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের 'খাতা' গল্প। উনিশ শতক থেকেই মেয়েদের প্রকাশিত লেখার খবর পাওয়া যাচ্ছে অল্পবিস্তর। প্রকাশের মুখ দেখেনি এমন অনেক লেখাও ছিল অবশ্যই। সত্যিই তো আর মেয়েরা মূক কোনো জীব নয়, পুরুষ মানুষের থেকে পৃথক কোনো জাতি নয়। উনিশ শতকে মেয়েদের লেখালেখির যে সূচনা হলো, বিশ শতকে তার ব্যাপ্তি ঘটল অনেক। যদিও, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন যাঁরা, তাঁরা এমন অনেকের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি, মেয়েদের আত্মপ্রকাশের ইতিহাসে যাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সমাজে, ইতিহাসে বদল ঘটে গেছে ক্রমে। একদিন গৃহবন্দি নারীর কাছে বাস্তবতার ছিল একটাই মাত্রা—যাকে বলা যায় গার্হস্থ্য বাস্তবতা। যুগবদলের সঙ্গে-সঙ্গে ঘর-বাহিরের দ্বন্দ্বে মেয়েদের জীবনের সমস্যাপটে বদল এসেছে অনেক। তার ইতিহাস তো মানুষেরই ইতিহাস। তবু, মেয়েদের লেখাতে যেভাবে আছে তার পরিচয়, পুরুষের লেখায় সেভাবে নেই।

২. সিঁদুরের অন্ধকার রঙ

'স্ত্রী জাতি'—এ শব্দটি উনিশ শতকের আলোচনায় বহুল ব্যবহৃত, বিশ শতকেও এর ব্যবহার বিরল নয়। কিন্তু কোন অর্থে কীভাবে মেয়েদের একটা পৃথক জাতি বলে ভাবতে হয়? জীবজগতের কোনো কোনো প্রজাতিতে স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গের ভিন্ন নাম দিয়েছে মানুষ—তাদের প্রয়োজনের স্বার্থে, গাই-বলদ যেমন ; সেইরকম কোনো প্রয়োজনের তাগিদেই কি 'স্ত্রী জাতি' নামে পৃথক ক্যাটিগরির ব্যবহার? দেখতে পাই, এ জাতিভেদ মেনে নিয়েছেন মেয়েরা নিজেরাও, জ্যোতির্ময়ী দেবী লিখছেন : 'মানুষ পৃথিবীতে একটা জাত। তাতে আবার দুভাগ—স্ত্রী ও পুরুষ। কিন্তু তাতে মানুষের সমস্যা মেটেনি, সে স্ত্রী জাতির মধ্যেও দাগ কেটে দুজন করেছে। একজন হলো পুরুষের ঘর সংসারের গৃহিণী বা সন্তানের জননী-সেবিকা, তার নামই হলো সতী। আর অন্য হলো তার প্রমোদ-বিলাসের সঙ্গিনী, বহুবল্লভা, গৃহধর্মহীনা এক নিঃসঙ্গ নারী—তাকে অসতী বলা চলে।'[৩]

সতী হতে গেলে স্বামী থাকতে হবে একটা, কিন্তু স্বামী যার নেই? তাই বলা ভালো, আরো সম্প্রদায়ভেদ আছে মেয়েদের—তারা হয় কুমারী, নয় সধবা, নয় বিধবা আর নয়তো অসতী। পুরুষের সঙ্গে যৌন-সম্পর্ক থাকা না-থাকা বা তার প্রকারভেদ—এসব অনুসারেই মেয়েদের সমাজ পরিচয়। পুরুষের ক্ষেত্রে 'বিবাহিত' কিংবা 'বিপত্নীক' বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে 'সধবা' কিংবা 'বিধবা' বিশেষ্য হিসেবেই প্রযোজ্য ছিল এতদিন আমাদের সমাজে। মেয়েদের এইসব ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে কৌলীন্য আছে কেবল সধবার। সেই প্রাচীনকাল থেকে মেয়েদের 'স্বধর্ম' বলতে শুধুই নির্দেশিত হয়েছে স্বামীসেবা। তাই স্বামী যার আছে, সমাজে তারই যথাযথ স্থান আছে, মান আছে। আর, সিঁথির টকটকে সিঁদুর তাই মেয়েদের সবচেয়ে বড়ো সম্মান-প্রতীক (status symbol)। এই রাঙা রঙের আড়ালে সধবার জীবনচিত্রটি কেমন ছিল, তার একটা আদি নিদর্শন হয়তো রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা (১৮৭৬)। এই বইটির আলোচনা-প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন জানিয়েছিলেন : 'সাধারণত কবিগণ প্রেমকে কেন্দ্রবর্তী করিয়া রমণী চরিত্র আঁকিয়া থাকেন, কিন্তু হিন্দুর গৃহ শুধু পতিপত্নীর নিজস্ব নহে ; যিনি গৃহিণী, তিনি কন্যা, ভগ্নী, ননদী, পুত্রবধূকর্ত্রী এই সর্ববিধরূপে সুযশ অর্জন না করিতে পারিলে এই সমাজে তিনি প্রশংসা পাইতেন না ; অথচ কবিগণ সচরাচর তাঁহাকে এই গণ্ডি হইতে পৃথক করিয়া প্রেম-লীলার স্বাতন্ত্র্য কল্পনা করিয়া থাকেন, রমণীর সমগ্র চিত্রটি আমরা প্রায়ই কাব্য বা উপন্যাসে দেখিতে পাই না।...কবি বা ঔপন্যাসিক যে স্থান হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া থাকেন, রাসসুন্দরী সেই স্থান হইতে কথা আরম্ভ করিয়াছেন। কোন পুরুষ শত প্রতিভাবলেও রমণীহৃদয়ের গূঢ় কথার এমন আভাস দিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।'[৪] 'কবিগণ' শব্দটিতে দীনেশচন্দ্র কেবল পুরুষ কবিদেরই নির্দেশ করেছেন। বাস্তবিকই, পুরুষ কবিদের কবিতায় বা উপন্যাসে—'বীরাঙ্গনা কাব্য'-র মতো কাব্যে কিংবা 'দুর্গেশনন্দিনী'-র 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'-এর মতো উচ্চারণের পাশাপাশি রাসসুন্দরীর জীবনীকে স্থাপন করলে অসাধারণ এক অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের কৌতুক উপভোগ করতে পারেন পাঠক। 'উনিশ শতকের নবচেতনা' শুধুমাত্র শহরে মধ্যবিত্তের সীমিত জগতেও কতই না স্বল্পপরিসরের ঘটনা!

'কোনো পুরুষ শত প্রতিভাবলেও রমণীহৃদয়ের গূঢ়কথার এমন আভাস দিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ'—এ কথা বলেছেন দীনেশচন্দ্র সেন, কিন্তু কোনো পুরুষ কি 'রমণীহৃদয়ের গূঢ় কথা' পড়তেও পারেন ঠিক ঠিক? জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাসসুন্দরীর লেখাপড়া শেখার প্রশংসা করেছেন এইজন্যে যে 'নভেল নাটক পড়িবেন বলিয়া নহে'...'চৈতন্য ভাগবত' পড়িতে পারিবেন বলিয়াই লেখাপড়া

শিখিবার জন্য তাঁহার এত আগ্রহ'। লেখাপড়ার জন্যই লেখাপড়া শেখার ইচ্ছা হতেও পারে কোনো নারীর—এই অকথিত কথাটুকু বুঝতে চাননি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো নারীপ্রগতিবাদী মানুষও! আর দীনেশচন্দ্র সেন রাসসুন্দরী দেবীর প্রশংসা করেছেন এই ভাষায় : 'অমরকোষে রমণীর একটি প্রতিশব্দ 'ভীরু'। এই নাম কিরূপ সার্থক, তাহা রাসসুন্দরীর জীবনে সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে।...বাঙালির গৃহে গৃহিণীগণ কিরূপ ছিলেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই চিত্রখানি আমরা বিশ্বের দ্বারে সগৌরবে উন্মোচন করিয়া দেখাইতে পারি।' সত্যিই কি সে চিত্র বাঙালি পুরুষের 'সগৌরবে' দেখাবার মতোই চিত্র? উপর্যুপরি সন্তান জন্ম দেওয়া আর তাদের পালনের মধ্যে দিয়ে কীভাবে জীবন অতিবাহিত হয়েছে তাঁর, তার বিবরণ দিতে গিয়ে রাসসুন্দরী জানিয়েছেন একবার পরপর দুদিন মুখের ভাত মুখে ওঠেনি তাঁর, পুরো অনাহারেই থাকতে হয়েছে, কিন্তু বাড়ির কেউ তার খবরও রাখেনি! 'বিশেষত আপনার খাওয়ার কথা সকল লোকে শুনিবে, সেটি ভারি লজ্জার বিষয়। ও-সকল কথা আমি কাহার নিকট বলিতাম না ও কেহ জানিত না। এই প্রকারে কত দিবস আমার খাওয়া হইত না।'—রাসসুন্দরীর এসব কথার মধ্যে আমি যে আরো অনেক নীরব কথা শুনতে পাই, সে হয়তো আমি নিজে মেয়ে বলে, হয়তো আমার মা-দিদিমাকে দেখেছি বলে। তবে, ভীরুতার জন্যে প্রশংসিত এই নারী অন্তত একটি সাহসের বাক্য লিখেছেন, দীনেশচন্দ্রের পড়া থেকে যা বাদ পড়ে গেছে—'আমি এখানে আসিয়া অবধি দায়মালী কারাগারে বন্দী হইয়াছি।'

আঠারো বছর থেকে একচল্লিশ বছরের মধ্যে রাসসুন্দরীর এগারোটি সন্তানের জন্ম হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কিংবা সুভাষচন্দ্রের জননীর তুলনায় রাসসুন্দরীর মাতৃগৌরব অবশ্য কম। কিন্তু আমার পিতামহীদের সাধারণ পরিচয় তো এইটেই—সন্তানের জন্ম দিতে দিতে ক্লান্ত হতেও জানতেন না তাঁরা। কেননা তাঁরা যে 'সমাজের সম্পূর্ণ বশ্য' ছিলেন! অথচ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জননী' (১৯৩৫) উপন্যাসের আগে, আর কোনো ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে মেয়েদের বাস্তব এই জননীমূর্তি ধরা পড়ল না! আর সেই জননীমূর্তি আশাপূর্ণা দেবীর 'সুবর্ণলতা'য় যে-ভাষায় প্রকাশ পেল, তা ভাবতেও পারেন না মানিক। কিন্তু এসব তো পরের কথা। উনিশ শতকের প্রধান ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সধবার পতিভক্তিই রূপায়িত হয়েছে, তার জননীমূর্তি তত প্রাধান্য পায়নি। অবশ্য তাঁর কলমে পতিরাও পত্নীপ্রেমে কম যান না কিছু, মাঝে মাঝে শুধু অন্য নারী বিষয়ে 'মোহ' জন্মায়—এই যা। কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রর কিংবা রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের মনোভাব অভ্যস্ত খাবারের মধ্যে মাঝে মাঝে একটু-আধটু মুখ বদলানো শুধু, তাঁদের সেই সামান্য বিলাসটুকুর জন্যে কুন্দনন্দিনী কিংবা রোহিণীকে প্রাণ দিতে হয়—কিন্তু তাতে কী আসে যায়! ভ্রমর তার খুনি স্বামীকে ক্ষমা করেনি, কিন্তু রোহিণীকে পতিতালয়ে পাঠিয়ে গোবিন্দলাল যদি ফিরে আসতেন ভ্রমরের কাছে, তবে কি আর ক্ষমা পেতেন না? সমস্যা তো শুধু কুন্দনন্দিনী কিংবা রোহিণী বিধবা বলে, কুমারী হলে দুই বিবাহ তো বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে কোনো সমস্যা নয়। তাই না সূর্যমুখী ননদিনীকে লেখা চিঠিতে বিধবা-বিবাহের প্রচলন নিয়ে আক্ষেপ জানিয়েছিল, বহুবিবাহ বিষয়ে কোনো মন্তব্যই করেনি। ইন্দিরার জবানিতে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন : 'যাহারা বলে বিধবার বিবাহ দাও, ধেড়ে মেয়ে নহিলে বিবাহ দিও না, মেয়েকে পুরুষমানুষের মত নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত কর, তাহারা পতিভক্তি তত্ত্ব বুঝিবে কি?' দেবী চৌধুরাণী প্রফুল্ল হয়ে ফিরে গিয়ে ঘাটে বাসন মাজতে বসল, 'কেহ জানিল না তাহার অক্ষর-পরিচয় আছে। গৃহধর্মে বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন নাহি।' প্রফুল্লর সংসারে সতীন সমস্যা নেই, সে বলে 'আমি একা তোমাকে ভোগদখল করিব না।' এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র মেয়েদের দিয়েই বলিয়ে নিয়েছেন বিধবাবিবাহ বাল্যবিবাহ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে প্রতিকূল কথা আর বহুবিবাহ বিষয়ে অনুকূল কথা।

সম্ভবত 'পতিভক্তি তত্ত্বে' বহুবিবাহের (অবশ্যই পুরুষের) বিশেষ মহিমা আছে। লিঙ্গ রাজনীতির (Gender Politics) এই কি এক চূড়ান্ত নিদর্শন নয়?

'উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা সাহিত্যে নারীর নতুন ভাবমূর্তি-অঙ্কনে ও দাম্পত্য সম্পর্কের নতুন আদর্শ স্থাপনে সাহায্য করে'[৫]—এই মন্তব্য করেছেন একজন পুরুষ গবেষক, 'বাঙালি নারী' বিষয়ে গবেষণা করে। খুব ঠিক এই মন্তব্য, শুধু সেইসঙ্গে একটু অনু-যোগ আছে—সেই 'ভাবমূর্তি' পুরুষের স্বার্থে পুরুষের কল্পনার সৃষ্টি, তার সঙ্গে না আছে নারীর বাস্তবের বদ্ধ জীবন-পরিবেশের যোগ, না আছে সেই বদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবার কোনো পথনির্দেশ। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকারা প্রায়শই ঘর ছাড়ে, আবার ঘরে ফিরেও আসে ; সূর্যমুখী কিংবা শৈবলিনী কিংবা ইন্দিরা কিংবা প্রফুল্ল—এইসব স্বইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ঘরছাড়া মেয়েদের নানান ছলে-বলে-কৌশলে পুনর্বার ঘরে স্বপ্রতিষ্ঠ করতে কখনো ভোলেন না বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু বাস্তব কি তাই বলে? একবার যে মেয়ে ঘরের বাইরে বার হয়, আর কি ফিরে-আসা হয় তার? রামের আদর্শ কি ভুলে যেতে পারে সেযুগের বাঙালি পুরুষ? সীতা তো সেই অর্থেই সমস্ত নারীর আর্কেটাইপ—সতীত্বের গৌরবে গরবিনী সীতার নিজের কোনো ঘর নেই! মেয়েমাত্রেই চির-উদ্বাস্তু, চির-নির্বাসিত!

কেন ঘর ছাড়তে হয় সধবা নারীকে, নারীর কলমে তার পরিচয় থাকে বইকি, সেই পরিচয় সিঁদুরের অন্ধকার রঙ। বেগম রোকেয়ার 'পদ্মরাগ' (১৯২৪-২৫) উপন্যাস সেই ঘরছাড়া সধবাদের কাহিনী। এ আখ্যানে একটি প্রতিষ্ঠানে জড়ো হয়েছে বিভিন্ন ধর্মের মেয়েরা, কিন্তু তাদের সকলেরই বিবাহিত জীবন বিভীষিকাময়। যার ফলে এই উপন্যাসের হেলেনের 'ভুক্তভোগী হৃদয় কাহারও বিবাহের সংবাদ শুনিলে স্বতঃই আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠে।' 'পদ্মরাগ' সেই সময়ের তুলনায় আশ্চর্য আধুনিক উপন্যাস। যদিও তার ভাষাভঙ্গি বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের, কিন্তু আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রীয় 'পতিভক্তি'র সম্পূর্ণ বিপরীত। এই আখ্যানের নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ থেকে ক্রমশ পরস্পরের প্রতি অনুরাগ জন্মানোর পর নায়িকা জানতে পারেন এই পুরুষেরই তিনি বাক্‌দত্তা কিন্তু পরে তাঁকে প্রত্যাখ্যাত হতে হয়, এবং তাঁর এই বাক্‌দত্ত স্বামী অন্যত্র বিবাহ করেন। একসময় নায়কের সেই দ্বিতীয়া পত্নীর মৃত্যু ঘটে, আর নায়ক যখন বাইরে অন্বেষণ করে চলেছেন তাঁর প্রথমা বাক্‌দত্তাকে, আর অন্তরে নায়িকা 'পদ্মরাগে'র প্রতি অনুরাগে তন্ময় হয়ে আছেন, তখনই আকস্মিকভাবে তিনি জানতে পারেন তাঁর অনুরাগের পাত্রীই তাঁর সেই হারানো বাক্‌দত্তা পত্নী। এই পর্যন্ত পড়তে পড়তে প্রত্যাশা করছিলাম মিলনান্তক সুখময় এক উপসংহারের, উভয়ে উভয়ের প্রতি যখন গভীর প্রণয়াসক্ত, আর বাইরের কোনো বাধাও নেই, তখন এই মিলন তো খুব স্বাভাবিক পরিণাম, অন্তত সাহিত্যিক পরম্পরা (Literary Convention) তো সেরকমই বলে। সেই পরম্পরা ভেঙে দেন রোকেয়া, আমি হতবাক হয়ে যাই 'পদ্মরাগ'-এর কথা শুনে : "আমরা কি মাটির পুতুল যে, পুরুষ যখন ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিবেন, আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন?...আমি যদি উপেক্ষা লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া গিয়া সংসারের নিকট ধরা দিই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই আদর্শ দেখাইয়া দিদিমা ঠাকুমাগণ উদীয়মানা তেজস্বিনী রমণীদের বলিবেন. 'আরে রাখো তোমার পণ ও তেজ—ঐ দেখ না, এতখানি বিড়ম্বনার পরে জয়নব আবার স্বামীসেবাই জীবনের সার করিয়াছিল।' আর পুরুষসমাজ সগর্বে বলিবেন, 'নারী যতই উচ্চশিক্ষিতা, উন্নতমনা তেজস্বিনী; মহীয়সী, গরীয়সী হউন না কেন—ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আমাদের পদতলে পড়িবেই পড়িবে।' আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহ জীবনই নারীজন্মের চরম লক্ষ্য নহে ; সংসারধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে।' জয়নব ওরফে পদ্মরাগের এই উক্তির সমর্থন করে স্বামী-পরিত্যক্তা উষা বলেছিল : "এই যে 'পতি পরম গুরু'—

এই ভাবটাই মারাত্মক। পুরুষ যাহাই করুন না কেন—অবলা সরলার জন্য 'পতি পরম গুরু', 'পতি বিনে নাই গতি'। কেন বাপু? এত বড় বিশাল ধরণী কি তোমাদেরই একচেটিয়া বাসস্থান।' উষার কাপুরুষ স্বামী উষাকে ডাকাতের হাতে ফেলে রেখে পালিয়েছিল, কিন্তু ডাকাতেরা তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল বলে, অন্যের কৃপায় সে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার পেলেও তাকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করেনি স্বামী, সমাজ। হায়, ইন্দিরার মতো উষা স্বামীকে 'হাসি চাহনি'-তে বশ করার প্রয়াস না করে কি না তারিণীভবনে সামান্য কাজ করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে! কী আদর্শচ্যুতি!

আশ্চর্য নয়, এই অসামান্য উপন্যাসটি রচনা করার বাইশ বছর পর লেখিকা এটি প্রকাশ করেন। নারীর আদর্শ, নারীর ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে ফতোয়া জারি-করা লেখালেখির তো অন্ত ছিল না সে-সময়, তার মধ্যে মেয়েদের লেখাও কম নয়! মেয়েদের দিয়েই তো বলিয়ে নেবে সমাজ : 'সুমাতা ও সুগৃহিণী যাতে হয়ে উঠতে পারে মেয়েরা, তারই চেষ্টা করা প্রয়োজন।'[৬] আর তাই কি, বেগম রোকেয়ার থেকে বয়সে এক/দুই বছরের ছোটো অনুরূপা দেবী নিরুপমা দেবীর নাম সকলের কাছে পৌঁছে গেছে যখন, বেগম রোকেয়া তারও বহুদিন পরে অধিকাংশর কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেছেন? 'মতিচূর' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থের একটি লেখায় রোকেয়া বলছেন : 'যে সকল পত্রিকায় উদারতাসূচক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়, সে সব কাগজ অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিতে পায় না। কেবল বঙ্গে নহে, সুদূর পশ্চিমদেশেরও কোন পত্রিকা (যাহা অবলাদের জন্য প্রচারিত হইয়াছে এবং যাহার অধিকাংশ প্রবন্ধই মহিলা-রচিত) অনেক পাঠক তাঁহাদের আত্মীয়া মহিলাদের দৃষ্টিগোচর হইতে দেন না। ক্ষমতা পুরুষের হাতে কিনা।'

ক্ষমতা পুরুষের হাতে। তাই মেয়েদের জন্য উদ্দিষ্ট সাময়িকপত্রে বাণী দেওয়া হচ্ছে 'সকল ভূষণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভূষণ সতীত্ব। সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম পবিত্রতা ও সুনীতি।'[৭] 'স্ত্রীদিগের প্রতি উপদেশ' বইটির আলোচনা করছেন 'বান্ধব' এই ভাষায় : 'যে সকল বঙ্গবধূরা নাটক বিনা আর কিছু পড়েন না প্রণয়পত্র বই আর কিছু লিখেন না এবং সূক্ষ্মশিল্প ব্যতীত আর কোনো কাজকর্ম করেন না, তাঁহারা এই উপদেশ গ্রন্থ পাঠ করিলে, অনেক বিষয়ে সুশিক্ষা পাইবেন।'[৮] বুঝতে অসুবিধে হয় না, সেই 'সুশিক্ষা' মেয়েদের গার্হস্থ্যালিতে বেঁধে রাখার শিক্ষা, অবরোধে ঢেকে রাখার শিক্ষা। 'সতীলক্ষ্মী' বইটির পুস্তক-পরিচয় দিতে গিয়ে প্রবাসী জানাচ্ছেন : 'ইহা একখানি স্ত্রীপাঠ্য সুন্দর উপন্যাস।...সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান ও অধিকার কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাদের শিক্ষাদীক্ষার কিরূপ আয়োজন হওয়া উচিত, তাহা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আখ্যায়িকাটিও শিক্ষাপ্রদ, সতীলক্ষ্মীদের সুখপাঠ্য।'[৯] কী জাতীয় উপন্যাস মেয়েদের পড়া উচিত, তার একটা প্রেসক্রিপশন্ পাওয়া গেল তবে, তাও আবার রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো নারী-প্রগতিবাদীর পত্রিকায়। 'নারীধর্ম' নামে একটি বই, যার বিষয়বস্তু মহাভারত থেকে নারীধর্ম বিষয়ক শ্লোক ও অনুবাদ, তার পরিচয় দিতে গিয়ে প্রবাসী বলছেন : "পুস্তকপ্রণেতাকে যদি কোন কালে 'পুরুষধর্ম' লিখিতে হয়, তবে তিনি যেমন এই পুস্তকে নারীদিগকে অনেক বিষয়ে পুরুষদিগের অধীন হইয়া কার্য করিতে উপদেশ দিয়েছেন, সেই প্রকারে অনেক বিষয়ে পুরুষদিগকেও নারীদিগের অধীন হইয়া চলিবার অনুরোধ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না।'[১০] 'প্রবাসী' এমন মন্তব্য করলেও 'পুরুষধর্ম' বিষয়ে ফতোয়া দেওয়া, বই লেখার মতো অলীক ব্যাপার কস্মিনকালে ঘটেনি, ঘটবে না। কেননা, ক্ষমতা পুরুষের হাতে।

পুরুষ-নির্দিষ্ট সেই 'নারীধর্মে'র সেই 'সতীলক্ষ্মী'র আইডিয়লজির চাপের মধ্যে লিখতে হয়েছে সেকালের মেয়েদের, অলিখিত শর্ত তার কম নয়! তাই দেখি অনুরূপা দেবীর 'জ্যোতিহারা' (১৯১৫)

গ্রন্থে এক দাদামহাশয়ের জবানিতে সমর্থন করা হয় শাস্ত্রে শূদ্র ও নারীর অনধিকারেরও। এসব না লিখলে সমাজ যে লেখিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতেই দেবে না কোনো মেয়েকে! না হলে যে অনুরূপা দেবী নারী আন্দোলনে সামিল হতে পারেন, তাঁকেই কেন লিখতে হবে 'মা'-র মতো উপন্যাস, যেখানে টাকার লোভে বিনা দোষে যে পুত্রবতী বধূকে বিতাড়িত করা হয় স্বামীগৃহ থেকে, সেই বধূ একটি প্রতিবাদের ভাষা উচ্চারণ করে না! রাম-সীতার আদিরূপ এ আখ্যানে নিহিত ছিল বলেই না 'মা' এত সমাদর পেয়েছিল পাঠকসমাজে! যদিও এই উপন্যাসে পুরুষের বহুবিবাহকে অন্তত সমস্যাপট হিসেবে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন লেখিকা : 'মা, মাগো! সতীনের উপর মানুষ কেন মেয়ে দেয়। গঙ্গায় তো এখনও জলের কোন অভাব হয়নি।' তবু 'মন্ত্রশক্তি'র মতো উপন্যাস না লিখলে, বিবাহ-প্রতিষ্ঠানের জয়জয়কার না গাইলে, সাহিত্য জগতে তাঁর কি এমন দাপট তৈরি হত।

'মা' উপন্যাসকে (১৯২০) একজন সমালোচক মনে করেন নিরুপমা দেবীর 'দিদি' উপন্যাসের (১৯১৫) জবাব। কেননা স্বপত্নী-ঈর্ষা নয়, স্বপত্নী-প্রণয় থেকেই 'দিদি' উপন্যাসে দাম্পত্য প্রেমের সমস্যাপট গড়ে উঠেছে। স্বামী-পরিত্যক্তা প্রথমা পত্নী স্বামীকে সপত্নীর স্বামী হিসেবে দেখতে চেয়েছে, আর যখন সেই স্বামী তারই প্রণয় যাচনা করে চলেছে, তখন তাকে প্রত্যাখ্যানও করতে পেরেছেন। এক হিসেবে এও তো এক প্রতিবাদ, যদিও সে প্রতিবাদ সমাজ-নির্দিষ্ট আইডিয়লজির আওতার ভিতরেই। শেষরক্ষা অবশ্য করতে পারেননি লেখিকা, স্বামীপ্রেমের কাছে হার মেনেছে আত্মসম্মান। 'দিদি' উপন্যাসের এই নায়িকার মতো রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যবর্তিনী' গল্পের হরসুন্দরীও তার স্বামীকে সপত্নীর হাতে দান করেছিল, কিন্তু একসময় 'হরসুন্দরীর মনে কোথা হইতে একদল শরিক আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, তুমি তো ত্যাগপত্র লিখিয়া বসিয়া আছ কিন্তু আমাদের দাবি আমরা ছাড়িব না।'—রবীন্দ্রনাথ পুরুষ বলেই এই 'শরিক'দের কথা লিখতে পেরেছিলেন, কোনো নারীলেখিকা একথা লেখার কথা ভাবতেই পারেন না। কোনো আত্মসুখের কথা মেয়েদের মুখে উচ্চার্য নয়, তাঁরা বলবেন কেবল আত্মনিগ্রহের কথা। সেই আত্মনিগ্রহের ছবি নিরুপমা দেবীর উপন্যাসে বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে, 'দিদি' কিংবা 'অন্নপূর্ণার মন্দির' যার দৃষ্টান্ত। আর তাইতেই তো যশ! 'পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই'—আমার ঠাকুমা-দিদিমাদের জন্যে এ যে ছিল মর্মান্তিকভাবে সত্য!

ছোট একটি গল্পে রবীন্দ্রনাথ দুই বিবাহের সমস্যাপট যেভাবে উপস্থিত করতে পেরেছেন, তা বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা শরৎচন্দ্রের রচনাতে ভাবতেও পারা যায় না, যুবতী বধূ এসে বৃদ্ধ স্বামী আর তার সমবয়সী সপত্নী-সন্তানদের ভালোবাসছে আন্তরিকভাবে, আবার ভালোবাসা পাচ্ছেও তাদের কাছ থেকে—গার্হস্থ্যছবি শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে সব এঁদের রচনায়। 'রজনী'র লবঙ্গলতা কিংবা 'দেবদাস'-এর পার্বতী তার দৃষ্টান্ত। লবঙ্গলতা বা পার্বতীর খুব বিপরীত অভিজ্ঞতা 'পদ্মরাগ'-এর সৌদামিনীর, সপত্নী পুত্রকন্যাকে ভালোবেসে কাছে টানতে গিয়ে বারবার তাকে অপমানিত হতে হয়, অপবাদ পেতে হয়, শেষ পর্যন্ত সংসার ত্যাগ করতে হয়। আরো পরবর্তীকালের লেখিকা আমোদিনী ঘোষ-এর একটি উপন্যাসে প্রতিবাদ আরো ভয়ংকর। বয়স্ক স্বামীর যুবতী দ্বিতীয়া ভার্যা সমবয়সী পুরুষদের ভালোবাসতে চায়, সামাজিক সম্পর্কের থেকে সে পুরুষ তার পুত্রপ্রতিম হলেও তার প্রতি তার আদৌ পুত্রভাব জাগে না, লবঙ্গলতা বা পার্বতীর মতো সুমাতা হবার শখ নেই তার; তার আচরণকে কঠোরভাবে শাসন করেন তার লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক স্বামী। প্রতিবাদে অবশেষে গলায় দড়ি দেয় সে, গলায় ফাঁস লাগানোর আগে বদলে নেয় নিজের সধবা সাজ—স্বামী এসে দেখেন ঝুলন্ত এক বিধবামূর্তি! উপন্যাসটির নাম 'ফস্কা গেরো', পুরুষ প্রতাপের বজ্র-আঁটুনির প্রতি তীব্র শ্লেষ। এ

উপন্যাস বই হিসেবে প্রকাশ পেয়েছিল কি? সম্ভবত নয়।[১১] এ উপন্যাস যে সংসারের আরেক চিত্র দেখায় : 'সংসারের যে দিকটা আমরা দেখি, সেটাও সংসারের আসল দিক নয়,—জীবনের ওপরে আছে একটা সুদৃশ্য আবরণ,—নানা বর্ণে নানা ছন্দে নানা কারুকার্যে খচিত। কিন্তু তার তলায় আছে অসভ্য কদর্যতা, কুশ্রীতা, অঙ্গহীন বিকলতা, ক্লেদাক্ত বীভৎস ক্ষত। যার চোখে সে দৃশ্য একবার পড়ে, বাইরের সাজানো আবরণটা তার চোখের কাছ থেকে যায় উড়ে আর সত্যের বেশে মিথ্যার যে মায়ারূপ জগৎ জুড়ে বসে আছে তা যায় ছন্নাকার হয়ে মিলিয়ে।'

দাম্পত্য-সম্পর্কের মধ্যে গার্হস্থ্য প্রঘাত কতটাই যে ভয়াল রূপ নিতে পারে, তার নিদর্শন শুধু আমোদিনী ঘোষই যে দেখিয়েছেন তা তো নয়, শৈলবালা ঘোষজায়ার কিছু কিছু উপন্যাসে সে জাতীয় নিদর্শন হয়তো বা ভয়ালতর। তাঁর 'জন্ম-অপরাধী' (১৯১৯) উপন্যাসে স্বামীর পদাঘাতে মৃত্যু ঘটে অন্তঃসত্ত্বা পত্নীর। 'জন্ম-অভিশপ্তা'তে (১৯২১) অত্যাচারিতা স্ত্রীর অন্তরালাপে অসহায়ের তিক্ত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। 'জানে পাপ যাবে কোথা? যতবারই যত তাচ্ছিল্য যত যন্ত্রণা দিয়ে অকাতরে দগ্ধে মারি না কেন, ফিরে ফিরে আমাদেরই হাতে পড়তে হবে তো? অতএব, এ প্রভুত্বের প্রতাপ ছুটিয়ে সার্থক করে নিই, সেই তো পরম পৌরুষ।' কিন্তু শৈলবালার নায়িকাদের মতো শুধু মনে মনে নয়, আমোদিনী তাঁর চরিত্রের মুখে স্পষ্ট প্রতিবাদের ভাষা দেন। হয়তো বা 'যোগাযোগ'-এর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শক্তি জুগিয়েছেন : 'হিন্দুস্বামীর অধিকারের অন্ত নেই, কিন্তু হিন্দু স্ত্রীর পাদমেকং রাখবার জায়গা নেই। ওরা কীটপতঙ্গের অধম। ওদের প্রয়োজন শুধু পুরুষের সেবার জন্যে। তাও সমষ্টিভাবে—ব্যক্তিহিসাবে না আছে ওদের কোনো মূল্য—না আছে ওদের কোনো স্থান! ওদের পরে কারো দয়া নাই, মায়া নাই, করুণা নাই, সহানুভূতি নাই—মানবোচিত কোনো কর্তব্য নাই।—কশাই-এর হাতে পশু ওরা—ওদেব জন্ম জবাই হবার জন্যে...।' সেই জবাই-এর অন্য নাম কি বিবাহ? জবাই কিংবা বলির উপমা আমোদিনী ঘোষের পরের যুগের লেখিকা সুলেখা সান্যালের উপন্যাসেও এসে যায়—বিবাহের উপমা : 'বিন্তিপিসি কাজললতা ধরা হাতখানা দিয়ে মেঝেটা যেন আঁকড়ে ধরে বসে থাকে। হঠাৎ বুকের ভেতরটা কেমন করতে থাকে ছবির, যেমন করতে থাকে পুজোয় বলি দেবার জন্যে অনিচ্ছুক পাঁঠাটাকে যখন সবাই মিলে দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যায়—কিছুতেই যেতে চায় না জন্তুটা, যত দড়ি ধরে টানাটানি কর, তত সে করুণ চোখে তাকায়, কেঁদে কেঁদে ডাকে।' এ হলো বিবাহ-প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিকতার ভয়াবহ ছবি, বহুবিবাহ-বাল্যবিবাহর মতো সামাজিক রীতিনীতিজনিত অত্যাচার নয় এ। সাবিত্রী রায়ের 'পাকা ধানের গান' উপন্যাসে স্বামী-প্রহারে জর্জরিতা মেয়ে দেবকীর সিঁথির সিঁদুর হয়ে ওঠে 'তিরস্কারের চিহ্ন'! কাকে তিরস্কার? সমাজকে? তবু তো দেবকী ছেলের জন্যে সেই স্বামীর কাছেই ফিরতে চেয়েছিল, যদিও পারেনি। বিতাড়িতা দেবকী কঠিন বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রাম করে আবার নতুন করে বাঁচতে চেয়েছে, ভালোবাসতে চেয়েছে। বিবাহ তার কাছে কোনো সংস্কার নয় আর। বিবাহ-প্রতিষ্ঠান আর তার সংস্কারকে সরাসরি অস্বীকার করেছিল আমোদিনী ঘোষের এক নায়িকা। অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি'র কতই না বিপরীত আমোদিনী ঘোষের 'দীপের দাহ' উপন্যাস (১৯০৪)। বিবাহ-মন্ত্রের কোনো প্রভাবই পড়ে না এ উপন্যাসের নায়িকার উপর, মন্ত্র-চিহ্নিত স্বামী নয়, তার প্রণয়ীর সঙ্গে সম্বন্ধই তার কাছে একমাত্র সত্য। সমাজের চোখে যা অবৈধ, কোনো মেয়ের কাছে তা অনৈতিক নাও হতে পারে। এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনীর সঙ্গে 'দীপের দাহ'-র নায়িকার প্রভেদ। প্রতাপের প্রতি ভালোবাসার জন্যে পাপবোধ ছিল শৈবলিনীর মনে। অথচ একনিষ্ঠতা যদি নৈতিকতা হয় তবে সে 'পাপীয়সী' আখ্যা পাবার মতো অপরাধ করেছিল কিছু? শরৎচন্দ্র যদিও বিবাহসংস্কারকে তেমন মান দেননি সবসময়, তবু সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষকে

তিনি এড়িয়ে চলতেই চেয়েছেন। স্বামীকে ভালোবাসতে পারেনি শরৎচন্দ্রের 'পথনির্দেশ' উপন্যাসের হেম, তাই বলে সে নিজেকে অসতী ভাবে না, কেননা বিবাহের আগে থেকেই সে ভালোবেসেছে গুণীকে, আর বিবাহের পরেও তাকেই ভালোবাসে, তাকেই বলতে পারে : 'আমিও সতীলক্ষ্মী, তাই মরণকালে আমি তোমার কাছে যাচ্ছি, এই কথাই মনে করব।' এ কথা বলে হেম, কিন্তু বিধবাবিবাহও স্বীকার করে না, এইখানেই প্রকাশ পায় শরৎচন্দ্রের পিছুটান। 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে নারীর উপর পুরুষের নৃশংস অত্যাচারের হাজার বিবরণ, সমাজের হাজার সমালোচনার পর তো শরৎচন্দ্র লিখতে পারেন : 'অবশ্য শৃঙ্খল একেবারে মুক্ত করিয়া দিবার কথা বলিতেছি না—তাহাতে আমেরিকায় মেয়েদের দশা ঘটে। তাহাদের অবাধ স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হইয়াছে।...তাহাদের ব্যাপার দেখিয়া প্রায় সমস্ত পুরুষেরই হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যাইবার মত হইয়াছে। তাই—কতকটা শৃঙ্খলের প্রয়োজন।' এই কতকটার পরিমাণ নির্ধারণ করে দেবে কে? পুরুষ তো? শরৎচন্দ্র নিজে অন্তত তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাঁর 'চরিত্রহীন' কিংবা 'গৃহদাহ'র মতো উপন্যাসে। 'শ্রীকান্ত'-র অন্নদাদিদি থেকে 'চরিত্রহীন'-এর সুরবালা কিংবা 'গৃহদাহ'-র মৃণাল তাদের অসাধারণ পতিভক্তির কারণেই কথকের পূজা পেয়ে চলেছে। তার বিপরীতে অচলা কিংবা কিরণময়ী পেয়েছে চূড়ান্ত শাস্তি, তারা যতই কেননা বুদ্ধিতে বোধে অসাধারণ মেয়ে হোক, তারা যে পতিভক্তি যথাযথভাবে পালন করেনি। 'চরিত্রহীন'-এর প্রটাগনিস্ট উপেন্দ্র তার স্ত্রীর বিষয়ে বলে : 'ভদ্রলোকের মেয়ে স্বামী ছাড়া আর কোন লোককে কোন অবস্থাতেই ভালবাসতে পারে, এ কথা হাজার বললেও তার মাথায় ঢুকবে না।' তবু তো সুরবালার স্বামী দেবতুল্য। কিন্তু স্বামী যেখানে অত্যাচারী, অকর্মণ্য, সেখানেও সতীত্বের জয়গান করেন শরৎচন্দ্র—অন্নদাদিদি কিংবা বিরাজ বৌ যার দৃষ্টান্ত, শিবঘরণী উমার আদিরূপ আছে এ জাতীয় চরিত্রে।

শরৎচন্দ্রের এই আইডিয়লজি অবশ্য কল্লোলযুগ বা তার পরবর্তী পুরুষ লেখকদের কলমে বজায় থাকেনি আর। কিন্তু পুরুষের পক্ষে বিবাহ-সংস্কারের বাইরে নারীচরিত্রকে রাখতে পারা যত সহজ, নারী লেখিকার পক্ষে তা আদৌ তত সহজ ছিল না। এই কারণেই আমোদিনী ঘোষ এতটাই উল্লেখযোগ্য লেখিকা। আশাপূর্ণা দেবীও তাঁর প্রথম উপন্যাসেই বিবাহ-সংস্কারকে ভাঙতে পেরেছিলেন ('প্রেম ও প্রয়োজন' ১৩৫১)। কিন্তু তার জন্য কি তাঁকে সমালোচনা শুনতে হয়নি? 'আরতির এক কথায়...পরপুরুষের সঙ্গে জীবন যাপনে রাজী হওয়া একেবারে অসম্ভব না হলেও কিছুটা অবিশ্বাস্য বৈকি'—এই মন্তব্য করেছেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র, অনেক পরে, গ্রন্থাবলীর ভূমিকায়। কিন্তু মনে হয় না কি, একথা শুনতে হয়েছে তাঁকে অনেক আগে থেকেই? তাই কি বিবাহ-সংস্কারের জয়গান করলেন তিনি 'অগ্নিপরীক্ষা' উপন্যাসে?

'অগ্নিপরীক্ষা' আশাপূর্ণা দেবীর একটি অপ্রধান উপন্যাস। তাঁর প্রধানতম উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (১৩৭১) কিংবা 'সুবর্ণলতা'তেও কিন্তু আর বিবাহ-সংস্কারকে অস্বীকার করা কোনো বিদ্রোহের ছবি পাই না। কেননা বাস্তব সমাজে তো সে ছবি সত্যিই বিরল। কিন্তু যে ছবি ঘরে ঘরে আছে, বুদ্ধিতে বোধে বহুগুণ নিকৃষ্ট স্বামীর দাম্ভিক প্রভুত্বের চাপে জর্জরিত স্ত্রীর নীরব আর্তনাদ, সিঁদুরে-শাঁখায় মহিমান্বিত সেই দাম্পত্য-ছবিই এ দুটি উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে, দেখানো হয়েছে নীরব আর্তনাদ সামান্যতম সরব প্রতিবাদে রূপান্তরিত হলেই কীভাবে তা সমাজের চোখে দোষণীয় অপরাধ বলে গণ্য হয়, 'পাগলামি' বলে আখ্যা পায়। দাম্পত্যের সেই অতি স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার কথা সুবর্ণলতা বলে এই ভাষায় : '...সঙ্কুচিত হয়ে ঘুমন্ত মানুষটার ছোঁয়া বাঁচিয়ে শুয়ে পড়ে সে। লোকটার ওই পরিতৃপ্ত ঘুমন্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে কেমন ঘৃণা আসে, অপবিত্র লাগে লোকটাকে। এই কিছুক্ষণ আগেই যে ওর আদরের দাপটে হিমশিম খেতে হয়েছে, তা ভেবে বুকটা কেমন করে ওঠে। কিন্তু

কী করবে সুবর্ণ?...' না, করবার কিছুই নেই সুবর্ণর। সুবর্ণর রীতিমতো স্ত্রৈণ স্বামী, শৈলবালার অঙ্কিত অত্যাচারী, নিষ্ঠুর স্বামী তো নয়। তবু যে নিছক সুগৃহিণীর মোড়কেই বাঁচতে চায়নি সুবর্ণলতা কিংবা তার মা সত্যবতী, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্যবতী, তাদের প্রখর বুদ্ধি, প্রগাঢ় বোধশক্তি, প্রবল ঔৎসুক্যই তার কারণ। অথচ ধরে নেওয়া হয় এসব গুণ পুরুষদেরই একচেটিয়া, মেয়েমাত্রেরই স্বভাবজ পারদর্শিতা শুধু ঘরকন্নায়। সমাজনির্দিষ্ট লিঙ্গভূমিকার সম্পূর্ণ বিপরীত এক ছবি দিয়েছেন আশাপূর্ণা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-তে। সমাজের সেই নির্দেশনার অনুসারে পুরুষ পরিবর্তন চায় আর নারী চায় স্থায়িত্ব। এ উপন্যাসের কথক অবাক হয়ে প্রশ্ন করে 'যুগচক্রের আবর্তনে সত্যবতী কেন এমন অধীর হয়, চঞ্চল হয়, আন্দোলিত হয় আর নবকুমার কেন সে আবর্তন টেরও পায় না?' শুধু কি তাই? এ উপন্যাসের আখ্যানে প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেয় সত্যবতী, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সত্যবতী, প্রতিকার চায় সত্যবতী—যা সবকিছু পুরুষেরই শোভা পায়, নারীর পক্ষে বেখাপ্পা, আর তার স্বামী নবকুমার ভয়ে ভয়ে সবকিছুই মেনে চলতে চায়, সমাজের সঙ্গে মানিয়ে চলতে চায়। সত্যবতী যেখানে সাহসের প্রতিমূর্তি, নবকুমারের সেখানে ভীরুতার শেষ নেই। লিঙ্গ অনুসারে বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে দেওয়া যে মূলত লিঙ্গ রাজনীতিরই কৌশল, আশাপূর্ণা দেবী সেই সত্যটিই যেন তুলে ধরতে চেয়েছেন।

সমাজনির্দিষ্ট লিঙ্গভূমিকা অতিক্রম করে যে মেয়েরা, সমাজে তাদের সমালোচনার অন্ত নেই। পরিবারও তাদের সমালোচনা করছে, এমনকি আপন গর্ভের সন্তানরাও। বিশেষ করে ছেলে—সে তো পুরুষতন্ত্রের ধারক, মায়ের আত্মস্বাতন্ত্র্য সে তো কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সুবর্ণলতা অবাক হয়ে দেখে তার ছেলের আচরণভঙ্গির মধ্যে তার মূঢ় সেজ দেওরের অবিকল প্রতিচ্ছবি! আশাপূর্ণা দেবীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসে মাতৃত্বের একই সংকট আধুনিকতর কালপরিবেশে আঁকা হয়েছে। 'হাজার চুরাশির মা'-র (১৯৭৪) সুজাতাকেও সুবর্ণর মতো একান্তই অনিচ্ছায় সন্তান ধারণ করতে হয় বারবার। তার শেষ সন্তান হবার সময় 'অশ্লীল অশুচি লেগেছিল নিজেকে ন' মাস ধরে। শরীরের ক্রমবর্ধমান ভারকে মনে হয়েছিল অভিশাপ।' কিন্তু সন্তানের জীবনসংশয় শুনে এই সুজাতারই বুক ভরে উঠেছিল ব্যাকুল মমতায়। আবার, সুবর্ণর ধরনেই সুজাতা তাঁর মেয়ের কথা বলায় শুনতে পান তাঁর শাশুড়ির কণ্ঠস্বর! সুবর্ণর শেষ সন্তান বকুল আর সুজাতার শেষ সন্তান ব্রতী ছাড়া আর কোনো সন্তান তাদের মাকে বুঝতে চায়নি। ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষেই। কেননা পুরুষতন্ত্রের অনুশাসনে মাতৃত্বের সম্মান আছে, কিন্তু মায়ের কোনো অধিকার নেই। আর সেই মা যদি মাতৃত্বের মোড়ক খুলে পুরো একটা মানুষ হিসেবে কথা বলে? তবে তো সন্তানের চোখে সে মস্ত এক অপরাধী হয়ে দাঁড়ায়! মায়ের সঙ্গে সন্তানের এই বিরোধ আশাপূর্ণা দেবীর একাধিক উপন্যাসের ভাববস্তু। সব থেকে উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের নাম 'উন্মোচন'। বয়স্ক সন্তানের মা যদি অন্য কোনো পুরুষের চোখে নিজের মূল্য খুঁজে পান, তবে সন্তান তা কিছুতেই মেনে নিতে রাজি হয় না। কেননা মাকে শুধু সে নিজের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রেই চেনে, তার বাইরে মাকে গোটা একটা মানুষ হিসেবে চিনতে তাকে শেখায় না সমাজ। সুবর্ণ তাই না মনে মনে পুরুষ-সমাজকে দিয়েই বলিয়ে নিয়েছে : 'তোমার রূপবতী মূর্তির কাছে আমি মুগ্ধ ভক্ত, তোমার ভোগবতী মূর্তির কাছে আমি বশংবদ, তোমার সেবাময়ী মূর্তির কাছে আমি আত্মবিক্রীত, তোমার মাতৃমূর্তির কাছে আমি শিশুমাত্র।...কিন্তু এগুলি একান্তই আমার জন্যে হওয়া আবশ্যক। হ্যাঁ, আমাকে অবলম্বন করে যে 'তুমি', সেই 'তুমি' টিকেই মাত্র বরদাস্ত করতে পারি আমি। তার বাইরে 'তুমি' হচ্ছো বিধাতার একটি হাস্যকর সৃষ্টি।'

৩. শুভ্র বেশে এ কী গরিমা তীব্র!

আর, যখন সেই অবলম্বন সরে যায়? বিবাহই নারীর উপনয়ন আর স্বধর্ম হলো স্বামীসেবা—এই নিদান দিয়েছিলেন যেখানে শাস্ত্রকার, সেখানে বলা নেই, স্বামী চলে গেলে মেয়েদের স্বধর্ম কী? ধর্ম নয়, আচারের ফিরিস্তি দিয়েছে সমাজ—মেয়েদের উপর সমাজের নিষ্ঠুরতম অত্যাচারের নাম বৈধব্যের পালনীয় আচার। ১৮৮০ সালে 'সোমপ্রকাশ' বলেছিলেন 'পতির লোকান্তর গমনের পর অন্য গতি নাই, যদি স্ত্রীলোকেরা ইহা জানিতে পারেন, পতিশুশ্রূষায় অধিকতর অনুরক্ত হইবেন, প্রতি যাহাতে দীর্ঘজীবী হন সে চেষ্টা পাইবেন। এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মচর্যের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।' কিন্তু বৈধব্য পালনকে কি সত্যিই ব্রহ্মচর্য পালন বলা যায়? নারীর জবানিতে এ প্রশ্ন তুলেছিলেন একজন পুরুষ লেখক—চাকরি চলে গেলে যে উর্দিটা ছাড়তে হয় তার নাম কি ত্যাগ? জেলখানায় যে কয়েদি ভালো খেতে পায় না, পরতে পায় না, যৌনজীবন থেকে বঞ্চিত থাকে—তবে সে কি তার ব্রহ্মচর্য পালন? 'নোটিশ টাঙাইয়া আমার খাওয়া-পরা ঠিক করিয়া দিবে অন্য লোকে,—এত বড় অপমানের ব্যাপার তো আর কিছু খুঁজিয়া পাই না। পতির জীবদ্দশায় বিলাসী হইতেই হইবে। তাঁহার মৃত্যুর পর সমস্ত বিলাসিতা বর্জন করিতে হইবে,—আমার উপর এতবড় জুলুম করিবার স্পর্ধা ও অধিকার সমাজ কোথা হইতে পাইল?'[১২] কিন্তু বিধবার খাওয়া-পরা বিষয়ে এরকম প্রশ্ন তোলার মতো মন পুরুষ লেখকদের মধ্যে খুবই বিরল।

আশ্চর্যই লাগে, বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা রবীন্দ্রনাথের লেখায় বৈধব্য বিষয়ে অমানবিক সমাজব্যবস্থার কোনো ছবিই নেই। রোহিণী কিংবা কুন্দনন্দিনী, বিনোদিনী কিংবা দামিনী—এরা একবেলাই শুধু খেতে পেতো কিনা, নির্জলা একাদশী করত কিনা—এসব খবর এঁদের লেখায় মিলবে না। আসলে পারিবারিক উপন্যাসে প্রেমের ছবি আঁকতে গেলে সে যুগে তো বিধবা ছাড়া গতি নেই, গৌরীদানের পুণ্যের ঠেলায় কুমারী যুবতী খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন, আমাদের সনাতন হিন্দুসমাজের সীমার মধ্যে। শরৎচন্দ্রের রচনায় অবশ্য বিধবার উপর সমাজ-সংস্কারের চাপ দেখানো হয়েছে, যেমন 'পথনির্দেশ'-এ হেমের মা এই খেদোক্তি করেন : 'কি জানি কোন পাষাণ বিধবার সাজ তৈরি করে গিয়েছে', কিন্তু সে চাপের সঙ্গে শুধু যে প্রেমের দ্বন্দ্বই নয়, আত্মসম্মানেরও দ্বন্দ্ব—শরৎচন্দ্রের কলমে তা ধরা পড়বার কথা নয়। কিন্তু মহিলা লেখিকারা? বৈধব্য-আচারের গরিমাময়তার মধ্যেকার আত্মছলনা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া হয়তো বা তাঁদেরও গত্যন্তর ছিল না, অন্তত বিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত খুব কম লেখিকাই প্রবন্ধ রচনাতেও বাল্যবিধবার পুনর্বিবাহ, কিংবা বৈধব্য-আচারের বিরোধিতার কথা সাহস করে লিখেছেন। বরং 'সতীলক্ষ্মী'র আইডিয়লজির মতোই বিধবার ব্রহ্মচর্যর আইডিয়লজি নিয়েই তখন লেখালেখি চলছে বেশি, আর সেসব লেখালেখির অনেকটাই মেয়েদের কলমেই যথারীতি। 'জনৈক বিধবা'—এই নামে স্বাক্ষরিত একটি রচনায় বলা হয়েছে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর এই যে যাবতীয় ভোগসুখ ত্যাগ করে মৃত পতির চিন্তায় ব্রহ্মচর্য পালন করার নিয়ম—'এমন মধুর এমন পবিত্র নিয়ম' তো অন্য কোনো ধর্মশাস্ত্রেই নেই। এইভাবে যেসব বিধবা 'দেবীর মহিমা' লাভ করেন, মরজগতে তাঁর মতো 'পার্থিব সুখের' নাকি কোনো তুলনাই নেই।[১৩] দীনেশচন্দ্র সেন 'হিন্দু রমণীর সামাজিক অবস্থা'র[১৪] কথা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই দুঃখ জানিয়েছেন সতীদাহ প্রথা তুলে দেওয়া নিয়ে—'বরং এই আপসোস যে সমাজে এখন সত্যের জন্য—প্রেমের জন্য আর কেহ চিতায় পুড়িয়া মরে না।' অতঃপর তিনি 'নারীর জন্য যে স্বার্থত্যাগ ও আত্মবিলোপের উচ্চ আদর্শ নির্দিষ্ট আছে—তার মহিমা কীর্তন করেছেন।

দীনেশচন্দ্র অবশ্য তা করতেই পারেন। কিন্তু কৃষ্ণভাবিনী? যাঁর লেখায় বিচলিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁকেও তো দেখি সমাজের সঙ্গে আপস করতেই।[১৫] 'হতভাগিনী বালবিধবা'দের কথা ভাবতে গিয়ে প্রথমেই অবশ্য তিনি পুনর্বিবাহের কথা বলেন, কিন্তু এও জানেন তিনি, সমাজ তা অনুমোদন করে না, বরং 'অপরিপক্ক জীবনটিকে' সমাজ শুকিয়ে ফেলতেই চায়। সমাজের পীড়ন যখন অনিবার্য, তখন তার মধ্যে থেকেই বালবিধবা কীভাবে সমাজের কাজে নিজেকে নিয়োগ করতে পারেন আর তার জন্য চরিত্র গঠন করতে পারেন, তারই পথনির্দেশ দিতে চেয়েছেন কৃষ্ণভাবিনী। তাঁর মতে চরিত্রগঠনের প্রথম সোপান—স্বার্থত্যাগ, দ্বিতীয়—আত্মশাসন, তৃতীয়—আত্মবিসর্জন। হয়তো বা তাঁর নিজের জীবন-অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, ব্রহ্মচর্য ব্রত অভ্যাস হয়ে গেলে কারুরই আর তা সমাজের কঠোর অনুশাসন বলে মনে হয় না। আর প্রাণে যদি বৈরাগ্য জাগে কোনো বিধবার, তিনি তো 'চুল কাটিয়া ফেলিতে বা সন্ন্যাসিনী সাজিতে'ও অনিচ্ছুক নন। কিন্তু বৈরাগ্য জাগে কজন মানুষের মনে? বাকিদেরও কেন চুল কাটতে হবে? এছাড়া স্বার্থত্যাগ, আত্মশাসন আর আত্মবিসর্জন-এর আদর্শ তো সব মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, শুধুমাত্র বালবিধবাদেরই আদর্শ পালনের জন্যে নির্বাচিত কেন হতে হয়? এসব প্রশ্ন অবশ্য তখনই উঠেছিল, কৃষ্ণভাবিনীর রচনার সূত্র ধরে, যখন আলোচনায় নেমেছিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী।[১৬] বালবিধবাকে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দেবার মধ্যেকার স্ববিরোধিতা যথার্থভাবেই নির্দেশ করতে পেরেছিলেন তিনি। জন্ম থেকে কন্যাকে সমাজ ঘরসংসারের জন্য প্রস্তুত হবার শিক্ষা দেয়, তারপর স্বামীর সঙ্গে প্রণয় দূরের কথা, ভালো করে পরিচয় হবার আগেই যদি তার বৈধব্য আসে, আর তখন থেকেই তাকে সংসারের বিপরীতে বৈরাগ্যচর্চার নির্দেশ মানতে বাধ্য করা হয়, তবে তার থেকে তার অন্তঃকরণের পরিবর্তন আশা করা নিরর্থক। জ্যোতির্ময়ী দেবী আরো একটি জরুরি প্রশ্ন তোলেন : 'ব্রহ্মচর্য শিখাইবে কে? শিক্ষক কোথায়?' পিতা কিংবা ভাই যেখানে বহু বয়সে পত্নীবিয়োগ হলেও দ্বিতীয় বিবাহ করতে দেরি করেন না, তাঁরা কন্যা বা বোনকে দেবেন ব্রহ্মচর্য শিক্ষা? তাঁর আত্মজীবনীতে নিজের বৈধব্য-অভিজ্ঞতা বিষয়ে লিখেছিলেন জ্যোতির্ময়ী : 'এ শোক পুরুষদের জানা নেই। যাতে এসে পড়ে বিয়োগশোক ছাড়াও এক চিরকালের আনুষ্ঠানিক শোক...আসে এক সামাজিক শোক, সমস্ত উৎসব সামাজিক মাঙ্গলিক আনন্দ-অনুষ্ঠান থেকে বিমূঢ়ভাবে অপাংক্তেয় এক নতুন জগৎ।' বৈধব্য তাঁর কাছে এইভাবে যেন এক নতুন জন্ম-নেওয়ার মতো মনে হয়েছে—'কোন এক অপাংক্তেয় শূভ্র জগতে।'[১৭] মেয়েরা যে চির-উদ্বাস্তু, বৈধব্য যেন তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। জ্যোতির্ময়ী দেবী একাই নন, 'প্রবাসী'তে 'ফুলকুমারী দেবী' নামে এক মহিলাও দেখি বাল্যবিবাহ প্রথা রোধ এবং বিধবাবিবাহ প্রচলনের পক্ষে লিখেছেন। এমনকি বিধবাকে মাছ না-খেতে-দেওয়া কিংবা নির্জলা একাদশী পালন প্রথারও নিষ্ঠুরতা নির্দেশ করেছেন তিনি।[১৮]

বৈধব্য নিয়ে এ জাতীয় লেখা, বিশেষভাবে জ্যোতির্ময়ী দেবীর মতো বিশ্লেষণধর্মী লেখা, বিধবার জন্যে 'মানুষের অধিকার' দাবি করা—খুবই ব্যতিক্রমী লেখা। সে যুগে মেয়েরা উপন্যাস যখন লিখেছেন, তাতে অন্য ছবিই তো প্রাধান্য পেতে দেখেছি। নিরুপমা দেবীর 'দিদি' গল্পের বাল্যবিধবা উমা, যে বৈধব্য কাকে বলে কিছুই বোঝে না, নিজের 'শোচনীয় দুর্দশা' বিষয়ে যার কোনো ধারণাই নেই, তাকেও খেলার ছলে মাথায় ফুল পরতে দিতে নারাজ উপন্যাসের নায়িকা সুরমা, কেননা 'বিধবাকে ফুল পরতে নেই'। উমার সঙ্গে প্রকাশের বন্ধুত্বের বন্ধন গড়ে উঠছে দেখে সুরমা ভাবে, 'হায়, এ বন্ধন যে উদ্বন্ধনস্বরূপ। উমা যে বিধবা।' উমার প্রতি শত স্নেহ-ভালোবাসা থাকলেও সুরমা ভাবতে পারে না যে, উমার সঙ্গে প্রকাশের বিবাহতেই উমার সার্থকতা ; বৈধব্য পালনে নয়। শৈলবালা

ঘোষজায়াও দেখি তরুণী বিধবার শুচিশুভ্র পবিত্রতার জয়গান করেছেন, 'শেখ আন্দু'-র 'জ্যোৎস্না' কিংবা 'রঙিন ফানুস'-এর 'মনোরমা' তার দৃষ্টান্ত। পবিত্রতার মহিমার উল্টো পিঠে যে আছে বঞ্চনার জ্বালা, সে বরং গিরিবালা দেবী 'রায়বাড়ি' উপন্যাসের 'সরস্বতী' চরিত্রে দেখিয়েছেন, 'রায়বাড়ি' যে বাংলার গ্রামীণ গার্হস্থ্য বাস্তবতার অসামান্য এক দলিল : 'বঞ্চিতা-বিড়ম্বিতা সরস্বতী...মরু-শুষ্ক জীবনে শ্যামছায়া বিলীন হইয়াছে, সুশীতল পানীয় শুকাইয়া গিয়াছে। তরুহীন, বারিহীন প্রান্তরে তপ্ত বালুকা খাঁ খাঁ করিতেছে। সে কাহারও পতিসম্মিলন সহিতে পারে না। হৃদয়ের অপরিসীম জ্বালা হৃদয়ে লুকাইয়া বাক্যের বিষবাষ্পে চারিদিকে বিষাক্ত করিয়া তোলে।' কী নিয়ে এত কথা বলে সরস্বতীর মতো বিধবারা?—সে তো শুধুই আচার-বিচারের শুচিবায়ু নিয়ে। জীবন-জোড়া শূন্যতার মধ্যে ঐ আচার পালনই একমাত্র সম্বল তার, তাকেই সে আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে। তবু জমিদার-কন্যা সরস্বতীর তো সহায়সম্বল আছে, বাবা, মা আছে। যাদের তাও নেই? এরকমই একটি চরিত্র আন্নাকালী, সাবিত্রী রায়ের 'পাকা ধানের গান'-এর। নির্জলা একাদশী করছে বলে তার পরিশ্রম কেউ লাঘব তো করেই না, তার উপর লুকিয়ে একটু জল খেয়েছে বলে এমন গঞ্জনা দেয় সকলে যে, সহ্য করতে না পেরে সে আত্মঘাতী হয়। এই আন্নাকালীই বলেছিল : 'মেয়ে হয়ে জন্মানোর অর্থই তো দুঃখের বেড়ি পরে জন্ম নেওয়া।' কঠিন বাস্তব পবিস্থিতি থেকে উঠে আসছে এই খেদ। আশাপূর্ণা দেবীর 'মিত্তির বাড়ি' উপন্যাসে বিধবা উমাশশী, যার বয়স মাত্র বাইশ বছর, একাদশীর দিন ভোরবেলা মাত্র একটু চা খেয়েছিল, সেই অপরাধে তার পিত্রালয়ের মেয়ে-বউ সকলে মিলে তুমুল লাঞ্ছনা করে তাকে, সেই উমাশশীকে, যে গাধার খাটুনি খাটে সংসারে সারাদিন—"একবেলা খাওয়া আর একখান ধুতি দিলেই পোষা যায় তাকে। 'ভাত কাপড় দিয়া পুষিবার' খোঁটাটা যা ফাউ।" আমার পিতামহীদের কালের বৈধব্য-জীবন-পরিস্থিতির এই রূঢ় সত্য পুরুষ লেখকদের উপজীব্য হয়নি। বিধবার এই সর্বত্যাগী ব্রহ্মচর্যের বিধান সেকালে সমাজ-রক্ষক পুরুষরা বড়ো বেশি সমর্থন করেছে। এইভাবে সর্বরিক্ত না হলে নাকি বিধবার মনের মধ্যে প্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে! কিন্তু আসল সত্যিটা কি একটু অন্যরকম নয়? বেওয়ারিশ পাঁঠা দেখে জিভে জল আসলে কেউ বলতেও পারে পাঁঠাটারই তো দোষ—সে কেন চেহারাখানা অমন নধর করেছে, তার কি উচিত ছিল না, না-খেয়ে হাড় জিরজিরে হয়ে থাকা—যাতে আমার লোভ না হয়। বিধবার ব্রহ্মচর্য-বিধানের মধ্যেও এরকম একটা ভাবনা নিহিত আছে বলে মনে হয়। যে বিধবা কুলত্যাগ করে, তাকে ধিক্কার দেয় সমাজ ; যে প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে গেল, সেই পুরুষটিকে কিন্তু কেউ কিছু বলে না। কুলত্যাগ তো অনেক দূরের, কোনো মেয়ে যদি এই বৈধব্যবিধানের প্রতিবাদ করে, তাহলে তো তার মধ্যে তুমুল কুপ্রবৃত্তি আবিষ্কার করবে সবাই। ১২৭৭ সালে 'সোমপ্রকাশ'-এ ছয়জন বিধবামহিলা স্বাক্ষরিত একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল বিধবাবিবাহের সমর্থনে। কয়েক মাস পরে আর একটি চিঠিতে তাঁরা জানিয়েছিলেন : 'তন্নিবন্ধন প্রতিবেশীমণ্ডলের নিকটে আমাদিগকে অনেক তিরস্কার সহ্য করিতে হইয়াছে।' উনিশ শতকের সমাজের এই চাপ বিশ শতকের গোড়াতেও তো রয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সেকালের মেয়েরা যা পারেননি, একালের মেয়েরা তা পেরেছেন। মাছ খাবার ইচ্ছে করতেই পারে কারুর, কারুর না করতেও পারে। মেয়েদের যেন নিজস্ব ইচ্ছে-অনিচ্ছে থাকতেই নেই, তাকে চলতে হবে হুকুমমতো। তাই বৈধব্যপালন শুধু শারীরিক অত্যাচার নয়, এ তো আত্মসম্মানকেও ক্ষুণ্ণ করে। তারই প্রতিবাদ করেছেন সুলেখা দাশগুপ্ত, তাঁর 'মিত্রা' (১৯৬৭) উপন্যাসে : 'কখনো না খেলে স্বামীর অকল্যাণ, কখনো খেলে তোমার পাপ—যেন খেলা—জীবনটা খেলা আর কি।' মাছ খেতে যার ভালো লাগে, বিধবা হলেই সে ভালো-লাগাটা উবে যায় না তার—সে ইচ্ছা

যদি তখন জাগে তার, তবে সে তো জীবনেরই দাবি। অথচ নিরুপমা দেবীরা তা ভাবতেও পারতেন না। সুলেখা দাশগুপ্তর কলমে সে ইচ্ছার প্রকাশ কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ঠেকে না। বিধবা মিত্রার প্রেম এবং দ্বিতীয় বিবাহ ঘটতে পারছে তাঁর আখ্যানে। আমার পিতামহীর কাল থেকে আমার কালে এতটাই বদল হলো মেয়েদের জীবনচরিত্র। এখন বিধবা মানেই আর শুধু সর্বশূন্যতার ছবি নয়, সাবিত্রী রায়ের 'পাকা ধানের গান' উপন্যাসের ভদ্রা বরং যেন শূন্যকে পূর্ণ করার ব্রতই বহন করে চলে। এই লেখিকার 'স্বরলিপি' উপন্যাসের নায়িকা বিধবা সীতার প্রেমিককে স্বীকার করে নিতে সময় লাগে অনেক, কিন্তু তার কারণ তার সংস্কার নয়, তার কন্যার প্রতি স্নেহের সঙ্গে, শাশুড়ির প্রতি কর্তব্যের সঙ্গে তার প্রেমের দ্বন্দ্ব মিটতে চায় না সহজে। এ সমস্যা একান্ত মেয়েলি সমস্যা, কোনো পুরুষ এ দ্বন্দ্বের সবটুকু রহস্য ধরতে পারবে না। কোনো উপন্যাসের পটভূমি যদি গ্রাম হয়, তবে তার সমাজে বিধবার উপর পীড়নের ছবি আরো নিষ্ঠুর হওয়াই স্বাভাবিক। তবু, এ যুগের মেয়ের কলমে, সে পীড়নকে অতিক্রম করতে পারছে মেয়েরা : সুলেখা সান্যালের 'নবাঙ্কুর' (২য় সংস্করণ, ১৩৬৭) উপন্যাসে কিশোরী দুর্গা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না বৈধব্য-আচার, তার ঠাকুমা মাছ খায় আর সে হবিষ্যি করে—এই ভিন্নতার মধ্যে কোনো ধর্ম-গৌরব দেখতে পায় না সে। সমবয়সী বান্ধবীকে সে প্রশ্ন করে : 'তুই আমাকে একটা পথ করে দিতে পারবি নে?' এই উপন্যাসেরই বিধবা মায়া সমাজের সমস্ত অনুশাসন, পরিবারের প্রহার উপেক্ষা করে মৃত্যুপথযাত্রী প্রেমিকের বুকে মাথা রেখে কাঁদতে পারে, সকলের উপস্থিতিতে। 'পাকা ধানের গান'-এর গ্রাম-পটভূমির একটি ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা মেঘির উপর কদর্য উৎপীড়ন করে ব্রাহ্মণ-সমাজ, কিন্তু উৎপীড়করা হেরেই যায়, যখন গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি দেয় মেঘি মুসলমান ছেলে আলির বধূ হয়ে। শৈলবালার 'শেখ আন্দু'র জ্যোৎস্নার মতো মেঘিকে সংযম আর পবিত্রতার মেকি দেবীপ্রতিমা বানিয়ে তোলার প্রয়োজন বোধ করেননি লেখিকা, আইডিয়লজির শিকলে বাঁধা থাকতে আর রাজি নন তাঁরা ; যদিও এর মানে নয় যে, সমাজ বদলে গেছে খুব। কেননা মেঘির উপর অমানুষিক পীড়ন আর আন্নাকালীর আত্মহত্যার ছবিও তো এ উপন্যাসে পেয়েছি আমরা।

বিধবার বিবাহ হওয়াটাও অবশ্য সবসময় মেয়েদের জীবনে সহজ সমাধান হয়ে আসে না। হতেই পারে তা এক পুরুষের আনুগত্য থেকে আরেক পুরুষের আনুগত্যে যাওয়া। তার থেকে বরং বৈধব্যের মুক্তিটাই কাম্য মনে হতে পারে কারো—যদি কেউ তার ফলেই আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়, যেমন ভেবেছিল মিত্রা, তার স্বামী চলে যাওয়ার ফলেই সে ছবি আঁকতে পারছে, নিজেকে ভরিয়ে তুলতে পারছে বলে মৃত স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায় সে। স্বামী-সর্বস্ব অস্তিত্বের বোধ চলে-যাওয়ার ফলে বৈধব্য, এমনকি এক ধরনের স্বস্তি পর্যন্ত আনছে একালের মেয়েদের জীবনে। আশাপূর্ণা দেবীর 'বকুল-কথা' উপন্যাসের পারুল ভাবতে পারছে : 'পারুলের বিধাতা পারুলের প্রতি কিঞ্চিৎ প্রসন্ন বৈকি, তাই পারুলকে দীর্ঘদিন ধরে একটা স্থূল পুরুষচিত্তের ক্লেদাক্ত আসক্তির শিকার হয়ে পড়ে থাকতে হয়নি, যে আসক্তি একটা চটচটে লালার মতো আবিল করে রাখে, যে আসক্তি কোথাও কোনোদিকে মুক্তির জানলা খুলতে দেয় না।' কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগকে যাঁরা মোক্ষপথের সোপান বলে নির্দেশ করেছিলেন, তাঁরা কি স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন, কামিনীরও মোক্ষর প্রয়োজন আছে, আর তার জন্যে পুরুষসঙ্গ ত্যাগ তার পক্ষে মঙ্গলজনক?

কিন্তু পারুল যে এসব ভাবতে পারছে, তার কারণ তাকে পরের গলগ্রহ হতে হয়নি বৈধব্যে। নিজের জায়গাটুকু যে খুঁজে পায় না কোথাও, তার পক্ষে এসব ভাবনা তো নিছক বিলাসিতা। বৃন্দাবন কিংবা কাশীর গলিতে গলিতে যে বিধবা-দল দেখা যায়, তাদের কথা জানতেন জ্যোতির্ময়ী দেবী।

তাঁর 'মর্ত্যের অপ্সরা' গ্রন্থের একটি চরিত্র হৈমর মনে হয় যেন আশেপাশে সামনে পিছনে সাদা ইউনিফর্ম-পরা মৃত প্রাণীর সারি চলেছে। সমাজের প্রচ্ছন্ন অভিমত পরিস্ফুট করে তাদের বাঁচবার অধিকার নেই, দাবি নেই। শুধু তাদের অস্তিত্বের অথবা দেহে আর একজনের প্রয়োজন নেই তাই।

৪. যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে

আর কুমারী মেয়ে, অন্যের প্রয়োজনে যে নিজেকে বিকোয়নি এখনো, সে কীভাবে বাঁচে? সে তো অন্তত পায় স্বাধীনতার অবাধ অধিকার। না, কী করে তা হবে, জন্ম থেকেই তো তাকে তৈরি করা হচ্ছে তার অনাগত পতি আর পতিগৃহের জন্যে—'খুকু যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে?' কিংবা 'যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে'—এইসব ছড়া শুনতে-শুনতেই তো শিশুকন্যাটির বড়ো-হওয়া! তারপর তার আর জানতে বাকি থাকে না তার অক্ষুণ্ণ কৌমার্য পতিদেবতার চরণে বিসর্জন দেওয়াই হলো তার নারীজন্মের একমাত্র সার্থকতা। সে সার্থকতা বোঝেনি এমন চরিত্র সাহিত্যে আছে অবশ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা যেমন, সমাজের মধ্যে থেকে সে বড়ো হয়নি, তাই পুরুষতন্ত্রের শিক্ষায় সে শিক্ষিত নয়, তার কাছে স্বামী-সংসারের কোনো প্রয়োজনবোধ নেই, বস্ত্র-অলংকারের কোনো মূল্যবোধ নেই। সমাজের ক্ষমতা চাপের কাছে মাথা নোয়ায়নি বলে তাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়, সে পথ না নিলেও ব্যক্তি-পুরুষের ক্ষমতাচাপের বলি তাকে হতেই হতো। কপালকুণ্ডলা তার মনের মধ্যে কোথাও স্বামীকে খুঁজে পায় না বলেই বলতে ইচ্ছে করে বিবাহের বাহ্যিক অনুষ্ঠান পালন করলেও আসলে সে মনে-মনে কুমারীই থেকে গেছে। কুমারী ছিলও সে যৌবনসমাগম পর্যন্ত, অরণ্যচারী বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া এ কাহিনী তো ইতিহাসের পটভূমিতে। ইতিহাস-পটভূমি ছাড়া বিশ শতকের গোড়াতে কুমারী চরিত্র কখনো-বা মেলে, মেলে সেইসব উপন্যাসে, যেখানে ব্রাহ্ম অথবা ইঙ্গবঙ্গ সমাজ আখ্যানের পটভূমি। পূর্বরাগ, কিছু সমস্যা আর সমস্যা-সমাধানের পর শুভ-মিলন—সচরাচর এই হলো সেসব উপন্যাসের ছক, বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-পটভূমির গল্প 'যুগলাঙ্গুরীয়' কিংবা 'রাধারাণী', শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' তার দৃষ্টান্ত। এ জাতীয় উপন্যাসে কিছু সমস্যা থাকে, কিন্তু সমস্যাপট থাকে না। আর তাই, নিছক এইটুকু ছক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কলমের একটিও উপন্যাস নেই।

পুরুষ ঔপন্যাসিকের তুলনায়, এই ছকটি একসময় নারী-ঔপন্যাসিকেরই প্রিয় ছিল। কুমারী চরিত্র প্রধান, সমস্যাপটবিহীন এই জাতীয় উপন্যাসের ভালো দৃষ্টান্ত হলো স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে?' (১৮৯৮) এই উপন্যাসটি থেকে শুরু করে সীতা দেবী শান্তা দেবীর বেশ কিছু উপন্যাস এবং আশালতা সিংহেরও একাধিক উপন্যাসে সমস্যা একটাই—'কাহারে পরাবো রাখি যৌবনের রাখি পূর্ণিমায়'। এসব উপন্যাসের নায়িকারা বাঁধা পড়ছে রোমান্টিক প্রেমের আইডিয়লজিতে। এ আইডিয়লজি আদৌ এদেশের নয়। তাই দেখি, 'কাহাকে?' উপন্যাস শুরুই হচ্ছে বহুশ্রুত সেই উদ্ধৃতি দিয়ে : 'Man's love is of man's life a thing apart/'His women's whole existence'। উদ্ধৃতির সত্যতার গভীর অনুভব ব্যক্ত করার মাধ্যমেই উপন্যাসের উত্তমপুরুষ কথক তার নিজের কথা বলতে শুরু করে, বলে—ভালোবাসা ও জীবন তার পক্ষে একই কথা, 'ভালোবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন' হলে 'জীবনটা একেবারে শূন্য অপদার্থ হইয়া পড়ে—আমার আমিত্ব লোপ পাইয়া যায়।' সাহিত্যচর্চা, গান-বাজনা, পার্টি, টেনিস, ডিনার—এসবের মধ্যে আবদ্ধ 'কাহাকে?'-র নায়িকা, প্রেমের ভাবনা ছাড়া তার অন্য ভাবনা নেই। ঠিক এতটাই শৌখিন নয় সীতা দেবী শান্তা দেবীর নায়িকারা, তাঁরা উপার্জন করেন, মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন কতটা, এঁদের লেখা পড়লেই তা বোঝা

যায়। আর সেই কারণেই, 'কাহাকে?'-র মতো পরীর রাজ্যের বাতাবরণ থাকে না এঁদের বইতে। এঁদের যৌথ রচনা 'উদ্যানলতা'তে (১৯১৯) যেমন, পিতার সমর্থনে নায়িকা মুক্তি বিয়ে না করে পড়াশুনা করতে থাকে। কিন্তু ষোলো-সতেরো বছর বয়স অবধি কুমারী মেয়ে গ্রামীণ সমাজের পাঁচজনের চোখে কতটাই যে অসঙ্গত, তার গ্রামের বাড়িতে পা দিয়েই তাকে বুঝতে হয়। বাবাকে লুকিয়ে ঠাকুমা তার বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেললে কোনোমতে পালিয়ে আসে মুক্তি, কিন্তু জীবনের বাস্তব পরিস্থিতির মোকাবিলা তাকে করতেই হয়।

বাবা-মা শহরে আছেন, আর গ্রামে ঠাকুমার হেফাজতে বালিকা কন্যার বিবাহের আয়োজন হচ্ছে, কোথাও বা ঘটেও যাচ্ছে—এই ঘটনা আমার জানা তিনটি উপন্যাসে দেখছি। তার মধ্যে 'উদ্যানলতা' ছাড়া অন্য দুটি উপন্যাসই আশাপূর্ণা দেবীর—'অগ্নিপরীক্ষা' এবং 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'। বোঝা যায়, গ্রাম-শহর, প্রাচীন-নবীন, প্রতিষ্ঠান-ব্যক্তির সেকালীন সংঘর্ষের একটা প্রধান উপলক্ষ ছিল কুমারী বয়স। সে সংঘর্ষে মেয়েরা একা দাঁড়াতে গেলে পরাজয় ছিল অনিবার্য, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্যবতীকে যেমন পরাজয় মেনে নিয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছিল। আর তাই 'উদ্যানলতা'র লেখিকা মুক্তির সমাজদ্রোহী পিতার বাচনেই রাখেন স্বাধীনতার বাণী : 'সমাজের শাসন যে সবসময়ই ন্যায়সঙ্গত হয় তা নয়, কিন্তু তাকে অতিক্রম করতে গেলেই সে নিজের অস্ত্র উদ্যত করে। তার অত্যাচার সহ্য করলে বেশ সুখে থাকা যায় বটে কিন্তু সে দাসের সুখ, স্বাধীন মানুষের নয়। স্বাধীনতা জিনিসটার দাম এত বেশি বলেই সে এত কাম্য।'

কিন্তু এই সংঘর্ষের আঁচটুকুও পড়ে না আশালতা সিংহের কুমারী কন্যাদের জীবনে। তাহলে প্রেমের পথে বাধা কোথা থেকে আসবে? বাধা আসে তাই নায়িকার 'আত্মসম্মান জ্ঞান, অহমিকা বোধ' থেকে। 'অমিতার প্রেম' উপন্যাস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বলেছিলেন, কোনো পুরুষ এ গল্প লিখলে তিনি বলতেন সে স্ত্রী-চরিত্র জানে না। স্ত্রীচরিত্র কি সত্যিই তত জেনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ? 'পতিভক্তি'র বাঁধা খাতে যুগ যুগ ধরে বহানো হয়েছে মেয়েদের আবেগ-অনুভবের ঢল। সেই বাঁধা খাতের বাইরে স্বাধীনভাবে ভালোবাসতে গিয়ে নিজের শরীরগত আবেগ-অনুভবের বর্ণমালা সহজে পড়ে নিতে পারবে না মেয়েরা—এটাই তো স্বাভাবিক। তাই বিভ্রম ঘটে 'কাহাকে?'-র মৃণালিনীর কিংবা 'অমিতার প্রেম'-এর অমিতার। কিন্তু অমিতার বিভ্রমটুকুই সব নয় এ উপন্যাসে। একজন মেয়ে যে নিজের মুখে বলতে পারছে শরীরের উন্মাদনার কথা, বিবাহিত স্বামীকে নিয়ে নয়—এটাই তো যথেষ্ট সাহসের। পুরুষরা মেয়েদের চুলের গন্ধ পাবে, অসংবৃত শরীর দেখে আনন্দ পাবে—এইটেই সাহিত্যিক পরম্পরা। এ পরম্পরাকে উল্টে দিতে পেরেছেন আশালতা, অমিতার অন্তরালাপে থাকে একদিনের স্মৃতি : 'অমিয়র কাছে এসে দাঁড়াতেই তার মাথা থেকে সেই চিরপরিচিত প্রিয় সুগন্ধ পাওয়া গেল, খুব ক্ষীণ গন্ধ।...সেইটুকু গন্ধের ইঙ্গিতেই তার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবশ হয়ে যেতে চাইলে। অমিয়র পাঞ্জাবির গলার বোতামটা খোলা, ওর বুকের মধ্যস্থলের লোমশ অংশের একটু আভাস পাওয়া যাচ্ছে ; কেবল ওর কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে অমিতার এতো ভালো লাগছিল...'। প্রেমের ক্ষেত্রে মেয়েরা যে নিছক যৌন বিষয় নয়, তারাও যে বিষয়ী, তারা শুধু আকর্ষণ করে না, আকৃষ্ট হয়ও—মেয়েদের শারীরিকতার এই বিষয়ী দিক পুরুষ ঔপন্যাসিকের কলমে ধরা পড়েনি। মেয়েদের কলমেও সহজে এর স্বীকৃতি থাকে না। কেননা মহিলাদের জন্যে প্রকাশিত কাগজে লেখা তো হতেই থাকে : 'আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যিকগণের হাতে বাংলার নারীচরিত্র উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশিষ্টাচারের চিত্রে অঙ্কিত হইতেছে। আধুনিক সাহিত্যের নারীচরিত্রে বাংলার নারীর নিজস্ব পরিচয় মিলে না।'[১১]

ঠিক, বাংলার নারী বলতে যদি গ্রামসমাজের মেয়েদের কথা বোঝায়, তবে তো অবশ্যই তাদের

মনোজগতে এসব সূক্ষ্মতার স্থান ছিল না কোনো, তারা শুধু অরক্ষণীয়ার দায়ভার বহন করে চলে নিঃশব্দে। না, এক্ষেত্রে সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষের কোনো প্রশ্ন ওঠে না, নিরুপমা দেবীর 'অন্নপূর্ণার মন্দির'-এর সতী সাবিত্রীর মতো কুমারীরা মেয়েজন্মের অপরাধের ভারে অর্ধমৃত, তাদের জন্যে আছে শুধু সব অবমাননা মেনে-নেওয়া, আত্মবলিদান দেওয়া। পরিবারের দারিদ্র্য অভিশাপ হয়ে আসে কুমারী মেয়ের জীবনে, আর পরিবারের চোখে সেই মেয়েই হয়ে দাঁড়ায় অভিশাপ, কেননা কন্যাপণ ছাড়া বিবাহ দেওয়া যায় না, আর বিবাহ দিতে না পারলে জাত যায়। শুধু দারিদ্র্যই নয় অবশ্য, কখনো রূপহীনতার কারণেও মেয়েরা বিয়ের বাজারে বিকোয় না। গিরিবালা দেবীর 'রূপহীনা' (১৯২৫) উপন্যাসের নাম থেকেই তার ইঙ্গিত মেলে। কিন্তু বিবাহই কেন একমাত্র লক্ষ্য একজন কুমারীর জীবনে—এ প্রশ্ন তোলেননি প্রথম যুগের নারী-লেখিকারা। বরং শরৎচন্দ্র যখন এই বিশেষ সমাজ-অত্যাচারের ছবি তুলে ধরেন 'অরক্ষণীয়া' কিংবা 'বামুনের মেয়ে'র মতো উপন্যাসে, তখন দেখি তাঁর নায়িকাই বলতে পারছে : 'মেয়েমানুষের বিয়ে করা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কাজ আছে কিনা, আমি সেইটে জানতেই বাবার সঙ্গে যাচ্ছি।' ('বামুনের মেয়ে')

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে শুরু করল। শরৎচন্দ্রের নায়িকা সন্ধ্যার মতো সামাজিক রীতি-দুর্নীতির প্রবল অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে নয়। জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'ছায়াপথ' (১৩৪১) উপন্যাসের নায়িকা সুপ্রিয়া সংসার-করা বিবাহিতা মেয়েদের যতই দেখে ততই তার মনে বিবাহ বিষয়ে বিরূপতা গাঢ় হতে থাকে। সে দেখে : 'পুরুষরা তাদের নিয়ে ঘর করে ; পুতুলের মতো সাজায় ; প্রয়োজন মনে করলে আবার নিরাভরণ করে দেয়। কিন্তু শ্রদ্ধা কোথা? সম্মান কোনখানে? সম্ভ্রম কই?' ওর মনেও হয় না যে 'এই ছেলেখেলার খেলনা হতে না পারলে ওর জীবন বৃথা হয়ে যাবে।' সুপ্রিয়া অবশ্য অনেক দ্বন্দ্বের পর শেষ পর্যন্ত প্রেমের কাছে হার মানে, কুমারী জীবনের অবসান ঘটে তার। কিন্তু কুমারীই থেকে যায় জ্যোতির্ময়ী দেবীরই 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'-এর (১৩৫৫) কালো মেয়ে বীণা, কিংবা 'মর্তের অপ্সরা' গ্রন্থের অতসী। বীণা প্রশ্ন তোলে : 'মেয়েদের দাম শুধু থাকে একজন মানুষের দরকারে? সমস্ত সম্পর্ক অতিক্রম করে মানুষ হিসেবে তার মূল্য নেই? দরকার নেই? পৃথিবীর কোনোখানে চিরদিনের ইতিহাসে একদিনও সে মানুষ হিসেবে পরিচিতি হলো না কেন?' অবিবাহিতা বীণার তবু স্বাধীনতা আছে, পিতৃধন থেকে তাকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করার বিনিময়ে সে পেয়েছে স্বাধীনতা, এমনকি গান্ধীজীর ডান্ডি-মার্চে যোগ দিতেও সে একা যেতে পারে ; কিন্তু 'মর্তের অপ্সরা'র অতসীকে উপার্জনক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ছোটো ভাই-এর চোখরাঙানি সহ্য করতে হয়। কেননা মেয়েদের নাকি অভিভাবক থাকতেই হয়, পুরুষ অভিভাবক, বয়সে ছোটো হলেও পুরুষ বলেই ভাই অভিভাবক হয়ে উঠতে পারে। কেননা মেয়েরা যে মানুষ নয়, 'পরজীবী পরগাছা জাতীয় জীব',....'নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোই যেখানে পুরুষের সম্মান, ওরা সেখানে কৃপা বা অবজ্ঞার পাত্রী'। আশাপূর্ণা দেবীর 'বকুল-কথা'র চিরকুমারী বকুলের কৈশোর-স্মৃতিতেও দেখি প্রধান হয়ে ওঠে বড়দার কদর্য শাসন, বাবা-মার উপস্থিতিতে এবং তাঁদের ইচ্ছার বিপরীতে।

কুমারী-জীবন মেয়েদের তাই খুব স্বাধীন জীবন নয়। সেই পরাধীনতার বেদনা মেয়েদের কলমেই ফুটেছে। যদিও, বিপরীত ছবিও আছে। শৈলবালা ঘোষজায়ার 'বিনীতাদি' উপন্যাসের (১৯৩৯) চিরকুমারী বিনীতাদির মধ্যে কোনো দিক থেকেই যেন কোনো অপূর্ণতা নেই, কোনো অভাববোধ নেই। জ্যোতির্ময়ী দেবী যেখানে বিবাহিত জীবনে মেয়েদের আত্মবোধহীন যাপন দেখেছেন প্রধানত, শৈলবালা সেখানে দেখেছেন মেয়েদের উপর পেষণের অত্যাচার, গার্হস্থ্য প্রঘাত। কুমারী থাকা মানে তাঁর উপন্যাসে তাই সেই প্রঘাত থেকে, পেষণ থেকে অব্যাহতি পাওয়া। 'বিনীতাদি' উপন্যাসের

কথক বিনীতাদির ছাত্রী মীনার অন্তরালাপে রয়েছে : বিনীতাদি যদি একজন অত্যাচারী, প্রভুত্বপরায়ণ হৃদয়হীন ধূর্তের ছলনায় ভুলে বিবাহ করতেন, তবে তাঁর ফুলের মতন সুন্দর, চাঁদের মতো উজ্জ্বল চন্দনের মতো স্নিগ্ধ সৌরভময় জীবনও 'প্রেতজীবনে' রূপান্তরিত হত। আসলে জ্যোতির্ময়ী দেবীর সুপ্রিয়ার কাছে বিবাহিত জীবনের স্বাভাবিকতাটা ছিল ভয়াবহ, আর শৈলবালার মীনা দেখেছে বিবাহিত জীবনে ভয়াবহতাটাই স্বাভাবিক—যে দেখা শৈলবালারই দেখা। তার থেকে মুক্তির পথ তাঁর কাছে ধর্মের পথ ; তাই বৈধব্যের পীড়নের দিক নয়, তার মধ্যে ত্যাগের মহিমাই শুধু দেখতে পান তিনি। কৌমার্যকেও তিনি সেই চোখেই দেখেন। তফাত শুধু এই যে, বৈধব্যে ত্যাগ বাধ্যতামূলক, আর কৌমার্য যখন নির্বাচন, নিছক পরিস্থিতিগত নয়, তখন তা স্বেচ্ছায় ত্যাগের জীবন বরণ করে নেওয়া। বিধবা মীনা চিরকুমারী বিনীতাদিকে দেখে তাই বলে : 'হায় রে আনমিল ত্যাগীর দল আমরা! ভোগ জোটে নাই, তাই ত্যাগের অহঙ্কার লইয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া মরিতেছি। কিন্তু ভোগের সমস্ত সুযোগ মুঠার মধ্যে থাকিতেও এই যে উচ্চতর আদর্শের সাধনায় আত্মত্যাগ,—ইহার রহস্যাবৃত গভীরতার অন্তরালে কোন মহৎ চেতনা আত্মগোপন করিয়া আছে, খুঁজিয়া পাই না...।'

বিনীতাদি ডাক্তার আর 'বকুল-কথা'র বকুল লেখিকা। দুজনেরই আছে খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং অর্থ, দুজনেরই পরিণত বয়স। তাই হয়তো চিরকুমারী হলেও হাজার বাধা-নিষেধে ঘেরা নয় তাঁদের জীবন। কিন্তু শিশুবয়সে কুমারী মেয়ের তো এসব কিছুই থাকে না, তাকে তাই প্রতিমুহূর্তে বাধা দেয় নানাবিধ নিষেধের বেড়াজাল। তারই মধ্যে দিয়ে শিশুবয়স থেকে কুমারী মেয়ের বড়ো-হওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে সুলেখা সান্যালের 'নবাঙ্কুর' উপন্যাসে। 'পথের পাঁচালী'র দুর্গার মতোই 'নবাঙ্কুর'-এর আট বছরের ছবি ঘুরে বেড়ায় পথে-পথে, তবে অবশ্য সঙ্গে টেনে নেয় সে দাদাকে, ভাইকে নয়। দুর্গার মতো ছবিও বকুনি খায় পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে। কিন্তু দুর্গার মতো পুতুলের ঘরকন্না কিংবা ফলপাকুড় কুড়োনোর দিকে কোনো ঝোঁক নেই তার। প্রবল ঔৎসুক্য নিয়ে সে মানুষ দেখে, ঘটনা দেখে ; যত দেখে তত তার মন প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। দুর্গাকে যেমন সর্বজয়া তিরস্কার করে বলেছিল, (ভাই-এর সঙ্গে ঝগড়া করছিল বলে)—'ওতে আর তোতে', ছবিকেও তার ঠাকুমা বকে ভাই-এর সঙ্গে সমান পরিমাণ খাবার চাওয়ার জন্যে, বলে : 'মেয়ে এসেছে সোনার চাঁদ ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে! কিসে আর কিসে! ছেলেদের মতো তুই কি রোজগার করবি? হবি তো বাপের বুকের শেল—আর দুদিন পরে তো বিয়ের চিন্তেয় বাপের গলা দিয়ে ভাত নামবে না—' ছবি কিন্তু দুর্গার মতো মেনে নেয় না, প্রতিবাদ করে খাবারের বাটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে। দুর্গার মধ্যে বালিকার যে স্টিরিওটাইপ আছে, ছবি তাকে একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। 'জ্ঞান হবার পর থেকে সে শুনছে সে ছেলে নয়, মানুষ নয়,—সে মেয়ে। মেয়েদের জোরে কথা বলতে নেই, হাসতে নেই, পড়তে নেই। আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই।' এই সবকিছু 'নেই'কেই ছবি অস্বীকার করতে চায়, সেই শিশুবয়স থেকেই। সমাজনির্দিষ্ট লিঙ্গবৈশিষ্ট্য যে কতটাই বানানো, তাই যেন প্রমাণ করে ছবি আর তার দাদা মণি। ছবি সাহসী, মণি ভীতু ; মার খেলে ছবি কাঁদে না, মণি কাঁদে ; ছবির প্রতিবাদ করার দৃঢ়তা আছে, মণির নেই। প্রতিবাদী ছবির কাছে হার মানতে হয় তার প্রতাপশালী ঠাকুরদাকে পর্যন্ত। সে জোর করে লেখাপড়া শিখছে, পাত্রপক্ষ দেখতে এলে তাকে কিছুতেই সামনে আনা যায়নি, দুর্ভিক্ষের রিলিফের কাজে ছেলেদের সঙ্গে সমানতালে কাজ করছে—আর এই প্রতিটি কাজের জন্যে অভিভাবকদের তুমুল ভর্ৎসনা, প্রহারের মুখোমুখি দাঁড়াতে পেরেছে সে। সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন, ধনীর নিপীড়ন আর পুরুষতন্ত্রের নিপীড়ন—ক্ষমতাচাপের এই বহুমাত্রার সবটুকুই ধরা পড়ে ছোট্ট ছবির চেতনায়।

এইখানেই ছবি শুধু দুর্গার থেকেই পৃথক নয়, পৃথক অপুর থেকেও। যেমন পৃথক বন্যাও, সাবিত্রী রায়ের 'মেঘনাপদ্মা' (১৯৬৪) উপন্যাসের বন্যা। ছবির মতন প্রতিবাদী নয় বন্যা, ভাইদের থেকে খাবারের পরিমাণ কম পেলে সে ছবির মতো প্রশ্ন তোলে না। তার মধ্যে রয়েছে শিল্পীর সম্ভাবনা, সুন্দরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ তার ; কিন্তু সেইসঙ্গে অসুন্দরের জন্যে বেদনাবোধও তার কম নয়, তার অন্তরালাপে থাকে : 'এত সুন্দর এই ভোর, কোমল আকাশ ক্ষেত খাল রোদ কুয়াশা। তবু কি করুণ দুঃখ, যেন কি একটা অবিচার বয়ে চলেছে পৃথিবীর নিরীহ প্রাণীদের উপর। সব গরিব মানুষদের উপর।' বালক অপু বালিকা বন্যার মতো অসুন্দরকে দেখতে পায়নি কোনোদিন, সে শুধু সুন্দরকেই দেখতে পায়। অপু দুর্গাকে দূর দেখায়, দুর্গার কাছে দূরের প্রতি আকর্ষণ ব্যাপারটাই অবোধ্য, তাই সে অপুকে বলে পাগল। ছেলে-মেয়ে তথা নরসত্তা-নারীসত্তার এই পার্থক্য তো রবীন্দ্রনাথও কতভাবে বলেছেন। অথচ এই বালিকা বন্যাই তার ভাইকে টেনে নিয়ে যায় কাঠের পোলের উপর, সেখান থেকে দেখা যায় অনেক দূরের ক্ষেত, অনেকখানি আকাশ। তার ভাই ভয় পায় নীচের দিকে তাকিয়ে, বন্যাই তাকে দেখতে শেখায়। ভাইকে নিয়ে কাঠের পোলে যাবার জন্যে বেদম মার খায় সে তার মার কাছে। তবু কিন্তু তার কাঠের পোলের আকর্ষণ কমে না : 'বন্যা তখনও কাঠের পোলে দাঁড়িয়ে।...আকাশ, মাঠ, দিগন্ত দেখার বিস্ময় তার দুটি চোখ ভরা। নয় হাত শাড়ির আঁচলটি বাতাসের হাত থেকে সামাল দিয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু চোখে তার স্থির বিস্ময়। দুচোখ ভরা আকাশ পিপাসা।' ছবির মতো প্রতিবাদী স্বভাবের মেয়ে না হয়েও বন্যা এই আকাশপিপাসাতেই সমাজ-নির্ধারিত লিঙ্গভূমিকা উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

৫. মিছিলের মুখ

কিন্তু কাঠের পোল থেকে শুধু আকাশই দেখে না বন্যা, কাঠের পোল থেকেই তার কানে ভাসে 'অশরীরী অন্ধকারের' আদেশ : 'এমনকি প্রাণ পর্যন্ত দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে তোমাদের। ত্যাগ ছাড়া কোনো মহৎ কাজ হয় না।' তার সৌন্দর্যচেতনার সমান্তরালে রাজনৈতিক চেতনাও সক্রিয় থাকে এইভাবে। বন্যার মতো পরোক্ষভাবে নয়, ছবির ভাবনায় ছবির কাজে খুব প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পায় রাজনৈতিক চেতনা। রোমান্টিক প্রেমের স্বপ্নমদিরতা আর গার্হস্থ্য বাস্তবতার জগৎ অতিক্রম করে নারীর দৃষ্টি উন্মীলিত হলো রাজনৈতিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে, ঐতিহাসিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে। সুলেখা সান্যাল, সাবিত্রী রায় কিংবা মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে নারী আর পুরুষ রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, মায়ের ভূমিকা কিংবা স্ত্রীর ভূমিকার রূপান্তর ঘটে যায় মানুষের ভূমিকায়। নারীর নৈর্ব্যক্তিক কাজের জগৎকে নারী ঔপন্যাসিক যেভাবে গুরুত্ব দেন, সেভাবে সচরাচর দেন না পুরুষ ঔপন্যাসিকরা। দেবী চৌধুরাণী প্রফুল্ল হয়ে যায় ('দেবী চৌধুরাণী'), দেশব্রতী এলার দেশচেতনাকে ছাপিয়ে জেগে ওঠে ব্যক্তিগত প্রেম ('চার অধ্যায়')। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসের মা রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে জেলে গেলেও মায়ের ভূমিকা থেকে এক পা বাইরে আসতে পারেন না। এমনকি গান্ধীবাদী আন্দোলনের নেত্রী হয়েও গান্ধীজীকে গালমন্দ করতে তাঁর বাধে না। এদের থেকেই কতই না পৃথক সাবিত্রী রায় কিংবা মহাশ্বেতা দেবীর রাজনৈতিক উপন্যাসের মেয়েরা। সাবিত্রী রায়ের 'স্বরলিপি' উপন্যাসের (১৯৫২) রাজনৈতিক কর্মী সাগরী। তার স্বামী, সংসার ত্যাগ করে পার্টির হুকুমে ; স্ত্রীর ভূমিকার থেকে পার্টিকর্মীর ভূমিকা তার কাছে বেশি মূল্যবান। পরে আবার সে পার্টির হুকুমও অমান্য করে, যখন বোঝে তার মধ্যে আদর্শ নেই কোনো, আছে পার্টির

প্রভাবশালী নেতার লোভ। উত্তাল আন্দোলনের কেন্দ্রে চলে গিয়ে নিজের আদর্শ, নিজের বিবেচনা অনুসারে সক্রিয় থেকে প্রাণ দেয় সাগরী। আর এই সূত্রে উন্মোচিত হয় পার্টির প্রভাবশালী নেতার ক্ষমতা-অপব্যবহারে ছবি, যা' ফলে পার্টি থেকে বে-আইনি ঘোষিত হয় এই বই। ইতিহাসের বিশাল পটভূমিতে এক বহু স্বরমন্দ্রিত উপন্যাস এই 'স্বরলিপি', তার বহু নারী-চরিত্রের মধ্যে কেউ কেউ কমিউনিস্ট কর্মী, অনেকেই নন, কিন্তু তাঁরা মা-বোন-স্ত্রী বা প্রেমিকা হয়েও রাজনীতি-সচেতন পুরো একটা মানুষ। তাঁর প্রধানতম উপন্যাস 'পাকা ধানের গান' (১৯৫৬-৫৮)-এর যদি কোনো বাণী থাকে, তবে তা হলো : 'প্রেমের পরিপূর্ণতা সৃজনে', কিন্তু এ বাণী রূপ নিচ্ছে রাজনৈতিক আন্দোলন-তাড়িত, ইতিহাসের ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সময়ের প্রেক্ষাপটে। শুধু শহরের মেয়েরাই নয়, গ্রামের মেয়েও কীভাবে আত্মসচেতন হয়ে উঠছে, জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে হয়ে উঠছে রাজনীতি-সচেতন, বেরিয়ে আসতে পারছে যে-কোনো সমাজ-নির্দিষ্ট ভূমিকা-গণ্ডির বাইরে—তার পরিচয় পাওয়া যায় এ উপন্যাস থেকে। মহাশ্বেতা দেবীর গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসমাত্রেই ইতিহাসকেন্দ্রিক, আর সে ইতিহাস তিনি অন্বেষণ করেন নিজে। যে ইতিহাস উপন্যাসের মাধ্যমে রচিত হয় তাঁর কলমে, তাতে নারীর অনেকখানি ভূমিকা থাকে, যা ইতিহাস-আকর-গ্রন্থে দেখা যাবে না কখনোই। বিপ্লবে মেয়েদের অংশগ্রহণ তাঁর লেখায় অনেকটাই গুরুত্ব পায়, ঝাঁসির লক্ষ্মীবাঈ-এর কাহিনী থেকে যার শুরু। তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'কৈবর্ত খণ্ডে' (১৯৯৪) দেখি, বিপ্লবের কাজে এগিয়ে এসেছে বারবনিতা কাঞ্চনা, প্রাণ দিতেও ভয় করেনি সে। পুরুষের উপন্যাসে বারবনিতাকে বড়োজোর সতী করে তোলা হয়, মেয়েদের উপন্যাসে এই মর্তের অপ্সরাদের কথা কমই এসেছে। এক জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'মর্তে অপ্সরা' বইতে এদের দেখা পাই, কিন্তু দেখা পাই এদের মৃত্যু-সংকটের মুহূর্তে, প্রেমের বিলাসের কোনো মুহূর্ত নয় তা। জ্যোতির্ময়ী দেবী দেখিয়েছেন এদের জীবনের অপচয়ের দিক আর মহাশ্বেতা দেবী দেখালেন এদের জীবনের সফলতার দিক—সেও মৃত্যুরই সফলতা। তাঁর 'ক্ষুধা' উপন্যাসে (১৯৯২) পালামৌ অঞ্চলের বিদ্রোহের কাহিনীতে মেয়েদের ভূমিকা অসাধারণ। মেয়েদের সঙ্গেই এর মূল সংঘর্ষ। শুধু তাই নয়, মেয়েদের উপর অত্যাচারই এই বিদ্রোহের সূচনাবিন্দু। এ অত্যাচার মূলত যৌন-প্রঘাত। পুরুষের উপন্যাসে যৌন-প্রঘাতের অনেক ছবি থাকে, কিন্তু মেয়েরা কিছুটা এড়িয়েই গেছেন এই দিক। কেন, তার কারণ জ্যোতির্ময়ী দেবীর ভাষায় : 'নারী কবি মহাকবি নেই। থাকলেও নিজেদের মান, লজ্জা, মর্যাদা, সম্ভ্রমহানির কথা লিখতে পারতেন না। সে ভাষা আজও পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি। তাই স্ত্রী-পর্বের কোনো ইতিহাসই কোথাও নেই।'[২৩] কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী তুলে ধরতে চেয়েছেন সে ইতিহাস, রাজনৈতিক তাৎপর্যের দিক থেকে।

৬ শেষের কথা

মহাশ্বেতা দেবী লিখে চলেছেন আজও। আশা করা যায়, মেয়েদের ইতিহাস না লিখলেও, তিনি লিখে চলবেন ইতিহাসে মেয়েদের স্থানের কথা। এক হিসেবে সেও তো মেয়েদের ইতিহাস। মেয়েরা এখন উপন্যাস লেখেন খুব অল্প দু-একজনই, তাঁদের লেখায় আত্মসচেতন আত্মপ্রতিষ্ঠ নারীচরিত্রই প্রধান। কিন্তু বাস্তবে এই মেয়েদের সংখ্যা কি আজও খুব সামান্যই নয়? তসলিমা নাসরিনের লেখা পড়ে তো সেরকমই মনে হয়। মেয়েদের কথা বলবার জন্যে এখন এত বেশি সভাসমিতি সেমিনার বক্তৃতা হয়ে চলেছে যে, হয়তো উপন্যাস লেখার প্রয়োজন আর বোধ করেন না কেউ।

কিন্তু সত্যিই কি প্রয়োজন ফুরিয়েছে?

উল্লেখপঞ্জি

১. দ্রষ্টব্য : আনিসুজ্জামান, 'বাঙালি নারী : সাহিত্যে ও সমাজে', **এক্ষণ**, শারদীয় ১৪০১

২. দ্রষ্টব্য : সুতপা ভট্টাচার্য, 'লিঙ্গ রাজনীতি এবং রবীন্দ্রনাথ', **'সে নহি নহি'**, ১৯৯০

৩. জ্যোতির্ময়ী দেবী, 'সমাজের একটি অন্ধকার দিক', জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন, **প্রথম খণ্ড**, ১৯৯২, পৃ ৩৬৯

৪. দীনেশচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন', প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১, পৃ. ১০৪

৫. আনিসুজ্জামান, 'বাঙালি নারী : সাহিত্যে ও সমাজে', **এক্ষণ**, শারদীয় ১৪০১, পৃ ৩৭

৬. সুচারু দেবী, 'বাংলার নারীর কথা', **বঙ্গলক্ষ্মী**, মাঘ ১৩৪৪। এসব কথা যে পুরুষের কথারই প্রতিধ্বনি তা বোঝার জন্যে অন্য একটি উদ্ধৃতি দিই : 'সুতরাং নিঃসংকোচে জোরের সহিত বলা যাইতে পারে যে স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ ও ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাহাতে বালিকারা সুমাতা এবং সুগৃহিণী শিক্ষালাভ করিতে পারে।'—সুমিতকুমার চক্রবর্তী, 'স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ' প্রবাসী চৈত্র ১৩২২, পৃ ৬১৮-২২

৭. দ্রষ্টব্য : **পরিচারিকা**, কার্তিক ১২৯৭

৮. দ্রষ্টব্য : **বান্ধব**, পৌষ ১২৮১, পৃ ১৮৪

৯. দ্রষ্টব্য : **প্রবাসী**, বৈশাখ ১৩১৬, পৃ. ৭২

১০. **প্রবাসী**, বৈশাখ ১৩১১, পৃ. ৫১

১১. 'ফস্কা গেরো' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল 'বিচিত্রা' পত্রিকায়, ১৩৩৮ সালে শ্রাবণ-আশ্বিন।

১২. বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, 'সিরাজির পেয়ালা', পুনর্মুদ্রিত, **এক্ষণ**, শারদীয়, ১৪০১, পৃ. ২৭১

১৩. দ্রষ্টব্য : জনৈক বিধবা, বিধবার ব্রহ্মচর্য, প্রবাসী, পৌষ ১৩১৪, পৃ. ৫২৭-৩০

১৪. দীনেশচন্দ্র সেন, 'হিন্দুরমণীর সামাজিক অবস্থা', বৈশাখ ১৩১২, পৃ. ৪০

১৫. দ্রষ্টব্য, কৃষ্ণভাবিনী দাস, 'বিধবার কাজ ও ব্রহ্মচর্য', প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮, পৃ. ৩৪৭-৫০

১৬. দ্রষ্টব্য, জ্যোতির্ময়ী দেবী, "বালবিধবা ও ব্রহ্মচর্য', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮, পৃ ৪৯৪-৯৬

১৭. দ্রষ্টব্য, জ্যোতির্ময়ী দেবী, স্মৃতি বিস্মৃতির তরঙ্গ, 'জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন' দ্বিতীয় খণ্ড।

১৮. দ্রষ্টব্য, ফুলকুমারী দেবী, বিধবা বিবাহ, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২, পৃ. ১০০-০৩

১৯. সুরেন্দ্রনাথ দাশ, 'নারীর ব্রতসাধনা', **বঙ্গলক্ষ্মী**, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪, পৃ ৫৪

২০. জ্যোতির্ময়ী দেবী, 'আমার কথা' ('এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসের ভূমিকা), জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১২৫

১৯৯৫

মেয়েদের গল্পে মেয়েদের কথা

গল্পলেখিকাদের পৃথকভাবে আলোচনা করা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। স্বয়ং লেখিকারাই হয়তো লিঙ্গ-চিহ্নিত হতে আপত্তি করবেন। করার কারণও আছে। অনেক সময়ই আলোচকরা নারী-লেখিকাদের দ্বিতীয় কোনো শ্রেণীর জীব মনে করেন, আর প্রশংসা করার সময় বলেন—বাঃ, এ তো বেশ প্রথম শ্রেণীর (অর্থাৎ পুরুষ-লেখকদের) মতোই হয়েছে! যেমন বলেছেন উজ্জ্বলকুমার মজুমদার আশাপূর্ণা দেবী সম্বন্ধে : 'আশাপূর্ণা অসাধারণ দক্ষতায় পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের গল্পকার মতি নন্দী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় কিংবা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছেন।' অথচ আশাপূর্ণা গল্প লিখছেন উক্ত পুরুষ-লেখকদের প্রায় জন্মসময় থেকে! বলা কি উচিত নয় তাই উলটো করে—মতি নন্দী কিংবা অন্যান্যরা আশাপূর্ণার মতোই উচ্চমানের গল্প লিখেছেন? সাহিত্যের ইতিহাসে বা সাহিত্যের অধ্যাপনায় নারী-লেখিকাদের বিষয়ে এরকম মানবিভ্রম ঘটে বলেই লেখিকারা লিঙ্গচিহ্ন পছন্দ করেন না। অথচ জীবনের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির অংশীদার নারী-পুরুষ উভয়েই সমভাবে হলেও, এমন কিছু কিছু অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি আছে, যা কেবলমাত্র নারীর কিংবা কেবলমাত্র পুরুষের। বিশেষত, সমাজে এবং পরিবারে নারীর পরিস্থিতি পুরুষের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে বিষয়ে নারী যেভাবে প্রশ্ন তুলতে পারেন, প্রতিবাদ জানাতে পারেন, কোনো পুরুষ সেভাবে পারবেন না, নারীর অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির বর্ণমালা অনেকটাই পুরুষের অজানা থেকে যায় বলে। মেয়েদের লেখা গল্পে অনেক সময়ই তাই একটা স্বতন্ত্র স্বাদ থাকে। যেজন্য মেয়েদের গল্পের পৃথক সংকলন করার প্রয়োজন অনেকেই বুঝেছেন। সংকলন করেছেন অবশ্য মেয়েরাই। সংকলয়িতারা কেউ চেয়েছেন নারীমনের আলোটিকে ধরতে, কেউ চেয়েছেন নারীর পারিবারিক সামাজিক অবস্থানগত সচেতনতার দিকটি নির্দেশ করতে, কেউ-বা দেখাতে চেয়েছেন নারীর অন্দরমহল আর অন্তরমহলের পরিচয়টুকু শুধু। নারী-রচিত গল্প সম্বন্ধে সংকলয়িতাদের অভিমতও একরকম নয়। যেমন বাণী বসু বলেন 'আবেগের চোরাবালি' থেকে নাকি 'লেখিকা মানস' কিছুতেই বার হতে পারেনি, তাঁর মনে হয়েছে নারীমানস স্বর্ণকুমারী থেকে সীতা দেবী পর্যন্ত নাকি এক 'কিশোরীমানস', লীলা মজুমদারের সময় থেকেই নাকি 'বাংলার লেখিকা মানস পুরোপুরি সাবালক হয়েছে।' অথচ আরেক সংকলয়িতা শ্যামলী গুপ্ত নারীরচিত গল্পে আদৌ 'আবেগের চোরাবালি' দেখেননি। তিনি দেখেছেন—তেরোশো বঙ্গাব্দের শুরু থেকেই মেয়েরা তাদের 'অধিকারের সন্ধান ও প্রতিষ্ঠার আর্তি' নারীচরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পেরেছে। শ্যামলী গুপ্তের সংকলনের গল্পগুলি তাঁর এ সিদ্ধান্তের প্রমাণও দেয়। মেয়েদের কলমে তীব্র প্রতিবাদধর্মী গল্প, আলোচনাপ্রধান গল্প পড়ে আমরা বিস্মিত হই। গৃহকোণে বন্দি থেকেও মেয়েরা কীভাবে এমন বুদ্ধিদীপ্ত গল্প লিখতে পেরেছেন—বিস্মিত হই সেই ভেবে। প্লটপ্রধান আবেগময় গল্প মেয়েরা যে লেখেননি এমন নয়। কিন্তু এরকম বেশ কিছু গল্প রয়েছে, যার মধ্যে প্লট গৌণ, আসলে গল্পের মাধ্যমে প্রশ্নে-প্রতিবাদে-প্রত্যাখ্যানে সজীব এক নারী-আলোচনা হাজির করা হয়েছে দেখতে পাই।

২.

তখনকার কালে অধিকাংশ বাঙালি মেয়েরই জীবন-পরিস্থিতি ছিল লাঞ্ছনা আর নিপীড়নে ক্ষতবিক্ষত। জন্ম-পরিবার থেকে উপড়ে এনে যে পরিবারে তাদের রোপণ করা হত, সেখানে কোনো আকাশ থেকে কোনো শুশ্রূষার জল তাদের প্রাপ্য ছিল না। সে জল-বিহনে প্রায়শই অনুভবশীল মেয়েরা শুকিয়েই মরে যেত, তাদের হত্যা করার জন্যে আর আলাদা করে কষ্ট করার দরকার হত না। এই করুণ কাহিনী নানাভাবে স্বর্ণকুমারী থেকে শুরু করে আমরা অনেক নারী-লেখিকার গল্পেই খুঁজে পাই। স্বর্ণকুমারীর 'লজ্জাবতী' এই জাতীয় গল্পের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। মেয়েদের অন্তর-জগৎ আর তার বাইরের পরিস্থিতির বৈপরীত্য বড় বেদনাময় ভাষায় ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রকন্যা মাধুরীলতা, 'সৎপাত্র' নামে গল্পে : 'কথকে যাহা শিখায়, রামায়ণে যাহা শোনে, তাহাতে সমস্ত বিগলিত চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া ছোটে, কিন্তু পাষাণ সংসারে ঘা খাইয়া সে ফিরিয়া আসে, তখন জগতের কোন্‌খানে তাহার বেগকে সে সংবরণ করিবে!' 'সৎপাত্র' গল্পের 'সৎপাত্র'টি প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে পরপর তিনটি স্ত্রীকেই হত্যা করে! কোথাও কোনো প্রতিবাদ দেখানো হয় না তার! শৈলবালা ঘোষজায়ার লেখা অনেক গল্পেই এ জাতীয় চূড়ান্ত নৃশংসতার ছবি পাই। কিন্তু প্রতিবাদও থাকে কোনো কোনো গল্পে। নিরুপমা দেবীর লেখা 'অনি' গল্পটিতে যেমন। অকথ্য অত্যাচারের পর হাতের লোহা পর্যন্ত জবরদস্তি করে কেড়ে নেয় স্বামীগৃহের পরমাত্মীয়রা, এবং 'অনি'কে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে ছেলের দ্বিতীয় বিয়ে দেয়। অবস্থার ফেরে একদা-দজ্জাল শাশুড়িকে প্রাণ ফিরে পেতে হয় একদিন সেই পরিত্যক্তা অনিরই শুশ্রূষায়, কিন্তু অনুতপ্ত চিত্তে তিনি যখন তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে চান, সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে অনিই, এবং বিবাহকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার জন্যে বিধবার বেশ ধারণ করে। শান্তা দেবীর 'সিঁথির সিঁদুর' গল্পেও সিঁদুর মুছে বিবাহকে অস্বীকার করতে চায় নায়িকা, তার স্বামীর অন্য নারী ঘরে নিয়ে আসার প্রতিবাদ হিসেবে। সীতা দেবীর 'স্বর্ণশৃঙ্খল' গল্পে ঘর ছাড়ে নায়িকা, কিন্তু অত্যাচার বা অবহেলার প্রতিবাদে নয়, স্বাধীনতাহীনতার প্রতিবাদে, নারীর আত্মস্বরূপের অবমাননার প্রতিবাদে : 'এত আদরে ঘেরা থাকতেও, ক্রমে বুঝতে পারছিলাম আমার অভাব কোনখানে। আমার স্বাধীন মনুষ্যত্ব ক্রমেই লুপ্ত হচ্ছিল, আমি দিনের পর দিন স্বামীর হাতের খেলার পুতুল হয়ে উঠছিলাম। তাঁর মর্জিমত তিনি আমায় সাজিয়ে-গুজিয়ে ভালো করে রেখেছিলেন, আবার যদি মর্জি হয় ভেঙে আবর্জনার কুণ্ডে ফেলে দেবেন।' পুরুষের এই প্রভুত্বপরায়ণতার চূড়ান্ত সমালোচনা পাই শৈলবালা ঘোষজায়ার 'জামাইবাবু' নামে গল্পটিতে। পিতৃতন্ত্রের দম্ভ অত্যন্ত উৎকটভাবে প্রকাশ করে সেখানে এক জামাইবাবু, সে দম্ভ কত যে অন্তঃসারহীন, পুরুষটির চরিত্রের নীচতাই তা বুঝিয়ে দেয়। অথচ সেসব দম্ভময় উক্তি তো সে-সময় সর্বত্রই মেয়েদের শুনতে হয়েছে; যেমন—'শক্ত শাসনে না থাকলে মেয়েমানুষ কখনো নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না, স্বাধীন হলেই মেয়েমানুষ উচ্ছন্ন যায়।...স্বাধীনতার দাবি করবার অধিকার মানুষের আছে বটে—কিন্তু মেয়েমানুষ যে আলাদা জাত।' কাহিনী একটি আছে এ গল্পে, কিন্তু কাহিনীটি গৌণ, নারী-আলোচনাই প্রধান, সে আলোচনা আদৌ আবেগকম্পিত নয়। সে আলোচনায় আক্রমণের লক্ষ্য—পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, পুরুষ নয়। তাই পুরুষের নীচতার পাশাপাশি পুরুষের জবানিতেই বলা হয়েছে : 'এ সমাজে কুক্কুরী, শূকরীদের সম্মান আছে, কিন্তু সিংহবাহিনীদের সম্মান নাই। আপনাদের জন্যে এখানে আছে শুধু অবজ্ঞা, ঘৃণা, কুৎসা, অপবাদ, লাঞ্ছনা, নির্যাতন। আপনাদের অবস্থার পক্ষে এইটেই ন্যায্য প্রাপ্তি বলে মনে করুন।...বলুন ওদের, ওরে চির লাঞ্ছিত, চির প্রতারিতের দল, তোরা মিথ্যাবাদী কাপুরুষদের কথাকে ভয় করে মাথা নোয়াস নে। কথার অত্যাচারকে যতই ভয় করবি ততোই বেড়ে উঠবে।' পুরুষের জবানিতে বলা এই কথাগুলির মাধ্যমে লেখিকা যেন এক আন্দোলনেরই ডাক দিচ্ছেন—নারীবাদী আন্দোলনের ডাক।

লক্ষ করতে হবে, পুরুষের জবানিতেই বলতে হয়েছে কথাগুলি। মেয়েদের বুকের তলায় লুকিয়ে থাকে আগ্নেয়গিরির আগুন, কিন্তু তার পরাধীন পরিস্থিতি তো তাকে স্বরহীন করেই রাখে! সেই পরিস্থিতিরই আরেক নাম সংসার, মেয়েদের সীমাস্বর্গ! তারা নাকি সেই সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী। বাণী রায়ের একটি গল্পের নায়িকা মুখ বুজে সেই সংসারের যাবতীয় নির্যাতন সহ্য করে আর নিভৃত সময়ে মনে মনে হাসে মেয়েদের পরিস্থিতির এই নিদারুণ আয়রন বুঝে নিয়ে : 'হিন্দু ঘরের মেয়ে, তাকে বিয়ে করে পুরুষ নারীজন্ম ধন্য করে দিয়েছে এই সংসারের জন্য। একাধারে দাসী, পাচিকা, সেবিকা যে অন্যত্র দুর্লভ। প্রেমের প্রয়োজন? তা টাকা ফেল্লে দেহের দাবি মেটাতে অনেক নারী মেলে। কিন্তু সব কয়েকটির একত্র সমাবেশ বিবাহিতা স্ত্রীতেই সম্ভব। এক্ষেত্রে আবার বংশরক্ষার ব্যবস্থাও আছে। তাই তো আজ বাংলার গৃহে গৃহে এইসব রমণীর প্রাচুর্য, যাদের সহধর্মিণী বলতে কেবল শয্যাসঙ্গিনী বোঝায়, যাদের ক্লান্ত অসহায় মুখে, দীপ্তিহীন নেত্রে যুগান্তের শ্রান্তি, ভীতি-সঙ্কুল পরাধীনতা লেখা রয়েছে। দিনের পর দিন চোখ বাঁধা কলুর বলদের মত তারা সংসারের চাকা ঘুরিয়ে যাচ্ছে, অবাঞ্ছিত সন্তানের পাল লালন করছে।' 'শূন্যের অঙ্ক' নামে গল্পগ্রন্থ থেকে এই উদ্ধৃতি নেওয়া। এই বইয়ের ভিন্ন ভিন্ন গল্পে মেয়েদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানকে উপস্থিত করেছেন লেখিকা, 'শুদ্ধি' গল্পে যেমন পাই ধর্ষিতার অবস্থান। বিশের দশকে ধর্ষিতা মেয়েদের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছিল সমাজপতিরা। সমাজে যেহেতু ধর্ষিতা মেয়েদের পতিতা বলেই গণ্য করা হত, তাই তাদের প্রতি অনুকম্পাবশতই সমাজপতিরা প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে তাদের জাতে তোলার একটা বিধান দিয়েছিলেন। যদিও, তখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো মানুষও ছিলেন, ১৩৩৪ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় এর প্রতিবাদ করে তিনি বলেছিলেন 'পাতিত্য' হওয়া উচিত ধর্ষিতার আত্মীয়দের, যারা রক্ষা করতে পারেনি নিজের ঘরের নারীকে। কিন্তু এঁদের সংখ্যা তো অল্পই। তাই বাণী রায়ের গল্পে রমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তবে ঘরের লোক ঘরে নেবে। রমা মনে-মনেই প্রশ্ন করে—এসব তাকে কেন করতে হচ্ছে? তার কী দোষ? গল্পের কথক তার উত্তর দেন : 'কি নির্বোধ রমা! যুগ যুগ ধরে তো তুমি এই করেছ। রামের সীতা, সীতারামের রমা রূপে তুমি তো চিরকাল এই করেছ। অক্ষম পুরুষের অক্ষমতার জের টেনেছ তুমি, তোমার বিচার করেছে সেই অক্ষম পুরুষ! হাস্যকর ভাবে তোমার শুদ্ধির বিধান দিয়েছে সেই পুরুষ দয়ার্দ্র চিত্তে। তুমি আত্মহত্যা করলে তোমার যশোগান গেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। তোমাকে প্রগতিশীল দেখলে নিন্দা করেছে, বিবাহ করে সমান অধিকার দিতে চায়নি। অবলা তুমি, স্বেচ্ছায় রক্ষার ভার সবলের হাতে তুলে দিয়ে পরাধীনতার আরামে নিমগ্ন ছিলে। আজ আশ্চর্য হচ্ছ কেন? তোমার ব্যথায় নেতাদের মাথা ধরে উঠেছে। যে যা বলে, করে যাও।' ছোটগল্পের গল্পকে গৌণ করে দিয়ে লেখিকা এইভাবে নারী-আলোচনাই বিশেষভাবে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। 'শূন্যের অঙ্ক' বইটির একটি ভূমিকা লিখেছিলেন সুচেতা কৃপালনি। সেই ভূমিকাতে তিনি বলেছিলেন, মেয়েদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে, নোয়াখালির কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্যে গিয়ে তাঁকে বুঝে নিতে হয়েছে—'সত্যই আমাদের দেশের মেয়েদের সমষ্টিগত জীবন শূন্যের অঙ্ক।' বিশ শতকের প্রথমার্ধে মেয়েদের গল্পে এই শূন্যের অঙ্কের কথাই বারবার আসে। খ্যাতনামা কিংবা অখ্যাতনামা যেমনই হোক লেখিকার পরিচয়, তাঁদের লেখায় সদ্য জাগ্রত আত্মসচেতনতা আর সমাজ-নির্দিষ্ট গৃহ-পরিস্থিতির দ্বন্দ্ব নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'অনাদৃতা' নামের একটি গল্পে লেখিকা অমিয়া চৌধুরী প্রশ্ন তুলেছেন—'আমাদের দেশের ছেলেরা বিবাহ করে কেন বল দেখি? ঝি বা রাঁধুনী তো টাকা দিলেই পাওয়া যায়, তাহাই সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদের দেশের কলেজে পাশ করা ছেলেগুলো পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে কেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।' স্বামীর কাছ থেকে আধুনিক যুগের মেয়েরা নিছক আদর নয়,

চায় সম্মান। সেই চাওয়ার কথা উর্মিলা দেবীর 'কল্যাণী' গল্পে স্বামীরই জবানিতে বলা হয়েছে : 'এতদিন তোমায় নিয়ে শুধু পুতুল খেলাই করেছি, ভোগের জিনিস বলেই তোমায় অপমান করেছি। আজ বুঝতে পারছি তুমি আমার গৃহের কল্যাণের প্রতিমা...'।

হ্যাঁ, তখনও পর্যন্ত এইটুকুই চেয়েছে মেয়েরা—'গৃহের কল্যাণের প্রতিমা', বাইরের জগতে পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকারের দাবি তারা তোলেনি। কিন্তু কীভাবে হবে তারা গৃহের কল্যাণের প্রতিমা, বিবাহ যেখানে রূপ যাচাই আর দর-কষাকষির ধাপ না পেরিয়ে সম্পন্ন হতে পারে না? পণপ্রথা—যার দুর্দণ্ডপ্রতাপ আজও সমাজের বুকে জাঁকিয়ে চলেছে, গল্পের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ আমরা রবীন্দ্রনাথের কলমে উনিশ শতকের সীমাতেই পেয়ে গিয়েছি। 'দেনা-পাওনা' গল্পে ছিল পণপ্রথাকে কেন্দ্র করে পতিগৃহের অমানবিক নিষ্ঠুরতার কথা। কিন্তু মেয়েরা পণপ্রথার মধ্যে আত্মমর্যাদার অবমাননা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। গিরিবালা দেবীর একটি গল্পে রয়েছে—কুদর্শন এক পুরুষ কনে দেখতে এসে শুধু পণের অঙ্ক স্ফীত করার জন্যে সুন্দরী মেয়েটির রূপের সমালোচনা করে চলে যায়। মেয়েটির বউদি তখন তাকে খুব যত্ন করে একটি আয়না উপহারস্বরূপ পাঠিয়ে দেয়। আর মেয়েটি বলে কেউ যদি তাকে 'লাউ-কুমড়োর মত নেড়েচেড়ে না দেখে বিনি পয়সায় ঘরে নিতে পারে', তবে সে যে-কোনো কানা-খোঁড়াকেও বিয়ে করতে রাজি। সুরুচিবালা রায় 'আত্মদান' নামে গল্পটিতে দেখিয়েছেন ভালোবেসে বিয়ে করতে গিয়েও গল্পের নায়ক 'বাবার ইচ্ছে' বলে পণ নিতে পিছপা নয়। নায়িকা বুঝতে পারে নায়কের ভালোবাসা আসলে রূপজ মোহ মাত্র, তার মনে প্রশ্ন জাগে : 'তাহার এত শিক্ষা, এমন জ্ঞান, তাহার মন, তাহার হৃদয়—পুরুষ মানুষ কি এসব কিছু চাহে না? তাহার কি একমাত্র প্রয়োজন বধূর রূপ এবং তাহার পিতৃরক্ত শোষণকারী অর্থ?' রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'র মতোই, হয়তো বা তারই প্রভাবে, এই নায়িকা, যমুনা যার নাম, নিজের রূপকে ঘৃণা করেছে। অনায়াসলব্ধ দেহসৌন্দর্য বিষয়ে বিতৃষ্ণা এসেছে তার। প্রেমিকের প্রতি তীব্র আবেগময় তার অন্তরুক্তি : 'ওগো পুরুষ, তুমি কি খালি এই রূপখানিই দেখিলে? ইহার অন্তরালে একটি বুভুক্ষু হৃদয় যে তাহার প্রাণভরা আকাঙক্ষা নিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেটা কি কিছুই হইল না? আমার প্রাণের কথার চেয়ে আমার দেহটাই কি এত বড় হইয়া গেল? আমার ইচ্ছা, আমার বাসনা বলিয়া কি কিছু একটা নাই? খালি রূপ, রূপই কি আমার সব? ওগো, ভালো তো আমিও বাসি, কিন্তু সে তো তোমার ঐ মূর্তিকে নয়, আমি যে ভালোবাসি তোমাকে।' 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রভাব থাকলেও স্বরভঙ্গি এখানে একান্তই মেয়েলি। নারী-পুরুষের ভালোবাসার পার্থক্যও এখানে নারী-লেখিকা নিজের মতোই করেছেন। এছাড়া তাঁর নায়িকা তো 'চিত্রাঙ্গদা'র মতো গদগদ হয়ে রূপমুগ্ধ প্রেমিককে গ্রহণ করে কৃতার্থ হয় না, প্রত্যাখ্যান করে, গভীর ভালোবাসা বুকে নিয়েও। জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'দর ও দস্তুর' নামে গল্পে নায়িকা প্রশ্ন তোলে উলটো দিক থেকে : চুল খুলে শাড়ি তুলে কনে-দেখা, সোনা যাচাই করা, টাকাপয়সা নিয়ে দরদাম করা—এই সবের ভিতর দিয়েই সংঘটিত হচ্ছে প্রতিটি বিয়ে, সেই বিয়ের পর মেয়েটি তার স্বামীকে ভালোবাসতে পারে কী ভাবে? একটি কালো মেয়ে, নিভা যার নাম, জনে জনে এই প্রশ্ন করে বেড়ায়, আর তার বাবার কাছে উত্তর পায়—'ভালোবাসতে কোনোই বাধা হয় না।' কেন, কেন বাধা হয় না? আর কারণ কি এই নয় যে, 'অন্ন-আশ্রয়দাতা' প্রভুকে ভালো না বেসে দাসের আর উপায় কী? কোথায়ই বা যাবে সে? শুধু এইটুকুই দেখেন না জ্যোতির্ময়ী, তিনি জানেন মানুষ তো আর সত্যিই দাস বনে যেতে পারে না, সে শুধু দাস সেজে থাকে। অনেক মিথ্যা দিয়ে তৈরি হয় সেই সাজ। তাঁর 'অনৃতভাষিণী' গল্পের মধ্যে আছে সেই মিথ্যার কথা। 'নোরা ও আমি' গল্পে আছে

সেই মিথ্যার কথা। নোরা—ইবসেনের নোরাকে এনে জ্যোতির্ময়ী তার বিপরীতে রাখেন অসহায়া বাঙালি মেয়েকে, সব জেনেবুঝেও যে চলে যায় না, মিথ্যে হয়ে সংসার আঁকড়েই বাঁচে।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর গল্পে মেয়েদের পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তো থাকেই, প্রতিবাদও থাকে। আশাপূর্ণা দেবীর অধিকাংশ গল্প ঠিক এই ধারার নয়। তিনি নিজেই বলেছেন : 'নিরন্তর এই অফুরন্ত জীবনকে দেখে চলেছি এবং বলেও চলেছি আমার ছোটগল্পগুলির মধ্যে। সেখানে আমার ভূমিকা আদৌ বিদ্রোহিনীর নয়। কেবলমাত্র নিরাসক্ত দর্শকের অথবা কথকের।' হ্যাঁ, ঠিকই ; আশাপূর্ণার অধিকাংশ গল্পের মেয়েরা ভূমিকা পালন নিয়ে প্রশ্ন তোলে না, সমাজরীতি নিয়ে প্রতিবাদ করে না। কিন্তু কোনো কোনো গল্পে করেও আবার। আশাপূর্ণার একেবারে প্রথম দিকের লেখা 'পত্নী ও প্রেয়সী' নামে গল্পটিতেই বিদ্রোহ না হোক প্রতিবাদের স্বরটি আয়রনির মাধ্যমে হাজির করা হয়েছে। যেখানে স্বামীর অন্তরুক্তিতে থাকে—'পুরুষের মুখে মানায় বলিয়া, কিছু আর সব কথা স্ত্রীলোকের মুখে মানায় না।' স্বামীটি বিয়ের আগে প্রেম করার জন্যে হন্যে হয়েছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর বিয়ের আগে প্রণয়ী ছিল শুনে রাগে গর্জন করতে শুরু করেন। তাঁর 'সৌরভ-সার' গল্পের নায়িকা বলে—'কেন আমি ওর ইচ্ছের পুতুল হয়ে পুতুলের মত রূপসজ্জা করে হাসুনে পুতুলের মুখ নিয়ে ওর সেই পেটমোটা বন্ধুদের সঙ্গে পার্টিতে পার্টিতে ঘুরব!' দেখা যাচ্ছে তাঁর আগের যুগের লেখিকাদের গল্পে যেমন, তাঁরও গল্পে তেমনি, স্বামীর হাতের পুতুল হয়ে-থাকার প্রতিবাদ রয়েছে। উনিশ শতকের মেয়েদের গদ্য লেখায় ঘুরে ঘুরে এসেছে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির উপমা, বিশ শতকের মেয়েদের গল্পে তার বদলে এলো খেলার পুতুলের প্রতিমা। ইবসেনের 'পুতুলের ঘরে'র কোনো প্রভাব কি কাজ করেছে এখানে? মনে হয়, না। অন্তত আশাপূর্ণা দেবী ইংরেজি বই খুব পড়তেন বলে শুনিনি। যদিও, তাঁর 'তাসের ঘর' গল্পটিতে পাই নোরারই সমতুল্য একটি ঘর ছাড়ার কাহিনী। বাড়ির যে বড়বউ সেবায় পরিচর্যায় সকলের মন ভরিয়ে রেখেছিল, সেই বড়বউ মমতাকেই একদিন সকলেই এমনকি তার স্বামীও চরিত্রহীন সাব্যস্ত করে বসে, শুধুমাত্র তার ঘরে পরিত্যক্ত পুরুষ-পোশাক দেখে! অথচ সে পোশাক ছিল পুলিশের তাড়া খেয়ে আশ্রয় নেওয়া মমতার এক স্বদেশী-করা ভাইয়ের। পরিবারের সবক'টি সদস্যকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে যে ঘর মমতা রচনা করেছিল, সে যে তাসের ঘর মাত্র, এই উপলব্ধিতে ঘর ছাড়ে মমতা! আশাপূর্ণার অন্য একটি গল্পে এমনকি প্রঘাত (ভায়োলেন্স)-প্রখর প্রতিবাদেরও নজির রয়েছে। 'ইস্পাতের পাত' গল্পে সুখীর শত আপত্তি কানে না তুলে স্বামী তাকে হম্বিতম্বি করে অন্য পুরুষের ঘরে পাঠিয়ে টাকা উপার্জন করায়। খাঁচার পাখি ছিল সুখী, স্বামী বিস্ময়ে লক্ষ করে, একদিন সেই সুখীই হয়ে ওঠে খাঁচার বাঘ। স্বামী তাকে ছুরি দেখালে সেও স্বামীকে দেখাতে পারে নতুন চকচকে ছুরি।

৩.

কিন্তু এ কথা তো না মেনে উপায় নেই, প্রতিবাদী মেয়েদের সংসারে বড় একটা দেখা যায় না। বরং জ্যোতির্ময়ী যেমন দেখিয়েছেন, মিথ্যে হয়ে বেঁচে থাকাই অধিকাংশ মেয়ের নিয়তি। আশাপূর্ণারও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দেখিয়ে দেয় সেই ভূমিকা পালনের অসারত্তা। ভূমিকাপালনকে অমোঘ বলে মেনেই আশাপূর্ণার নায়িকা বলে—'স্নেহ ভালোবাসা মায়া মনুষ্যত্ব এসব প্রকাশের অধিকার মেয়েদের নেই...।' সামাজিক ভূমিকা পালন মেয়েদের এতটাই পঙ্গু করে রাখে যে, 'আমায় ক্ষমা করো' গল্পের হৈমন্তী নিজের স্বামীর সঙ্গেও রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যেতে পারে না। হয়তো আমাদের মনে পড়বে 'শ্রীকান্ত'র অন্নদাদিদির আদর্শায়িত বিপরীত চিত্র! না, এমন গরিমা আশাপূর্ণা তাঁর সৃষ্ট মেয়েদের দিতে পারেননি। তিনি বরং প্রশ্ন তুলেছিলেন : 'জীবনের কি সত্যই কোনো অর্থ আছে?

কোনো অর্থ, কোনো সার্থকতা? না শুধু অসহায় মানুষকে লইয়া বিধাতার একটা অর্থহীন রূঢ় পরিহাস? তাই লাঞ্ছিত মানুষ আত্মবঞ্চনায় বিধাতাকেও ঠকাইতে চায়?' হ্যাঁ, এই আত্মবঞ্চনাই গল্পের পর গল্পে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন আশাপূর্ণা। অন্যদিকে, আধুনিক যুগে পয়সাওয়ালা ঘরের আত্মসচেতনতাহীন মেয়ে-বউদের অমানবিক স্বার্থপরতার ছবিও তিনি কম আঁকেননি। কলমের নিষ্ঠুর আঁচড়ে আশাপূর্ণা তাঁর প্রতিবাদ ফুটিয়ে তুলেছেন 'আজকের এই দুঃশাসন যুগের' বিরুদ্ধে, যে যুগে মেয়েরাই বিশেষভাবে পণ্যরতির বাহক। সেই নেশায় কত অনায়াসে তারা আত্মীয়জন এমনকি ছেলে-মেয়ে-স্বামীরও দায় অস্বীকার করে! এ তো গেল নবীনাদের কথা। প্রাচীনাদের চরিত্রেও আশাপূর্ণা কোনো গৌরব আরোপ করেননি। প্রাচীন-নবীন দুই যুগ মিলিয়ে যে গার্হস্থ্য বাস্তবতার চিত্র দাখিল করেছেন এই লেখিকা, তার মধ্যে কোনো মধুররসের জোগান নেই, সবটাই তিক্ত, বড়ো বেশি তিক্ত। তারও মাঝ থেকে তবু উঠে আসে এক ইতিহাস—সাবেককালের মেয়ের থেকে শুরু করে আজকের কাল পর্যন্ত মেয়েদের গার্হস্থ্যজীবনের পরিবর্তমান ইতিহাস।

মেয়েদের গল্পে এইভাবে ইতিহাসের লুকোনো পিঠটা সামনে এসে যায়। মেয়েদের ইতিহাস। 'মেয়েদের কোনো ইতিহাস নেই'—এই অভাব অনুভব করেছিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী, আর তাঁর গল্পের মধ্যে দিয়ে সচেতনভাবে এ অভাব-পূরণের প্রয়াসও করেছেন। তাঁর জীবনের বড় একটা কালপর্ব অতিবাহিত হয়েছে রাজস্থানে। সেই রাজস্থানের পটভূমিতেই সমাজে মেয়েদের পরিস্থিতি—তার অসহায়তাকে ধরতে চেয়েছেন তিনি। মেয়ে বিক্রি করে দেওয়া, বিষ দিয়ে শিশুকন্যাকে হত্যা করা, ঈর্ষার কারণে বালিকাকে চিরকয়েদে নিক্ষেপ করা—এসবই তো ইতিহাসের সেই স্থাণু অন্ধকার পিঠ—জ্যোতির্ময়ী যা উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন তাঁর নানান গল্পে, এ পিঠে আধুনিক যুগের আলো পৌঁছয় না। অন্যদিকে, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় সতীদাহ প্রথা, মেয়েদের স্কুল তৈরির মিশনারি প্রয়াস, অপহৃতা আর সেই কারণে পরিত্যক্ত মেয়ের খ্রিস্টমিশনে আশ্রয় পাওয়া, বারবনিতার বহু প্রয়াস সত্ত্বেও সমাজে স্থান-না-পাওয়া, কিংবা পার্টিশনে হারিয়ে যাওয়া মায়ের মেয়েকে চিনেও না-চেনা—এসব বিষয় নিয়ে গড়ে-তোলা গল্পগুলিতে জ্যোতির্ময়ী মেয়েদের ইতিহাসের জঙ্গম দিকটি তুলে আনতে চেয়েছেন।

৪.

মহাশ্বেতা দেবী মেয়েদের ইতিহাসকে পৃথক করে দেখানোর প্রয়াস করেননি। তাঁর গল্পে থাকে ইতিহাসে মেয়েদের স্থান। তাই একটি মেয়ের গল্প থেকে তিনি একটি শ্রেণীর ইতিহাসে পৌঁছে যেতে পারেন। 'বিশালাক্ষ্মীর ঘর' গল্পটি যেমন। এ গল্পের নায়িকা বিশালাক্ষ্মী ওরফে বিশু বড় ঘরের মেয়ে হয়েও কোনো কিছুই আপন করে হাতে পায়নি কোনোদিন। 'মানুষ ওকে শুধু ব্যবহার করেছে একদিকে, অন্যদিকে গালাগালি করেছে।' বিশু কিছু আত্মসচেতন মেয়ে নয়। 'বিশুকে যারা গামছার মতো মুচড়ে মুচড়ে কষ্ট দেয়, ও তাদের জন্যেই জীবন দেয়। এটা ওর স্বভাব।' হ্যাঁ, আমাদের সমাজে আজও, যদি শুধুই শহুরেদের হিসেব না ধরে গোটা দেশের সমাজের কথা ধরি, অধিকাংশ মেয়েরই এমন স্বভাব। এই মেয়েদের সহজেই প্রতারিত করা যায়। বিশুও নানাভাবে নানা স্তরে প্রতারিত হয়। সেই প্রতারণার ইতিহাসই একভাবে এদেশের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের দলিল, যার ভিতর দিয়ে শ্রেণী হারাতে হারাতে বিশু একদিন 'ভারতের নিঃস্ব দরিদ্র-উপবাসীর শ্রেণীতে' পৌঁছে যায়। লেখিকা চূড়ান্ত শ্লেষ কণ্ঠস্বরে নিয়ে বলেন, 'তার শ্রেণী তার সমাজ সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে বেশি সে সমাজের ক্ষমতা। ভিখিরির জাত মারে কে?' কীভাবে মানুষকে ভিখিরি বনে যেতে হয়,

বেশ কয়েকটি গল্পে মহাশ্বেতা তার বিবরণ দিয়েছেন, অথচ তার ভিতরে রয়েছে মেয়েদের যন্ত্রণার জগৎ, কখনো সে স্ত্রী, কখনো সে মা। এরকমই এক মায়ের মেয়ের নাম যমুনাবতী, সে মেয়েকে মা একটি পুতুল দিতে চেয়েছিল, পারেনি। একদিন সে বুঝতে পেরেছিল তার ইচ্ছার, তার ভালোবাসার, এমনকি তার মতো মানুষের কোনো জায়গা নেই এ শহরে—'ওকে, ওর মতো মানুষগুলোকে ফেলে দিতে না পারলে এ শহরের, এ দেশের মুক্তি নেই।' এই শ্লেষের কণ্ঠস্বরই মহাশ্বেতার বৈশিষ্ট্য।

এই শ্লেষের মূলে আছে রাজনৈতিক বোধ। সেই রাজনৈতিক বোধই তাঁর গল্পের নিয়ন্তা। সে রাজনীতিকে তিনি ইতিহাসে, বর্তমানে, পুরুষতন্ত্রে রাষ্ট্রতন্ত্রের সর্বত্র শনাক্ত করেন। তাঁর গল্পগুলি অনেক সময়েই বেশ দীর্ঘ, রাজনীতির চালচিত্রকে তিনি বেশ ফলাও করেই বর্ণনা করেন, গল্পের একতম প্রতীতি তবু ক্ষুণ্ণ হয় না! তাঁর রাজনীতি-সচেতনতা শুধু পেষকের অত্যাচার দেখিয়েই ক্ষান্ত হয় না, সেইসঙ্গে পেষিতর প্রতিবাদকেও চিত্রিত করে কখনো কখনো।,নারীর উপর রাষ্ট্রীয় প্রঘাতের তীব্রতম ছবি রয়েছে 'দ্রৌপদী' গল্পে। ধর্ষণ ব্যাপারটি পুরুষ লেখকরা তাঁদের গল্পে বেশ মশলা মাখিয়ে পরিবেশন করেন। মহাশ্বেতার ভাষায় সেই মশলার বদলে আছে তীব্র গভীর অব্যক্ত ক্রোধ, অসামান্য ভাষায়। গল্পটি শুধু সেই রাষ্ট্রশক্তি এবং পুরুষশক্তির গণধর্ষণের বর্ণনার অসামান্যতাতেই অসাধারণ হতে পারতো। কিন্তু তার অসাধারণত্ব আরো বেশি সেইখানে, সেখানে দ্রৌপদী তার নগ্ন শরীরকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে, শাসক শক্তি সেখানে ভয় পেতে বাধ্য হয়। রাজনীতিমনস্ক মহাশ্বেতা কথায় নয়, বিশ্বাস করেন কাজে, তাঁর গড়া মেয়েরাও তাই কথার প্রতিবাদ নয়, প্রতিবাদ রাখে তাদের আচরণে। তারা শুধু মার খায় না, মারতেও জানে। নারীর হানা প্রঘাতের অসামান্য এক দলিল হলো 'শিকার' গল্পটি। লক্ষ করা দরকার, 'বেদেনী' গল্পে তারাশঙ্করও তো দেখিয়েছেন নারীর হানা প্রঘাত—কিন্তু তার মূলে ছিল তার লালসা, 'মরুক বুড়া পুইড়্যা'—এই বাক্যের তীব্র অমানবিকতা। কিন্তু মহাশ্বেতা দেখান লালসা যেখানে পেষণেরই একটা দিক—তার প্রতিবাদ নারীকৃত হত্যা, যে হত্যা নিষ্ঠুর কিন্তু অমানবিক নয়।

মেয়েদের গল্প পুরুষের লেখা গল্পর থেকে সবচেয়ে বেশি আলাদা হয়ে যায় মাতৃত্বের অভিজ্ঞতার রূপায়ণে। এ অভিজ্ঞতা যে একান্তভাবে মেয়েদেরই। মহাশ্বেতা দেখান, একান্ত ব্যক্তিগত যৌন-অভিজ্ঞতাকে যেমন মেয়েরা বাজারী পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, তেমনিই কখনো তাদের বাধ্য হতে হয় মাতৃত্বের মতো নিভৃত ব্যক্তিগত অনুভবময় অভিজ্ঞতাকেও পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে! সেই পেশাদারি মাতৃত্বের গল্প 'স্তনদায়িনী'। এ গল্পের স্তনদায়িনী যশোদা হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গের প্রতীক। সে প্রতীকার্থ গল্পটিতে একটি রাজনৈতিক মাত্রা সংযোজন করে, অন্য মাত্রায় মহাশ্বেতা তীব্র ব্যঙ্গে ভূষিত করেন মুগ্ধ জননীর চির শিশু বঙ্গীয় বীরপুরুষদের। নারী-লেখিকার কলম ছাড়া এমন সমালোচনা কী করেই বা লেখা হতে পারত!

আমাদের দেশে রাজনৈতিক সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধান একটি সমস্যা হলো—সাম্প্রদায়িকতা। মেয়েদের গল্পে এই সমস্যার উত্তর খোঁজা হয়েছে মেয়েলি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। জ্যোতির্ময়ী দেবী একটি গল্পে দেখিয়েছেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দিশাহারা হিন্দু এবং মুসলমান তরুণীর ভয়ের কারণ মুসলমান বা হিন্দু নয়, শুধুই পুরুষ। আর 'হারুণ সালেমের মাসি' গল্পে মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন এমন এক মায়ের কথা, যার গর্ভজাত হিন্দু ছেলে নিবারণ তাকে শুধু অবমাননাই দিয়েছে, তার তুলনায় পুত্রোপম মুসলমান হারা তার অন্তরের অনেক কাছাকাছি, তাই সে বুঝতে পারে না কে তার সত্যিকার ছেলে—নিবারণ না হারা।

মাতৃত্বের অভিজ্ঞতাকে আরেকভাবে ব্যবহার করেছেন আলপনা ঘোষ, যে ব্যবহার শুধু মেয়েদের কলমেই সম্ভব। মাতৃহৃদয়ের ভিত্তিতে গল্পের যেন নতুন টেকনিক তৈরি করেছেন এই লেখিকা একটি

গল্পে, একটি রাজনৈতিক গল্পে। যথার্থ মাতৃহৃদয়ই জানে নৈর্ব্যক্তিকের এমন অ-নিরাসক্ত উপস্থাপনা। এ গল্পের মধ্যে রুনির মা ছোটদের গল্প শোনায়—তিনটি কিশোরের গল্প, যাদের সকলেরই নাম রুনি, যারা রাষ্ট্রের, সমাজের নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদে আত্মহত্যা করে। কথক মা যখনই নিজের সন্তানের নামে আত্মহত্যাকারী কিশোর-কিশোরীদের নামকরণ করেন, তখনই কথনের সঙ্গে মাতৃহৃদয়ের অকথিত কান্না জড়িয়ে যায়! অল্পই লিখেছেন আলপনা, কিন্তু অসাধারণ তাঁর কলম। দুঃখী মেয়ে, লড়াকু মেয়ের কথা তাঁর গল্পের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেন। মহাশ্বেতা দেবীর সমতুল্য না হলেও আলপনা ঘোষ কিংবা অনিতা অগ্নিহোত্রীর রাজনৈতিক গল্প যথেষ্ট জোরালো। বহির্বাস্তবের বহুমাত্রিক জটিলতা, শোষক-শোষিতর বহুবিধ চেহারা এঁদের গল্পে ধরা পড়ে। অনিতা অগ্নিহোত্রীর একটি গল্পে টাকা-করার প্রক্রিয়ায় সব বিদ্যা, সব সংস্কৃতি আর অবশ্যই নারীও যে কীভাবে মাল—কমোডিটি হয়ে যায় তার ব্যঙ্গমাখানো ছবি আছে। 'কাঁদনা' নামে অনিতার এই গল্পটি পড়ে হয়তো কারো মহাশ্বেতার 'রুদালি' গল্পটি মনে পড়বে, তবু ভুলানির এই কাঁদনা গান—'মুই ঝিই হেলি বলি তুই মোকে নদীতে বহলাইদেলু মাগো'—এ যেন জন্ম-জন্ম যুগ-যুগান্তর ধরে এ-দেশের মেয়েদের চির-অফুরান কান্না—এর কোনো নজির নেই।

৫.

কিন্তু আজকের দিনে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত ঘরের মেয়েরা হয়তো এ কান্নার খবর রাখে না। কতই না বদলে গেল এদের জীবনচিত্র! একদিন মেয়েদের লেখাপড়া শেখা উচিত না অনুচিত—এই নিয়েও কত বিতর্ক ছিল, শিক্ষিত মেয়েদের বিষয়ে কতই না প্রতিকূল মনোভাব ছিল পুরুষ-প্রতাপী সমাজের! শৈলবালা ঘোষজায়ার একাধিক গল্পে তার বিশদ পরিচয় আছে। আর সেইসঙ্গে আছে আত্মশক্তিতে বলীয়ান শিক্ষিত আধুনিক মেয়ের ছবি। তাঁর 'দীপ্তি' নামে গল্পটিতে যার ভালো দৃষ্টান্ত রয়েছে। স্বার্থপর দাম্ভিক অপদার্থ পুরুষ চরিত্রগুলির বিপরীতে এ গল্পের শিক্ষিতা মেয়ে দীপ্তিকে চারিত্রশক্তিতে বুদ্ধিমত্তায় দীপ্তিময়ী করেই উপস্থাপিত করেছেন লেখিকা। মনুর নারীবিরোধী উক্তি নিয়ে বিদ্রূপ করতে পারে এই মেয়ে, বিবাহের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহও ঘোষণা করতে পারে। আজ, সম্প্রতিকালে, মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে যখন কোনো পর্যায়ে কোনো বাধা কোথাও নেই, মেয়েদের জীবনও নয় চার দেয়ালে আবদ্ধ, এমনকি অর্থনৈতিক পরাধীনতাও অনেকাংশে ঘুচেছে, তখন আধুনিক মেয়ের তেমন আত্মশক্তির গরিমায় গরীয়ান ছবি পাই না কেন! বরং অত্যাধুনিকা সোসাইটি-লেডির উচ্ছৃঙ্খলতা, আত্মীয়জন বিষয়ে অনুভবহীনতা—এইসবের উপরই লেখিকারা ঝোঁক দেন তাঁদের গল্পে। পুরুষের সমালোচনা থাকলেও, পাশাপাশি মেয়েদের সমালোচনা তাঁরা কম করেন না। এছাড়া নারী-পুরুষ সম্পর্ক এঁদের কলমে অত্যাচারিত-অত্যাচারী সম্পর্ক হিসেবে শনাক্ত হয় না। আজ মেয়েরা মেয়েদের সমস্যাকে চিহ্নিত করছে অন্যত্র। বিবাহ সম্পর্ক এখন আইন অনুসারে ভাঙা যায়, ভাঙছেও। সেই ভাঙন, কিংবা ভাঙার পর গড়া—মেয়েদের জীবনের মানচিত্রের রদবদল এ-সবকিছুই থাকছে মেয়েদের গল্পে। পিতৃত্বের দায়ের থেকে মাতৃত্বের দায় সামাজিক এবং জৈবিকভাবেও প্রাধান্য পাওয়ায় পিতৃত্বের সঙ্গে প্রেমের বিরোধ পুরুষের গল্পে সেভাবে দেখি না, যেমন দেখি মাতৃত্বের সঙ্গে প্রেমের বিরোধের সমস্যা মেয়েদের গল্পে। বিবাহোত্তর প্রেম-সংকট আগের যুগের গল্পে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

অন্য একটি নতুন দিক হলো মেয়েদের ইচ্ছার প্রকাশ। অন্তত একটি-দুটি গল্প যা আমার পড়া—তার মধ্যে এই ইচ্ছার প্রকাশ আমাকে চমকে দিয়েছে। বাংলাদেশের লেখিকা পূরবী বসুর গল্প এই সূত্রে বিশেষভাবে মনে পড়ে। পশ্চিমবাংলায় মেয়েদের সামাজিক উৎপীড়ন আর সেই সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া নিয়েই নারী-আন্দোলনকারীদের মুখরতা। বাংলাদেশে এখনকার তুলনায় উৎপীড়ন আরো কঠিন,

তাই প্রতিবাদ আরো জোরালো। সেখানকার প্রতিবাদের ভাষাও আলাদা। ঢাকায় ১৯৯২ সালের ৮ মার্চের সমাবেশে একটি স্লোগান ছিল অসংখ্য ফেস্টুনে—'আমার শরীর আমার আছে, অন্যের কি বলার আছে।' ঠিক এরকম স্লোগান, যা মেয়েদের অবস্থানের মূলে গিয়ে আঘাত করে, পশ্চিমবাংলায় কি কল্পনা করা যায়? মেয়েদের মেয়েলিত্বর শিকড়ে যে একটা অনস্বীকার্য বন্যতা আছে, যার উপর পাথর চাপা দিয়ে সমাজ মেয়েদের পোষ মানিয়ে রাখে, তার প্রকাশ মেয়েদের গল্পে সচরাচর দেখিনি বাংলা সাহিত্যে। যৌনতার ক্ষেত্রে মেয়েরা যে নিছক বিষয় নয়, বিষয়ীও হতে জানে তারা—একথাও মেয়েরা কমই বলতে চায়। পূরবী বসুর একটি-দুটি গল্প এর ব্যতিক্রম। 'সালেহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা' গল্পে সালেহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার প্রেমিক তার সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হতে চাইলে, সালেহা তার পুরুষাঙ্গ ছেদ করে প্রতিবাদ হিসেবে। যে সমাজে মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য কোনোদিন কেউ দেয়নি, সে সমাজ যে সালেহাকে নিষ্ঠুর শাস্তি দেবে, এ তো জানা কথা, তবু লেখিকা দেখান, ইচ্ছার এই জোর যেন প্রতিটি ঘরে ঘরে মেয়েদের বুকে স্পন্দন জাগিয়ে গেলে! এই লেখিকারই 'অরন্ধন' গল্পে 'রাধা রাঁধিবে না। রাঁধিবে না তো কিছুতেই রাঁধিবে না'— গৃহবধূ রাধার একদা সাত-সকালে এই ইচ্ছের ক্ষমতার কাছে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গোটা পরিবার!

ইচ্ছের দুর্দমনীয় জোর সুচিত্রা ভট্টাচার্যের একটি গল্পেও দেখেছি। নুরী নামে এক কিশোরী পৃথিবী হতে চায়, পুরুষের শরীরে সোহাগে সে বাঁধা পড়তে চায় না। সে আপনমনে কখনো বলে—'আমি কোকিল কেন হইনি খোদা'; কখনো বা বলে 'মেয়ে মাইনষেরে কেন তালাক দিবার হক দাওনি খোদা?' প্রকৃতিকে সাক্ষী মেনে সে একে একে তার জীবনের সবক'টি পুরুষকে তালাক দেয়। তবু সে তো মুক্তি পায় না, তার শিশুসন্তান তার বন্ধন! রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের তারাপদর সঙ্গে এইখানেই পার্থক্য—পুরুষের সঙ্গে নারীর!

প্রকৃতি-পটভূমি চকিতভাবে নিয়ে আসেন আজকের এই লেখিকারা—বড় দক্ষতার সঙ্গে। আর প্রেম? একমাত্র প্রতিভা বসু ছাড়া আর কোনো লেখিকা আমার জানা নেই প্রেমের গল্পেই যাঁর পক্ষপাত। দীর্ঘ সময় ধরে লিখছেন প্রতিভা বসু, মেয়েদের জীবনচিত্রের রূপান্তর তাঁর গল্পধারায় খুঁজে নেওয়া যায়। অপ্রেমের গল্পও যে তিনি লেখেননি এমন নয়। 'ভালোবাসার জন্ম' গল্পে রোদে দাঁড়িয়ে স্ত্রী কষ্ট পাচ্ছে দেখে স্বামীর 'নিজেকে রাজা মহারাজা' মনে হয়। ব্রজেশ নামে এই স্বামী মেয়েদের মধ্যে শুধু অসতীত্বই দেখে, 'ছেনালি' দেখে। প্রতি রাত্রে বলাৎকার করে স্ত্রীকে সতীত্বের শিক্ষা দেয়!

এই ধরনের মোটা দাগে নির্যাতনের ছবি এখনকার লেখিকারা বড় একটা আঁকেন না। শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনে হয়তো এমন নগ্ন বর্বরতা বিরলও। এখনকার লেখিকারা দেখান সম্বন্ধের অসততা। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'আত্মহত্যার পরে' গল্পটিতে দেখি প্রেমিকার আত্মহত্যার খবর শুনে শ্যামলেন্দু প্রথমে নিজের জন্যে ভয় পায়, যদি জানাজানি হয়! আর জানাজানি যখন হয় না, তখন স্বচ্ছন্দে ভেবে নিতে পারে প্রেমিকার তবে আরো কেউ ঘনিষ্ঠজন ছিল! এ গল্পের শ্যামলেন্দু হলো গড়পড়তা মধ্যবিত্ত বাঙালি, যাদের একটা সময়ের পর বিবাহিত জীবন মনে হতে থাকে শুধু কতগুলো অভ্যাস আর চাহিদামাত্র, কাজেই তারা প্রেমিকা খোঁজে, কিন্তু 'নিজের ভাবমূর্তি' কোনো মূল্যেই তারা হারাতে দিতে চায় না। অর্থাৎ একইসঙ্গে স্ত্রী এবং প্রেমিকাকে ঠকায় তারা। কিন্তু উল্টোটা যদি ঘটে, যদি স্বামীর মতো স্ত্রীরও মনে হয় স্বামী তার কাছে একঘেয়ে, বিরক্তিকর, আর সে সেকথা যদি স্বামীর মুখের উপর বলতে পারে, তাহলে স্বামীটি কীভাবেই না গর্জন করে ওঠে! সেই স্বামী, যে লুকিয়ে চুরিয়ে প্রেমিকাকে নিয়ে শহরের বাইরে নির্জনে দিন কাটিয়ে আসে! 'সামনে সমুদ্র' গল্পে সুচিত্রা মেয়েদের এইরকম একটি শোধ নেবার ছবি এঁকেছেন।

৬.

এই শোধ নেবার ইচ্ছেকেই কি বলা যায় নারীবাদ? অন্তত সুচিত্রা ভট্টাচার্যর মতো লেখিকা কি তাই-ই মনে করেন? তাই 'নারীতান্ত্রিক' নামে এক গল্পে এক উলটপুরাণ রচনা করেন লেখিকা, যেখানে দেখানো হয়েছে—মেয়েরা যাচ্ছে বাইরের দুনিয়ায়, আর পুরুষ রয়েছে গার্হস্থ্য পালনে। এইসঙ্গে মেয়েরা স্বামীদের মারধোরও করছে, এছাড়া যা যা নিপীড়নমূলক ব্যবহার বাস্তবে পুরুষের কাছ থেকে মেয়েরা পায় সেসবই পুরুষের উপরে খাটাচ্ছে তারা। সবশেষে, নায়িকার মুখে এই কথাগুলি বসিয়েছেন লেখিকা : 'হাজার হাজার বছর ধরে আমরা অনেক সহ্য করেছি, এবার তোমাদের পালা। দ্যাখো কেমন লাগে!' এই গল্পের সূত্রে মনে পড়ে যায় শতাব্দী-সূচনায় রোকেয়ার লেখা 'সুলতানার স্বপ্ন'। সেই স্বপ্নেও ছিল নারীতন্ত্র, কিন্তু সেই নারীতন্ত্রে নারীপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করেনি, তার কাজে সে পুরুষ পৃথিবীর সংশোধন দেখিয়েছে। যেমন, সেখানে বলা হয়েছে—অফিসে যে পুরুষ দশটা-পাঁচটা সময় কাটায়, সেখানকার কাজ আসলে দু-ঘণ্টার। মেয়েরা পুরুষের ভূমিকা নিলে দু-ঘণ্টায় অফিসের কাজ সেরে বাকি সময়টায় সেলাই বোনা ইত্যাদি হাতের কাজ করে, পুরুষদের মতো আড্ডা মেরে অলসভাবে সময় কাটায় না। রোকেয়া বলতে চেয়েছিলেন মেয়েরা পুরুষের ভূমিকা পালন করলেও পুরুষের স্বভাব পালন করবে না, তাই বিনা রক্তপাতে যুদ্ধজয় করার মতো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করবে, চুরি-ডাকাতি-ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধ কোথাও ঘটবে না, পৃথিবী সুন্দরতর হবে। নারীবাদের মধ্যে যদি মেয়েলিত্বকে মান দেবার কথা থাকে, তবে 'সুলতানার স্বপ্ন'ই নারীবাদী রচনা, শতাব্দী-শেষের 'নারীতান্ত্রিক' নয়।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যর গল্পে বিষয়-বৈচিত্র্যের সীমা নেই, শুধু যে মেয়েদের নিয়েই তিনি গল্প লিখেছেন এমন নয়। তবু তাঁর গল্পে মেয়েদের অবস্থানের, মেয়েদের অভিজ্ঞতার এত সূক্ষ্ম স্বর-অনুস্বর ধরা পড়েছে যে, তাঁকে আমার নারীবাদী লেখিকা বলতেই ইচ্ছে করে। সুচিত্রা আগের যুগের লেখিকাদের মতো সরাসরি নারীবাদের কথা না বললেও তার বিরোধী কথাও বলেননি। সেরকম কথা বলতে পারেন বাণী বসু। এঁর 'উত্তরপক্ষ' গল্পটি আসলে নারীমুক্তি-আলোচনা। এ গল্পের নাজমা চৌধুরী একজন আত্মসচেতন মহিলা, যিনি বিয়েকে মনে করেন গোহাটায় সস্তা দরে বিকোনো, যিনি জানেন বোরখা খুললেই ভেতরের পর্দা খসে না, রোজগেরে মেয়েও মূলত স্বামীর পরাধীন, সেইসঙ্গে এও তিনি মনে করেন : 'যেসব মহিলা লিবের পতাকা উড়িয়ে ঘুরে বেড়ায় তারা হল সত্যিকার প্রবলেম এই নারী-স্বাধীনতা যুগের।' 'লিবের পতাকা ওড়ানো' কেন নারীবাদ নয়, সে বিশ্লেষণ কিন্তু নাজমা বা তার স্রষ্টা করেন না। বরং শেষ পর্যন্ত নাজমা সিদ্ধান্ত করেন : 'সভ্যতা যতদিন জঙ্গল, মানুষ ততদিন জানোয়ার। সর্বাত্মক মুক্তি কোথাও নেই। কি ইজ্জৎ কি জহরত কোনটাই নিজের চেষ্টায় রক্ষা করতে পারিনি।' অর্থাৎ লেখিকা বলতে চান ইজ্জত-জহরত রক্ষার জন্যেই স্বামী চাই। স্বামী মাত্রেই বিপুল শক্তিমান রক্ষাকর্তা। এবং এই কথাগুলি তিনি বলালেন একজন নারীবাদী মহিলারই মুখ দিয়ে। বাণী বসুর দৃষ্টিতে সমাজটা বোধহয় পিছনের দিকেই এগিয়ে চলেছে, তারই বিস্ময়বোধ বেদনাবোধ থাকে তাঁর কোনো কোনো গল্পে, 'সবর্ণ' গল্পটি যেমন। এ গল্পে তরুণী মুনমুনকে তার তুলনায় নিম্নবর্ণের একটি ছেলে বিয়ে করতে চাইলে মুনমুন প্রত্যাখ্যান করে। বলে—'বড়দিদির ছেলের পৈতে হবে, মিন্টুর ছেলের পৈতে হবে, আমার ছেলের হবে না, না?' প্রত্যাখ্যাত ছেলেটি চলে যায়, আর মেয়েটির মা'র অন্তরুক্তিতে থাকে : 'যেসব কথা একদিন অভিভাবকদের মুখ থেকে নিরুপায় শুনেছেন, সেইসব হতাশাজনক, মনুষ্যত্বের সত্যমূল্য নিরূপণে পরাঙ্মুখ, মানবতাবিরোধী কথাবার্তা আজ এক যুগ পরে আত্মজার মুখে পুনরাবৃত্ত হতে দেখে কেমন আতঙ্কিত, বিহ্বল হয়ে

মুখ ঢাকলেন সুমিত্রা।' বাণী বসুর গল্প পড়ে আধুনিক মেয়েদের অনুভব-আবেগের জগৎ যত সংকীর্ণ মনে হয়, অন্য লেখিকাদের গল্প পড়ে ভাগ্যে সেরকম মনে হয় না! সুচিত্রা ভট্টাচার্যর গল্পে আজকের মেয়েদের অভিজ্ঞতা জগতের প্রসারিত রূপ যেমন চিনে নেওয়া যায়, অনিতা অগ্নিহোত্রীর গল্পে তেমনি তাদের অনুভব জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরগুলির পরিচয় মেলে।

৭.

তাই মনে হয়, আরো অনেক মেয়ে কেন এখন গল্প লেখেন না। একদিন ছিল বাধার দিন। মেয়েদের হাতে খাতাকলম দেখলে অভিভাবকরা তর্জন করতেন। এই বিষয়ে একটি বেদনাময় গল্প পড়েছিলাম 'প্রবাসী'র পাতায়। সরসীবালা বসুর লেখা সেই গল্পে রয়েছে স্ত্রীর বই ছাপা হওয়াতে স্বামীর প্রবল ক্রোধের বর্ণনা। উচ্চ প্রশংসিত সেই বই প্রকাশকের কাছ থেকে সব কিনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে স্বামী! বড় দুঃখে নায়িকা বলে 'বিদ্রোহের আগুন তারই জ্বালানো সাজে, যে সেই আগুনে সব কিছু অসত্য বা অন্যায়কে পোড়াবার শক্তি রাখে—সে-শক্তি সবার মধ্যে নেই বোন।' এইভাবে হয়তো কত প্রতিভাবান লেখিকাকে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে একদিন! সাবিত্রী রায় তাঁর 'অন্তঃসলিলা' গল্পে এক শক্তিময়ী লেখিকার গৃহপরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন। সংসারের শত কাজ, শত অভাবের তাড়নার সঙ্গে সে পরিবেশে রয়েছে আত্মীয়জনের গঞ্জনা! আর বাইরে রয়েছে পুরুষের সমালোচনা—'ও আবার গল্প নাকি, টেকনিকের কোনো বৈশিষ্ট্য আছে তাতে?'

সেই বাধার দিন অনেকটাই আজ কেটে গেছে। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ কথিত নিজস্ব একটি ঘরও পেয়েছেন আজ অনেক মেয়েই। সেই তুলনায় লেখিকার সংখ্যা কেন বাড়েনি? না কি বাধা ছিল বলেই নিজেদের কথা বলার প্রয়োজনবোধ ছিল তীব্র একদিন? আজ বাধা সরে গেছে, তাই নিজস্ব কিছু বলার তাগিদও ফুরিয়েছে? কিন্তু মেয়েদের নিজস্ব সমস্যাও কি আজ মিটে গেছে সব? সবটাই আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে? মেয়েদের উপর প্রঘাতমূলক অপরাধের সংখ্যা কি ভয়াবহভাবে বেড়েই চলছে না? যে আঘাত চোখে দেখা যায় না, তারও পরিধি কি খুব ছোট? হয়তো এমনও ভাবেন মেয়েরা—আদ্যিকাল থেকে যেসব প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধ ঘটে চলেছে, তা নিয়ে নতুন করে কী আর লেখার আছে! যুগ যুগ ধরে তো বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেই চলেছে! ঠিক। বদল শুধু বাইরের, ভিতরে সবই শুধু পুনরাবৃত্তি। কিন্তু প্রতিবাদ? প্রতিবাদ তো নতুন ভাবে হতে পারে। কখনোই হয় না, এমন নয় অবশ্য। যেমন, 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকায় একবার পড়েছিলাম অহনা বিশ্বাসের একটি গল্প—'ফায়ার' সিনেমা রচিত হবার অনেক আগেই সে-গল্পে ছিল পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক গ্রাম্য বধূর প্রতিবাদের ছবি, সে প্রতিবাদের হাতিয়ার হলো সমকামিতা।

মেয়েদের লেখা যাবতীয় গল্পই যে পড়ে ফেলেছি, এমন নয়। নিশ্চয় অনেক ভালো গল্পই আজও আমার না-পড়া রয়ে গেছে। তবু মনে হয়, মেয়েদের গল্প লেখা আজও বাধাহীন নয়। অনেকদিন আগে নবনীতা সেই বাধার কথা একবার লিখেওছিলেন, লিখেছিলেন কোনো এক অদৃশ্য নিষেধাজ্ঞার কথা। মেয়েরা যদি তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, তাদের নিজস্ব ভালো-লাগা মন্দ-লাগা নিয়ে লেখে, মনে হয় সর্বত্রই যে তার প্রকাশ-অধিকার থাকবে, এমন নয়। আর যদি-বা প্রকাশ হয়, তাহলে সমাজ কিংবা পরিবারের ব্যবহার সমস্যা তৈরি করতেও পারে।

হয়তো আজও তাই মেয়েরা অধিকাংশই নীরবতার সংস্কৃতিকেই শ্রেয় মনে করেন।

১৯৯৯

কবিতায় নারী, নারীর কবিতা

কোনো কোনো পুরুষ কবি বলে থাকেন—মেয়েরা কবিতা লিখতে পারে না। কথাটা হয়তো ভুল নয়, মেয়েদের কবিতা না লিখতে পারারই কথা। রবীন্দ্রনাথই জানিয়ে গেছেন তার কারণ—'মেয়েদের কল্পনাশক্তি নেই। 'ডাকঘর'-এর অমল যখন সুধাকে বলে সে যদি চাঁপা হয়ে ফোটে, তবে সুধা তার পারুলবোন হবে কিনা, তখন তার উত্তরে সুধা জানায়, পারুলবোন সে কী করে হবে, সে তো সুধা, সে শশী মালিনীর মেয়ে! রবীন্দ্রনাথও কিছু ভুল বলেননি, সত্যিই তো মেয়েরা কল্পনা করতে পারেই না। কবিতা লিখতে চায় যদি কোনো মেয়ে, তবে হয়তো তার বালিকা বয়সেই সে অনুভব করে নিজের কল্পনাশক্তির সীমা, যতদূর পর্যন্ত যেতে তার সাধ, সেখানে পৌঁছবার সাধ্য তার নেই। সেই সীমার দেয়ালে মাথা কুটে সে ভাবতে থাকে কেন এমন হয়!

কিন্তু এমনটাই তো হবার কথা। কল্পনা যে করে সেই বিষয়ীকে নিজের ভিতরে চিনে নেওয়া মেয়েদের পক্ষে কি সহজ? যে ভাষা দিয়ে সে কল্পনা করবে, যে ছবি দিয়ে সে কল্পনা করবে, সেই ভাষা সেই ছবি পুরুষ-পেষিত সমাজের, তার সাহিত্যের। সে ভাষা সে ছবি মেয়েদের শেখায় পুরুষ-নির্দেশিত এক ভুল ঐকাত্ম্য। সাহিত্যের পরম্পরা থেকে মেয়েরা সাধারণত সেই ভুল ঐকাত্ম্য গ্রহণ করে এবং প্রতিফলিত করে। নিজেকে বিষয়ী হিসেবে জানতে গেলে কোনো মেয়েকে ঘুরে দাঁড়াতে হয় সেই পরম্পরার বিপরীত মুখে। অথচ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে কবিতার পরম্পরার ভূমিকা তো কম নয়। হ্যারল্ড ব্লুমের মতো কোনো তাত্ত্বিক তো মনে করেন গান থেকে শুধু জন্ম নেয় গান, প্রাণ থেকে নয়। সে কথা পুরোটা না মানলেও, এটুকু মানতেই হয় যে, পরম্পরার বিপরীতে গিয়ে কল্পনা-প্রতিভার প্রসারে পৌঁছে কবিতা রচনা সহজ নয়, এমনকি, বলা যায় প্রায় অসম্ভবই।

নারীর কবিতা-বিষয়ে ভাবতে গিয়ে তাই আগে বুঝে নিতে চাই নারীর সেই প্রতিমা, পুরুষী কবিতার পরম্পরায় যা প্রতিফলিত। সে প্রতিমা যে পুরুষেরই কল্পনা, সে কোনো সত্য ছবি নয়, রবীন্দ্রনাথ তা জানিয়ে গেছেন কবিতাতেই : 'শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী/পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি/আপন অন্তর হতে...'। কোনো নিন্দাস্বরে নয়, স্তুতিরই সুরে উচ্চারিত এ কবিতার শেষ পংক্তি : 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা'। কিন্তু কেন, আমরা 'অর্ধেক মানবী' কেন, 'পূর্ণ মানবত্বে'র সম্মান থেকে কেনই বা আমরা বঞ্চিত থাকব এ প্রশ্ন তো যে-কোনো বিষয়ীর কাছেই জরুরি। পুরুষ নারীকে রাখতে চায় তার নিজেরই স্বার্থের সীমায়, কাব্যের ভাষায় রবীন্দ্রনাথ তাই নারীকে বলেন 'সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী', উর্বশী আর লক্ষ্মীর পুরাণে বন্দনা রচনা করেন তার।

উর্বশী আর লক্ষ্মী—পুরুষী কবিতার পরম্পরায় নারীর এই দুই স্টিরিওটাইপই সবচেয়ে প্রবল, পশ্চিমী আলোচনার ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে অ্যাঞ্জেল হোর ডিকটমি। রবীন্দ্রনাথ এবং তার পরের—তিরিশের যুগের আধুনিকদের কবিতা-পরম্পরাকে আজও পর্যন্ত প্রাণবান

পরম্পরা বলে যদি মেনে নিই, তবে সে পরম্পরায় নারীর ছবিতে এই দুই স্টিরিওটাইপের প্রকারভেদই প্রধানত দেখবো, যদিও তার ব্যতিক্রমও আছে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় বুদ্ধদেব বসু থেকে—এক মনোহীন নারী, এক চুলসর্বস্ব কঙ্কাবতীকে প্রায়শই দেখা যায় তাঁর কবিতায়—সেই এক উর্বশী ছবি, যাকে মনে রেখে লিখতে পারেন তিনি 'আধঘণ্টা নারীর আলস্যে তার ঢের বেশি পাবে'—নারী কি এখানে বালিশ-বিছানার সমগোত্রীয়ই নয়? লক্ষ্মী-ছবিও কদাচিৎ পাওয়া যাবে বুদ্ধদেবের কবিতায় : 'শূন্য মনের সুপ্তির গহ্বরে/পূর্ণতা এনে আলোর অন্তরাতে/সন্ধ্যাদীপের প্রতীক্ষা জ্বলে যেন/একখানা ক্ষীণ, কনকরিক্ত হাতে।' অবশ্য আধুনিক-পূর্ব কবিতায় লক্ষ্মী-ছবি যত অবিরল, আধুনিকদের কবিতায় তেমন নয়, সেখানে উর্বশী-ছবিই প্রধান : 'কোনো এক সন্ধ্যায় এমন—যুগান্তে, জন্মান্তে যেন—শাপভ্রষ্ট কে এক উর্বশী/অন্তর্দীপ্ত উল্কাসম করপুটে পড়েছিল খসি/অধরার মূক বার্তা মর্ত্যরজে করিতে সঞ্চার।'—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত থেকে এই উদ্ধৃতি। এমনকি জীবনানন্দও কখনো বা দেখেন সেই মনোহীন সুন্দরীকে—'সোনার পিত্তলমূর্তি'কে, দেখেন সেই নারীকে, যার 'খোঁপার ভিতর চুলে : নরকের নবজাত মেঘ/পায়ের ভঙ্গির নিচে হংকঙের তৃণ'—উর্বশী-ছবির এ এক নতুন মাত্রা।

নারীকে প্রকৃতির ছবিতে দেখা—রোমান্টিক কবিতার এই ধরন আধুনিকদের কবিতাতেও রীতিমত প্রবল, দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় :

ক. 'ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,
অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে ;
অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি
দিব্য শিশিরে তারই স্বেদ অভিষেকে
স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখিসম,
সে রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে ;

(সুধীন্দ্রনাথ)

খ. 'একদিন মনে হতো জলের মতন তুমি।
সকালবেলার রোদে তোমার মুখের থেকে বিভা—
অথবা দুপুরবেলা—বিকেলের আসন্ন আলোয়
চেয়ে আছে—চলে যায় জলের প্রতিভা।'

(জীবনানন্দ)

নারীর সঙ্গে কবিতার সমীকরণ থেকে উঠে এসেছে নারীছবির আরেক স্টিরিওটাইপ, রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী' যার দৃষ্টান্ত। বুদ্ধদেব বসুর অনেক কবিতাতেও নারী আর কবিতাকে একাকার হয়ে যেতে দেখি—নারীকে ভালোবেসে তিনি আসলে কবিতাকেই ভালোবাসেন, নারী মৃণালমাত্র—তাকে ভর করে পদ্মের মতো বিকশিত হয়ে উঠে কবিতা।

এইসব স্টিরিওটাইপের বাইরেও অবশ্য ভিন্ন ধরন আছে নারীছবির। জীবনানন্দের কবিতায় নারীর যে ছবি মৃত্যুর নিবিড় ছায়ায় ধূসর, সেই ধূসরতা সরিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সেই ছবি যে-কোনো স্টিরিওটাইপের বাইরে :

'এই বলে ম্রিয়মাণ আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
উদ্বেল কাশের বনে দাঁড়ায়ে রহিল হাঁটুভর।
হলুদরঙের শাড়ি, চোরকাঁটা বিঁধে আছে,
এলোমেলো অঘ্রাণের খড়
চারিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে ছেনে
যেতেছে শরীর ;
চুলের উপর তার কুয়াশা রেখেছে হাত, ঝরিছে শিশির ;—

নারীকে তার সৌন্দর্যে নয়, তার স্বরূপেও দেখেছেন অবশ্য কেউ কেউ, সংখ্যায় খুব কম হলেও। এরকমই একজন কবি বিষ্ণু দে, স্পষ্টভাবে তিনি ভাঙতেই চেয়েছেন স্টিরিওটাইপ :

'চাই না সংসারে বন্দী আপাতপয়ার
মলিনবাসরে বন্দী শুধু প্রিয়তমা।
মৈত্রী দাও সহচরী ছন্দে ছন্দে কর্মে প্রাণে
মোহানায় প্রেমের প্রয়াণে
মুক্তি দাও বৃন্তে বৃন্তে তোমার বাহুতে...'

যে নারী বন্দী করে না, মুক্তি দেয়, তাকে দেখেছেন বিষ্ণু দে, অন্তরঙ্গ সম্পর্কে নারীর শরীর শুধু নয়, খুঁজেছেন তার সত্তা :

'দিকে দিকে ঘুরে দেখি নিস্তব্ধ তন্ময় একা, দিই না চুমাও
পাছে ঘুমে ওঠে ঢেউ, থরো থরো হৃদয়ের ঐকান্তিক স্বরে
চকিত সংবিৎ পাছে থমকায় আকস্মিক মিলে।
তাই সৌরকক্ষে শুধু অনির্বাণ আকাশ-আদরে
তোমার সত্তাকে দেখি, তোমার হৃদয় শুনি—
এখন ঘুমাও।'

বিষ্ণু দে'র কাছে নারী শুধু প্রেয়সী বা জননী নয়, সেইসঙ্গে সখী এবং সহকর্মীও। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো রাজনৈতিক দায়বদ্ধ কবিরাও দেখেছেন নারীকে তার ভূমিকার বাইরে, দেখেছেন তার মিছিলের মুখ।

কিন্তু পরবর্তী কবিতায় এঁরা তত প্রভাব রাখেন না। কৃত্তিবাস কবিগোষ্ঠীর প্রধান কবিদের কবিতায় প্রথাবদ্ধ নারীপ্রতিমাই প্রধান, যদিও ব্যতিক্রম আছে অবশ্যই। 'রমণী দমন করে বিশাল পুরুষ তবু কবিতার কাছে অসহায়'—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এরকম পংক্তিতে নারী-পুরুষের পেষ্য-পেষক সম্পর্ক নগ্নভাবেই প্রকাশিত। নারীর উর্বশী-ছবি তার শরীরসর্বস্বতা নিয়ে ঘুরে ঘুরে এসেছে এঁদের কবিতায় :

'তার আশ্চর্য স্তন চুম্বন করেছি অরণ্যপ্রসাধিত দুর্মর ক্ষুধার মুখে। ধ্বংস করেছি শীলিত পরিচ্ছন্ন বোধের আকন্দজ্ঞান বাহুমূলের গন্ধে, নাভির গন্ধে, অধর গহ্বরের গন্ধে। লুব্ধ প্রাক্-শীত শঙ্খচূড়ের মত বুকের যে প্রান্তে প্রাণ জ্বলে, তাপময় নদীতীরের উরুযুগে স্থাপিত হয়ে সে রৌদ্রের অনুভবে মায়া বসেছে। তাকে প্রেম বলেছি।'

(শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

'শিশিরে ধুয়েছো বুক, কোমল জ্যোৎস্নার মতো যোনি
মধুকুপী ঘাসের মতন রোম, কিছুটা খয়েরি—
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে।'

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

নারী-পুরুষ সম্পর্ককে ঘর-বাহির বিন্যাসে রেখে নারীর যে লক্ষ্মী-ছবি, শঙ্খ ঘোষের কবিতা থেকে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় :

'আমাকে ভুবন দাও আমি দেবো সমস্ত অমিয়'

'প্রতি রবিবার তুমি নিজের মনের মতো/সাজিয়েছো বাড়ি
আরো কত হেরি আছে ভেবেছ আলতো ঠোঁটে গুনগুন গান
শুধু আমি কোনোদিন সময়ে ফিরি না
ঘর জুড়ে বেজে ওঠে টান...'

'আমি উড়ে বেড়াই আমি ঘুরে বেড়াই
আমি সমস্ত দিনমান পথে পথে পুড়ে বেড়াই
কিন্তু আমার ভালো লাগে না যদি ঘরে ফিরে না দেখতে পাই
তুমি আছো, তুমি।'

লক্ষ্মী-ছবির উর্ধ্ব-অধঃ বিন্যাসের দৃষ্টান্তও তাঁর কবিতায় পাই :

'পা ছুঁয়ে যে প্রণাম করি সে কি কেবল দিনযাপনের নিশান?'

'পায়ে শুধু পড়ে থাক স্তব্ধ এলোচুল।'

এই কবির কবিতায়, যদিও, ঘর-বাহির বিন্যাস সম্পূর্ণ বিপরীতেও ঘুরে গেছে কখনো, সেখানে নারীই আহ্বান জানায় পথে, আর পুরুষের পায়ে থাকে দ্বিধার টান, কখনো ভেঙে গেছে এ জাতীয় দ্বৈধ—ঘর বা বাহির নয়, জেগে উঠেছে দ্বৈত এক পথচলার ছবি—শহরের 'স্তর থেকে আকাশের স্তরের কিনার' পর্যন্ত, জেগে উঠেছে 'অশ্রুহীনা ভরসাহীনা' এক 'সঙ্গিনী'—যে কোনো স্টিরিওটাইপের বাইরে। এমনকি প্রায়শই শঙ্খ পুরুষের ভূমিকা উত্তীর্ণ হয়ে তুলে নেন নারীরই পার্সোনা, নারীর দিক থেকেই দেখতে পারেন পুরুষ-পেষণের দাঁত-নখ :

'নতুন জন্মে নতুন করে
আনিস না আর বোন
চোখের সামনে খেলা করতে
দিস না এতক্ষণ
ওকেও হয়তো বেচতে হবে
বেচিস না আমায়
সবাই মিলে খাবে, বরং
নিজেই আমায় খা।'

'আমি কি মানুষ নিয়ে/কেবলই পুতুল খেলি?
বলে সে আয় রে পুতুল/জলে আজ তোকেই ফেলি।
আহা রে নতুন চোখে/একদিন কোন আলোকে
দেখে তুই কিসের ঝোঁকে/জড়াবি বিয়ের চেলি
তার চেয়ে আয় মামণি/আগে আজ তোকেই ফেলি।'

তাঁর মানবতার মূল্যবোধ থেকে রবীন্দ্রনাথও তো নারীকে দেখতে চেয়েছেন তার স্বরূপেও, নারীর জবানিতে ঘোষণা করেছেন তার আপন ভাগ্য জয় করার অধিকারের কথা, বিশেষ করে তাঁর শেষপর্বের কবিতায়, আবিষ্কার করেছেন নারীর ভিতরকার 'অস্তিত্বের সেই বিষাদ, যার তল মেলে না।' তবু, রবীন্দ্রনাথের এসব কবিতা, কিংবা বিষ্ণু দে, কিংবা শঙ্খ ঘোষ, কিংবা এঁদের মতো আরো কোনো কবির কোনো সার্বিক রূপান্তর ঘটায় না কবিতার পরম্পরার মধ্যে। সে পরম্পরায় নারী 'দেবী' বলে পূজা পায়, 'খুকি' বলে স্নেহ পায়, বধূ, মাতা কিংবা প্রিয়া হিসেবে সম্মান পায়, কিন্তু সব ভূমিকার বাইরে নারীর নিজস্ব পরিচয় সেখানে অবান্তর। একথা যে নিছক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেই সত্যি, এমন নয় অবশ্য, এবং এর মূলে আছে পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতারই বৈশিষ্ট্য। প্রেম বিষয়ে ইংরেজি ভাষার এক উদ্ধৃতি-সংকলনের সংকলক (Jonathon Green) ভূমিকায় লক্ষ করেছেন সেই বৈশিষ্ট্য : 'Irrespective of one's personal stand on feminism, it is impossible to ignore that a grotesque percentage of these quotations are repititively and actively hostile towards women. It is not simply a comments on marriage, a traditional battlground that draws views. Even the exponents of mere affectionate views of love, its more romantic and positive facets stand from upon cliche's and truisms of centuries of steamroller masculine opinions. The old parade troops by, reviwed to one's regret, even by the smoothest of tongues ; the virgin and the whore, the mother and the castrator. ...there is something depressing and devastating about their endless continuity.'

২.

পুরুষতন্ত্রের সেই পরম্পরার মধ্যে থেকেই মেয়েরা লেখেন। এদিকে সমাজজীবনে বদল ঘটে যায় ক্রমশ, এক যুগ গিয়ে আসে আরেক যুগ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন আর্থিক সংকট, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশভাগ, দাঙ্গা, যুদ্ধোত্তর মূল্যবোধহীনতা—সব কিছুরই ধাক্কায় মেয়েদের যাপনচিত্রও বদলে যাবারই কথা। জীবনের অনেক নতুন বলয়ে তাঁদের দেখা পাওয়া গেল, আগে যেখানে তাঁদের দেখা যেত না। সেই তিরিশের দশকের আগে কিশোরী আশালতা বলেছিলেন পুরুষ কবিকে অনুপ্রেরণার বটিকা জোগানো ছাড়া মেয়েদের অন্য কাজও আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে মেয়েদের সেই অন্য কাজের দিগন্ত বিস্তৃত হলো অনেকদূর। পুরুষের কাজের জগতে তাঁরা পুরুষের সহযোগী, এমনকি প্রতিযোগী হয়ে উঠলেন—এই নতুন মেয়েদের সপ্রশংস সমর্থন জানিয়েছেন বিষ্ণু দে :

'এখন তোমরা শুনি জঙ্গী, কেবল গৃহিণী নয়,
জীবিকার লড়ায়ে তোমরা রঙ্গিলারা
আমাদের পাশাপাশি, প্রতিবেশী, সহকর্মী
কিংবা বলো প্রতিযোগী, তোমাদের চলায় বলায়

জীবনের দাবিদাওয়া তাই তীব্রতর অন্তর্যামী হয়ে ওঠে
তোমরা ভ্রূকুটি হানো, তাই আজকে আওয়াজে
অবশ্যম্ভাবিতার বিদ্যুৎ ঘনায়। সুখও অনেক
মাধুর্যের অন্যসুরে অন্তরঙ্গ আপিসের ভিড়ে কিংবা ক্লান্ত রাত্রে
এমনকি মেয়েলি মিছিলে, শাড়ির বিন্যাসে,
তোমরা এনেছো আজ অমিত্রাক্ষরের
বিপদসঙ্কুল সমৃদ্ধির জের পয়ারের মিলে।'

বিষ্ণু দে'র মতো কারো কারো কবিতায় আছেন এই মেয়েরা কিন্তু অনেকেরই কবিতায় নেই, কোথাও আছেন বিদ্রূপের মধ্যে :

'...আর ও নাকি
যুবাবেলা রক্ত দিয়ে কবিতায় মাতামাতি করে
সেই রক্তে তোমরা নেই, হায় মেয়েরা, তোমরা বিমানে আছো,
মন্ত্রীত্বে বা আদালতে
সিংহাসনে, বিদেশ মিশনে
এমনকি ঘরেও আছো, সব সময় আশেপাশে
খেতে বসতে শুতে
শুধু কবিতায় নেই, আহা, এ কোথায় চলে এলে নিঃসঙ্গ
নির্মম নির্বাসনে।'

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

এই বিদ্রূপ, এই বিরূপতা সহ্য করে লিখতে হয় মেয়েদের। তাদের কবিতা লেখার সামনে তাহলে এই দ্বিবিধ প্রতিবন্ধকতা—১. তার নিজস্ব আবেগ-অনুভবের ভাষা সে পুরুষরচিত পরম্পরার মধ্যে খুঁজে পায় না , ২. তার ঐকাত্ম্য-অর্জনের প্রয়াসের বিরোধিতা করে পুরুষ-পেষিত সমাজ। ১৯৭৪ সালে নারীকবিদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় শ্যামশ্রী লাল একটি ছোটো লেখায় উদ্ধৃত করেছিলেন মেয়েদের প্রতি স্তাঁদালের পরামর্শ : 'So you want women to be writers? I'll say that women should write...for publication after her death. A woman under fifty who appears in print is risking her happiness in the most terrible of lotteries, if she has the good fortune to possess lover, she'll begin be losing him.'

কিন্তু একটু আশ্চর্যই, ১২/১৩ জন মহিলাকবির প্রশ্নোত্তর ছাপা হয়েছিল সেই পত্রিকায়, তার প্রশ্নে অথবা উত্তরে কোথাও এই প্রতিবন্ধকতাকে ধরবার কোনো প্রয়াস ছিল না। সেই কবিদের অন্য একটি প্রবণতা ধরা পড়েছিল সেই প্রশ্নোত্তরে। কবিতা লেখার সময় তাঁরা নিজেদের কবি বলে জানেন, না কি নারী কবি বলে—এই প্রশ্নের উত্তরে সকলেই জানিয়েছিলেন, নারী হিসেবে নয়, একজন মানুষ হিসেবেই তাঁরা কবিতা লেখেন। রাজলক্ষ্মী দেবী এমনকি এও বলেছিলেন—পুরুষী কবিতাই লেখেন তিনি। কেন তাঁরা এভাবে নিজেদের নারীত্বকে অস্বীকার করতে চান?—প্রশ্ন তুলেছিলেন শ্যামশ্রী লাল—'Why is this so? Have they been neglected, ignored, or put in a prison-cell of literary category called 'female-writers'? Why can't these

talented and brilliant minds shake off this complex about our male-chauvists and be, naturally and freely feminine.'

শ্যামশ্রীর এই প্রশ্নের মধ্যেই তার উত্তরও নিহিত রেখেছেন তিনি। মনে পড়ে যায় সেই উনিশ শতকের শেষে 'ভারতী'র পাতায় রবীন্দ্রনাথকৃত এক নারীকবির সমালোচনা : 'বঙ্গসাহিত্যের এক সময় গিয়াছে যখন স্ত্রীলোকের রচনামাত্রকেই অযথা উৎসাহ দেওয়া, সমালোচকগণ সামাজিক কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন, সেই সময়ে লেখিকা এই কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশ করিলে কিঞ্চিৎ যশঃ সঞ্চয় করিতে পারিতেন। কিন্তু এখন অনেক লেখিকা সাহিত্য-দরবারে উপস্থিত হওয়াতে সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে—সুতরাং আজকাল স্ত্রীরচনা হইলেও কথঞ্চিৎ বিচার করিয়া প্রশংসা বিতরণ করিতে হয়, এইজন্য উপস্থিত গ্রন্থখানি সম্বন্ধে আমরা অধিক কথা বলিতে ইচ্ছা করি না।' এই সমালোচনা তো শুধু একটি কবিতা-বইয়েরই নয়, সেইসঙ্গে সাধারণভাবে নারীকবিরই সমালোচনা। কবিতা যে পুরুষকবি মাত্রেই দারুণ ভালো লেখেন, তা তো নয়, অথচ নারীকবিকে নারী বলেই বাড়তি একটু শোনাতে পারেন এমনকি রবীন্দ্রনাথও!

অথচ নিজের নারীত্ব বিষয়ে সচেতন না থাকলে কী করেই বা একজন নারীকবি তাঁর নিজস্ব ভাষার সন্ধান করবেন, নির্মাণ করবেন নিজস্ব আবেগ-অনুভবের বিশ্ব! সেই সম্মেলনে আহূত কবিদের মধ্যে পঞ্চাশের দশক থেকে যাঁদের কবিজন্ম, কিংবা তার পরে, তাঁরা প্রশ্নোত্তরে যাই বলে থাকুন, কবিতায় পুরুষ-পরম্পরার প্রতিবাদ রাখতে তাঁরা অবশ্যই প্রয়াস করেছিলেন। তাঁদের পূর্বসূরী নারীকবিদের থেকে এখানেই তাঁরা স্বতন্ত্র—বাইরের দিক থেকে নিজেকে না দেখে তাঁরা দেখতে চাইলেন নিজেরই ভিতর থেকে। সম্মেলনের সেই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল নবনীতা দেব সেন-এর এমনই একটি কবিতা, যে জাতীয় কবিতা রাধারাণী দেবী কিংবা অপরাজিতা দেবী লিখতেন না :

> 'যে-প্রতিমা গড়েছিলে সে আমার ছিল না কখনো
> সে আমার প্রতিকৃতি নয়।
> যে মুখ তোমার রাজ্যে অনির্বাণ আগুন লাগায়
> সে মুখ আমার মুখ নয়...
> দর্পণে দেখেছি আমি ইদানীং আমার স্বমুখ
> সে মুখ তোমার চোখে পড়েনি কখনো।'

তীব্র আয়রনি ফুটে উঠেছে পুরুষ-জবানিতে লেখা তাঁর অন্য একটি কবিতায় :

> 'যুবতী নারীর ওষ্ঠে 'দুঃখ' শব্দ মানায় না বস্তুত
> ও বড়ো কঠিন শব্দ, ওতে দাবি শুধু পুরুষের
> তোমার তো সুখ নেবে, সুখ দেবে, সুখের পসারী
> সমর্থযৌবনা বরনারী...
> তোমরা কবিতা হবে, তোমারই কবির সম্পদ
> অমন তীব্রতা কেন, চোখে-মুখে মেঘছায়া কই?'

এই আয়রনির সুর এঁদের আগের যুগের নারীকবির কবিতায় আছে বলে জানি না। বিজয়া দাশগুপ্তর কাব্যগ্রন্থে অবশ্য এই আয়রনি তেমন প্রত্যক্ষ নয়, তিনি পরের যুগের কবি হলেও—প্রেমিককে তিনি 'প্রভু' অথবা 'রাজা' সম্বোধন করেন দেখে মনে হয় পুরুষ-নির্দেশিত পরম্পরার বাইরে

যাওয়ার প্রয়াস তাঁর নেই তেমন। কিন্তু বিজয়া দাশগুপ্ত যখন বিজয়া মুখোপাধ্যায়, তখন তাঁর কবিতায় বদল ঘটে যায় কিছুটা, নবনীতার মতোই পুরুষ-জবানিতে তিনিও লেখেন :

'তোমার হাতে মানায় না এ ভীষণ শব্দ, সখী।
কোথায় সন্ধ্যা সন্ন্যাস আর গম্ভীর গেরুয়া—
কোথায় অতুল জঙ্ঘা ঊরু পদ্মনিভ স্তন
উষ্ণ নরম স্নেহের শরীর। গাঢ় সবুজ ঘাসে
বিছিয়ে রাখো তার উপমান নিশ্চিত আশ্বাসে।'

এই সময় থেকেই নারীকবিরা সচেতনভাবে প্রয়াস করেছেন সীমাস্বর্গের বাইরে আসার, Man with the head, Woman with the heart—এই দ্বৈধর বিরোধিতা করার, ব্যক্তিকতার বদলে নৈর্ব্যক্তিককে অবলম্বন করার। কেতকী কুশারী ডাইসন মনে হয় খুব সচেতনভাবে আবেগের জগতের বাইরে এসে নির্মাণ করতে চেয়েছেন বিষয়প্রধান কবিতাজগৎ, কল্পনাবিস্তারের বদলে ঝোঁক দিয়েছেন পর্যবেক্ষণের উপর। তাঁর কবিতাতেও ব্যতিক্রম হিসেবে কদাচিৎ শোনা যায় নারীর নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বর : 'আমার সত্য যোজন যোজন / উত্তরণে/অবাক করা হঠাৎ দেওয়ার/বিস্ফোরণে।'

এরকম নিতান্ত বিচ্ছিন্ন কয়েকটি উচ্চারণমাত্র নয়, সামগ্রিক এক প্রতিবাদ উঠে এসেছিল যে নারীকবির কবিতায়, তাঁর নাম কবিতা সিংহ। সচেতনভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন তিনি :

'আমার ঘৃণার জন্য কোনো ক্ষমা প্রার্থনা করি না।
অন্তত একজন তার 'উদ্ধত মস্তক তুলে দীর্ঘ দাঁড়াক
অন্তত একজন তার বেণী খুলে হোক না পাঞ্চালী
অন্তত একজন তার রক্তফিতা খুলে হোক কুলকুণ্ডলিনী...
অন্তত একজন থাক দেহে মনে নির্জলা রমণী।'

সেই মুহূর্তে কবিতা একজন মাত্রই ছিলেন। 'কৃত্তিবাস' কবিগোষ্ঠীর সমসময়ের এই নারীকবির একক বিদ্রোহের কথা এ পর্যন্ত কবিতা-বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে কেউ উল্লেখ করেছেন বলে শুনিনি। কৃত্তিবাসী কবিদের প্রতিষ্ঠান ভাঙার ইচ্ছা, চলতি লেখার বিরুদ্ধে অসন্তোষ বা বিদ্রোহের কথা যখন লেখেন কেউ, তখন আরো অনেক বজ্রকঠিন প্রতিষ্ঠান ভাঙার এই একক প্রয়াস তাঁর নজরে আসে না যে—এটাই আশ্চর্য।

অথচ কী অসাধারণ সাহসী এই বিদ্রোহ! পুরুষতান্ত্রিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে একা যে দাঁড়ায়, ঐতিহ্যকে যে অস্বীকার করে, তাকে জীবন্ত জ্বলতে হয়। সেই এক 'জ্বলন্ত রমণী'—

'বুকের উপরে তার রক্ত শোষে ঐতিহ্যের জোঁক
অকালে নিহত তার মাতামহী রোগ রেখে গেছে
ক্রুদ্ধ রক্তচাপ ওঠে, অগ্নি বমন ওঠে, রক্তকণা বাহিত ফোয়ারা
বুকের তলায় তার মাথা কোটে জননীর বহ্নি কর্কট,
সেই দুঃখ, সেই রোগ, সেই নীল অঘোর বঞ্চনা
সংসার সমাজ থেকে নিয়ে যায় খসায়ে তাহাকে।'

এই নারীকবি প্রথম দেখেছেন পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতা কীভাবে যুগ যুগ ধরে নারীকে 'প্রভুর কুক্কুর' হতে শিখিয়েছে, 'মানুষের সভ্যতার বশ্যতার পোষ্যতার অদ্ভুত শিকলের ফাঁদে' পড়ে নারী নিজের

নারীত্ব ভুলে গেছে। কিন্তু যদি একবার মধ্যরাতে, জ্যোৎস্নায় তার ভিতরের 'ছিটেফোঁটা নারীত্বের নুন' জেগে ওঠে, যদি 'নারীর মতন' থেকে জন্ম নেয় প্রকৃত নারী, তাহলে 'মাথার ভিতর তার অবোলা যন্ত্রণা কাটে / সভ্যতার গুঁড়ো ঝরে মিথ্যে ঝরে আর / ক্রমাগত কাজ করে যন্ত্রণার ঘুণ।'

এই প্রকৃত নারীই শুধু হতে পারে প্রকৃত কবি, কিন্তু কোথায় যে পাবে তার ভাষা? সে যদি প্রকৃতির দিকে চোখ ফেরায়, তার আবেগকে খুঁজতে হয় নতুন প্রতিমা—'বেশ কেমন হালকা নীল রঙের শার্ট পরেছে আকাশ'—যার দৃষ্টান্ত। কিন্তু কতটা বা এগোনো যায়, যুগ যুগ ধরে নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেশবাস দিয়ে কবিরা প্রকৃতিকে ভোগ্য করে তুলেছেন—সেই পরম্পরার বিপরীতে নারীর কতটুকু সম্বল! আরো বড় সমস্যা তার প্রেম নিয়ে। আদিরস কিংবা মধুর রসই কাব্যের শ্রেষ্ঠ রস। কিন্তু নারী কী করে সৃষ্টি করবে সেই রস? এইখানেই তো আজকের মেয়েদের প্রধান সংকট। ভালোবাসবার মতো মেয়ে না থাকলে, প্রেরণা দেবার মতো মেয়ে না থাকলে পৃথিবীতে ক'জন পুরুষ বড়ো কবি হতে পারতেন? অথচ মেয়েদের এমনি কপাল, বোধে-বুদ্ধিতে মেয়েরা যত উজ্জ্বল, যত তারা আত্ম-সচেতন, ততই তাদের জীবনে পুরুষ দুর্লভতর। মনে পড়ছে অর্চনা আচার্য চৌধুরীর কবিতা :

'হলুদ-কালো সাপের মুখে তীব্র আর্তনাদ।
আগুন দিয়ে জড়িয়ে ছিলে তোমার দুই হাতে
ভালোবাসা হারিয়ে গেলো ব্যাঙের চিৎকারে,
আমার কাছে পুরুষ তুমি আজব কিমেরা।'

কবিতা সিংহ আরো স্পষ্ট ভাষায় বলেন :

'নিজের ভিতরে তুমি একা কাঁদো
বড়ো অশ্রুহীন
বন্ধ রাখো ত্রিকালদর্শী ত্রিনয়ন
সত্যকার সঙ্গমের রণ
কে দেবে তোমায় নারী?
কোথায় সে পুরুষোত্তম?'

পৃথিবীর সুন্দরতম প্রেমের কবিতাগুলি পেয়েছি আমরা পুরুষকবির রচনায়। কিন্তু পুরুষ যে নারীকে ভালোবাসে, সে নিছক বিষয়, সেই ভুল নারীর মধ্যে যদি জেগে ওঠে বিষয়ী, তাহলে সে কীভাবে পায় সেই প্রেমের অভিজ্ঞতা?

'দেখো দেখো, হয়েছি কোমল কত,
বন্যার পরেই এক পলি পড়া জমি,
এসেছো পুরুষ তুমি ক্ষুধা ও পিপাসা নিয়ে
চোখে কৃষ্ণ গ্রহ,
তবে পুজো শুরু হোক, হয়েছি প্রস্তুত,
এই দেখো বন্ধন স্বীকার করে অলংকার গলার কঙ্কণ
এমন চুম্বন দাও যাতে ধন্য হয়ে যায় রমণী জনম।
নাভির কম্পন থেকে, জতুগৃহে রোমহর্ষ বিস্ফোরণ থেকে
শুরু হোক আমার মরণ।'

(রমা ঘোষ)

বিষয়-বিষয়ীর ছিন্নতা, শরীর স্বরূপের ছিন্নতার ভয়াবহ অভিজ্ঞতায় টুকরো হয়ে যায় মেয়েদের প্রেমের স্বপ্ন :

'আমার কবন্ধ দেহ ভোগ করে তুমি তৃপ্ত মুখ ;
জানলে না কাটামুণ্ডে ঘোরে এক বাসন্তী-অসুখ
লোনা জলে ঝাপ্‌সা করে চুপিসারে চোখের ঝিনুক।
অন্ধকার আছে বলে হতে পারি চমৎকার দুই
প্রতিমার মতো এই নীল মুখ তুমি দেখবে না
তোমার বাঁপাশে তাই নিশ্চিন্ত পুতুল হেন শুই।'

(কবিতা সিংহ)

তাহলে মেয়েরা যে সুন্দর সাঙ্গীতিক প্রেমের কবিতা লেখে না, সে কি সে প্রেম জানে না বলে, না কি কবিতা জানে না বলে? প্রকৃতপক্ষে নারীর কাছে সংস্কৃতির যে-কোনো পরম্পরা—কবিতার পরম্পরা, শিল্পের পরম্পরা, সর্বোপরি ভাষার পরম্পরা—সবই ত্যাজ্য, ধ্বংস-যোগ্য। নারীকবিরা যদি এগিয়ে আসেন সেই ধ্বংসের কাজে, তবে তার থেকে বড়ো প্রতিষ্ঠান-ভাঙা আন্দোলন আর কী বা হতে পারে! কবিতা সিংহ ছিলেন একক প্রতিবাদী, কিন্তু তিনি স্বপ্ন দেখেছেন সেই আন্দোলনের :

'সাবাশ! আমার স্বপ্নের অশ্বারোহীরা
খান খান ভেঙে দিচ্ছে সমস্ত যৌন-টোটেম
কবিতায় রমণী ব্যবসা!
র‍্যাঁবো ভেরলেন শার্ল বোদলেয়ার কাঁচিকাটা করে
ফেলে দিয়ে, বাতিল পুরানো সব অনুবাদ গন্ধ লাগা
গলিত দর্শন
ছুটে আসছে গর্জন সত্তর
রমণীকে একভাবে কার্ডবোর্ড ছবির মতো
নীল-ছবি পোস্ট কার্ডে
যারা দেখবে না
চতুর্মাত্রিক তাকে সম্পূর্ণ দেখাবে, তারা আসছে
অন্তরে বাহিরে এক, নতুন দর্শন নিয়ে
পথ কেটে চলে যাচ্ছে অদ্ভুত সত্তর...'

৩.

পূর্বসূরী কবির এই স্বপ্ন মিথ্যা হয়নি, হয়তো সত্তরে হয়তো বা আশিতে জেগে উঠেছে কবিতায় এক অঘোষিত আন্দোলন—বহু-বিজ্ঞাপিত প্রতিষ্ঠান-ভাঙার পুরুষী আন্দোলনের থেকে কোনো অর্থেই কম তাৎপর্যময় নয়। জেগে উঠেছে কবিতায় নারী ভাষা, নারী হিসেবে নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, তার শারীরিকতা, তার জটিলতা—কোনো আত্ম-আরোপিত সেন্সারশিপ ছাড়াই, কোনো বহিরারোপিত বিশেষ ধাঁচা ছাড়াই। সত্তরের গোড়ায় নারীকবিরা নারীকবি-ক্যাটিগরিকে অস্বীকার

করেছিলেন। আজ মনে হয় তাঁরা জোরের সঙ্গে বলতে পারবেন সকলে—'হ্যাঁ, আমি একজন মেয়েকবি, মেয়ে হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা ভয়ংকর স্বাভাবিক, সত্য, সংহত, উচ্চারণযোগ্য। জানি, আমার কোনো দিগন্ত নেই, দিগন্ত থাকতে নেই—তবু, সেই না-থাকার বোধ আমার অস্তিত্বের বোধ, আমার নিজস্বতা' :

'তাহলে গর্তে আসি—
গর্তে শ্বাস, গর্তে বাস, গর্তে হাহাকার—
অখণ্ড গোপন কুয়ো, বিন্দুর আকারে ছায়া,
সাদা খরগোশের লাফ বৃথা।
সামনে নামলে দাঁড়ি, বাঁ দিকে নামলে দাঁড়ি,
পশ্চিম দক্ষিণ পিছনেও।'

(দেবারতি মিত্র)

এই নিজস্বতা সম্বন্ধে সচেতন আজকের নারীকবি। 'আপনার নারীসত্তা আপনাকে কি আলাদা কোনো সুবিধা, অন্যরকম কোনো অনুভবক্ষমতা প্রদান করে'—এই প্রশ্ন করা হলে মল্লিকা সেনগুপ্ত উত্তর দেন : 'অনুভবক্ষমতা যে নারীপুরুষভেদে অন্যরকম হয় কিছু ক্ষেত্রে, একথা অনস্বীকার্য। পুরুষের বর্ণনা আমার কাছে যতটা উদ্দীপক, পুরুষকবির কাছে ততটা নয়। নারী বলে আমি ধরিত্রীকে বেশি ভালো জানি, নারী বলেই আকাশ আমার চোখে পুরুষ। প্রকৃতির কাছে আমি পুরুষ খুঁজি। পৃথিবীতে প্রথম কবি যদি নারী হতেন, প্রকৃতি পুরুষ বলে চিহ্নিত হতো। এইটুকুই, নারীসত্তা এর বেশি কিছু অনুভবক্ষমতা আমাকে দেয়নি।'

না, শুধু 'এইটুকুই' নয়, অন্তত মল্লিকার কবিতা সেকথা বলে না। নারীসত্তার অনুভব থেকেই দাম্পত্যের স্বাভাবিক ভয়ংকরতাকে তুলে ধরতে পারেন তিনি 'স্বামীর কালো হাত'-এর মতো কবিতায়—কবিতায় বহুবন্দিত 'প্রেম-করা' নামক ঘটনাটি যে বহুক্ষেত্রেই পুরুষ-পেষণের ললিত এক মুখোশ মাত্র, সেই 'যৌনতার রাজনীতি'র ভয়াবহ এক পরিচয় জানায় সেই কবিতা :

'মশারি গুঁজে দিয়ে যেই সে শোয় তার
স্বামীর কালো হাত হাতড়ে খুঁজে নিলো
দেহের সাপ ব্যাঙ, লাগছে ছাড়ো দেখি
ক্রোধে সে কালো হাত মুচড়ে দিলো বুক
বললো, শোনো শ্বেতা, ঢলানি করবে না
কখনো যদি ওই আকাশে ধ্রুবতারা
তোমাকে ইশারায় ডাকছে দেখি আমি
ভীষণ গাড্ডায় তুমিও পড়ে যাবে,
শ্বেতার শ্বেত উরু শূন্যে দুলে ওঠে
আঁকড়ে ধরে পিঠ, স্বামীর কালো পিঠ।'

নারীসত্তার অনুভব থেকেই তিনি ধরতে চান যে-কোনো অভিজ্ঞতার নারীমাত্রাটি। 'তেভাগার ডায়েরি' কোনো পুরুষের কলমে একরকম, কিন্তু আন্দোলনে শামিল ছিলেন তো মেয়েরাও, সেই মেয়েদের মনোভঙ্গির এক কল্পনা থেকেই লেখা তাঁর 'তেভাগার ডায়েরি'র মতো কবিতা :

'আমি বিলাসিনীদের কাপড়ে নকশা তুলি, সামান্য জীবিকা
পোকা আলু ও আতপ দেয় হাত ভরে
ভাসুরের কাছাকাছি এলোচুলে থাকি না কখনো
খোঁপায় জড়িয়ে নেবো লাল ফিতে, কাস্তের ফলক
ক্ষেতের ফসল তিনভাগ হবে, দুইভাগ গৃহমূষিকের
উনুনের চারপাশে বসে হাত গরম করছি।...'

নারীসত্তার অধিকারী সেই পূর্ণ নারী জানে যে বহির্বিশ্বে সে পুরুষের সহযোগী কিংবা প্রতিযোগী হয়ে পাশে দাঁড়ালেও পুরুষতান্ত্রিক সেই পৃথিবী একান্তই পুরুষের, সেই বিশ্বে তার বিশ্ববীক্ষার কোনো অনুমোদন নেই। বরং সে ঘুরে দাঁড়ায় তার ঘরকন্নায়, তার রূপটানে। সেইখান থেকে সে খুঁজে নেয় তার ভাষা তার ছবি :

'...কোথায় যে যেতে হবে, সরকার হাট থেকে
নুনবাটি, আঁশবঁটি, হলুদ ও কাঁথাকম্বল সহ
অন্য কোন সস্তা সব্জির দেশ, শ্রাবণের মাস'

অনুরাধা মহাপাত্র, যাঁর কবিতা থেকে এই উদ্ধৃতি, তিনি জানেন 'বাবুভাষা' এক 'মারণকল'; 'মাহারাদের গল্প' নামে কবিতায় সেই বাবুর বিপরীতে তিনি রাখেন মা-হারা পুরুষকে। 'বাবুভাষা' বিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় 'বাবু'র বিপরীতে তির্যকভাবে তাই থেকে যায় নারীও :

'রঙ ও সাবানশুদ্ধ মানুষেরা কাগজে বুলেট আঁকে কাচের গেলাসে ধরে সূর্যগ্রহণ
বাবুভাষা এমনি মারণকল, ওতে সব রূপবান কোম্পানি কাপ্তেন
সমৃদ্ধ করে তুলবে স্বাস্থ্য, সাবান, হাসি, আপেল, মুদ্রণ
বাবুরা জানে না তবু বাবুদের বাবা সব গাড়ি নিয়ে হাওয়া খেতে
এইসব বলতেন, বলার চক্রান্ত নিয়ে বাবুভাষা ঘরে ঘরে বানিয়েছে
রবীন্দ্রসংগীত, বৃষ্টি, বুলেট ও জিন...'

নারী যদি নিজের উপর পেষণের চাপ অনুভব করে, তবে সে সেইসঙ্গে সকল পেষিত মানুষের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়ায় :

'আর ইংরেজের চাকরেরা, ঐ দেশে বোনেদের ঝি ভাবে
মায়েদের স্বেচ্ছাসেবিকা,
পৃথিবীকে বর্ষণের, পায়েদলা ভোগজমি করে নিতে চায়।
শাকান্ন, নুন, জল, আলো, গর্ভভ্রূণ হত্যার রক্তে ভেজায় ;
...
তবুও পুড়েই মরে কেরোসিনে, গৌরী আর ছোটো বোন,
যাদের মায়ের দুধ এখনো তো খায় ঘাতকেরা...।'

(অনুরাধা মহাপাত্র)

এঁদের কবিতায় যদি প্রচ্ছন্ন থাকে এমন কোনো অভিজ্ঞতা, যা নিছক নারীরই, তাহলেও তা গোটা

জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা তো নয়। জীবনের যে-কোনো সমস্যাকে নারী তার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে নিতে চায়, চিনে নিতে চায় :

'আমার সংসারে ছিল উড়ে-যাওয়া ছাই,
আধখানা শূন্যতা, আরা আধখানা মানুষকরোটি ঘোর কালো
কালকাসুন্দের ঝাড়ে হলুদ ফুলের চে'ও হলুদময়তা নিয়ে
লেগে থাকতো মৃত্যুআভা।
তালখেজুরের নেশা খোঁয়ারি কাটিয়ে উঠলে
ভাঙা হাঁড়ি, আধমুঠো ভাতের পাশে চুপিচুপি
সমুদ্রের গাঢ় ফলিডল।'

(সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়)

নারীর বিশেষ জীবন-পরিস্থিতিতে বিষয়ী হিসেবে সে অনুপস্থিত। তার আত্মসচেতনতা থেকে যদি কোনো নারী নিজেকে বিষয়ী বলে জানে, তবে সেই পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মেলানো তার সহজ হয় না আর, কেননা পরিস্থিতি তো চায় শুধু তার ভূমিকা পালনটুকুই। তার অস্তিত্বের বৃত্ত থেকে সে যেন আলগা হয়ে যায়, তার যাপন হয়ে ওঠে যান্ত্রিক :

'সারাদিন চাল বাছি, ডাল বাছি, ভাঁজ করি নতুন ও ব্যর্থ
মশারি। কয়লার গুঁড়ো ছুঁলে আঙুল শিউরোয় খুব,
সে চামড়া আগুনের উষ্ণতা শেখেনি। প্রত্যেক রাতের
পর একরকম আসে প্রত্যেক সকাল, অবিকল মানুষের
মতো খায় দায় দাঁত মাজে প্রতিটি মানুষ, আমার কোনো
মোহ হয় না।'

(সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়)

'সংসার বসাবো বলে ভগ্নদশা রুগ্নঘুম দু'হাতে সরাই,
প্রত্নছাই বেজে ওঠে পায়ের তলায়—ভাসায়,
উদ্ধারের ঠিক আগে ভরাডুব, জলতল শেষ,
তেল ও কয়লার স্তর পার হলে বল্কলবিলাস—
আর পুত্রলোভী নিষাদের অব্যর্থ ধনুক।'

(অঞ্জলি দাশ)

তার সংসার যদি তার অস্তিত্বের বৃত্ত, তবে তার কেন্দ্রভূমি হয়তো মাতৃত্ব। সভ্যতা আর সমাজ যুগ যুগ ধরে এই বলে—নারীর প্রধান পরিচয় নাকি তার মাতৃত্বে। কিন্তু মা-হওয়ার প্রাকৃতিক নিয়ম, সমাজের শাসন, আর তার নিজস্ব স্বাধীন সৃষ্টি-ইচ্ছা—এর মধ্যে কি কোনো সামঞ্জস্য আছে? তাই না আজ মাতৃত্বের অভিজ্ঞতাও মেয়েদের কাছে কোনো সদর্থক অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে না। সন্তানের কথা, বিশেষত কন্যাসন্তানের জন্মের কথা প্রায়ই উঠে আসে এঁদের লেখায়, কিন্তু সবসময়ই তার মধ্যে থাকে নঙর্থকতার গাঢ় ছায়া। জন্মের কথা, হয়ে ওঠে মৃত্যুর কথা :

'ধূপের ধোঁয়ার মতো দ্বিতীয়ার চাঁদ যেই
তাড়াতাড়ি মুছে যায় পড়ন্ত বিকেলে
মৃত মেয়ে এসে বলল :
আজ কতদিন আগে ইট চাপা দিয়ে থেঁতো করে
ফুলের টবের মধ্যে কে আমাকে রেখেছিল পুঁতে
ছাদের ট্যাঙ্কের জলে অদৃশ্য জীবাণু হয়ে
আমি কেন রয়ে গেছি একা,...'

(দেবারতি মিত্র)

'জন্মের আগেই তাকে আমি চিনিয়েছিলাম নুন।...দীর্ঘ নাড়ি বেয়ে বেয়ে শেষ পর্যন্ত তা এসে পৌঁছলো আমার গর্ভে, জলের ভেতর যেমন জল মিশে যায়; বিষের ভেতর বিষ।...তারপর তীক্ষ্ণ বাঁশের ফলায় একদিন তাকে আলাদা করে নেওয়া হলো বিষময় নাড়ি থেকে। তার মুখে ঢেলে দেওয়া হলো গর্ভের বাইরে থেকে-যাওয়া উদ্বৃত্ত নুনকণা, অভ্যস্ত জিভে চেটে নিলো সে। যখন তার দু'চোখের পাতাও বুজে আসতে চাইলো নুনের গুঁড়োয়, তখন সে তাকালো আমার দিকে, আর আমরা দুজনে মিলে আমাদের চারপাশ ঘিরে আবার তুলতে লাগলাম শাদা আর ধারালো সেই দেয়াল।'

(সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়)

'রক্তমাখা ডিম ভেঙে ফেলে আমাদের না-হয়ে ওঠা মেয়ে চোখ চাইলো অন্ধকারে। সে কি এবার আমাকে 'মা' বলে ডেকে উঠবে?'

(চৈতালী চট্টোপাধ্যায়)

নষ্ট কন্যারা সমর্থিত প্রতীকও, মেয়েদের ব্যক্তিস্বরূপ—তারও তো পূর্ণবিকাশ ঘটে না, ভ্রূণ অবস্থাতে তাকে টুঁটি টিপে মারতেই চায় তো তার পরিস্থিতি। একদিকে সেই অসহায়তার যন্ত্রণা, অন্যদিকে তার প্রতিক্রিয়া থেকে মাতৃপ্রতিমাকে নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করতে চান নারীকবি :

'মাঠের পশ্চিম কোণে ডানহাত তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন চণ্ডী, আর
তাঁর হাত থেকে ছিন্ন হয়ে ঝরে যাচ্ছে টুকরো খড়, পাথরের
ফলা, সন্তানের মরা মুখ।'

(সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়)

'মুখে ঘাম, গর্জন তেলের মতো,
যখন অন্নদা তুমি গড়ে দাও রোজকার রুটি,...'

(উর্মিলা চক্রবর্তী)

'মাটিতে নামার আগেই ফুটন্ত ভাতের কণা খবর পাঠায়—দেরি হলে
সংসারের খিদে বেড়ে রাক্ষসের পেট হয়ে যায়। ডানা খুলে প্রসাধন পালটে
ফেলি, এ খেলা জন্মাবধি। দেয়ালে ঝোলানো অন্নপূর্ণার হাত—
দেয়াল-আলমারীতে তোলা আছে তৃতীয় নয়ন—সারারাত চাঁদের
পাহাড় গলে-গলে ঢেকে ফেলে রান্নাঘরের চালচিত্র।'

(অঞ্জলি দাশ)

নারীর ভিতরে লক্ষ্মীপ্রতিমাকে দেখতে চেয়েছে সমাজ, আর তার ঐকাত্ম্য-অর্জনের তাগিদে নারী খুঁজে নিয়েছে শক্তিরূপা চণ্ডী কিংবা কালী কিংবা অন্নপূর্ণার প্রতিমা। তার অভিজ্ঞতার অতল ভেঙে যে দেবী উঠে আসেন, তিনি শ্বেতবসনা বিদ্যারূপিণী নন, বরং তার বিপরীত—তিনি অবিদ্যা ; তাঁর 'কাঁচা কষ্টিপাথরের চার হাত, রাজহাঁসবাহিনী,/দাঁত উঁচু, বাম উরু ঢেঁকি,/ঈষৎ ট্যারচা চোখে বরাভয়।' (দেবারতি মিত্র) এরকমই হবার কথা, কেননা যে নারী ঐকাত্ম্য অর্জন করে, সমাজ তাকে কী চোখে দেখে? সেই প্রথাবিরোধী মেয়ে কি তার চোখে সর্বনাশ নয়? সমাজের কাছ থেকে পাওয়া সেই ধিক্কার বোধ থেকে একদিন সংগ্রামী মেয়েরা রচনা করেছিলেন 'The Witch Manifesto' :

'It's an awareness that witches and gypsies
Were the first guerrilla and resistance fighter
Against oppression—the oppression of women,...'

একই মনোভাব থেকে হয়তো আজকের নারীকবিদের লেখায় চলে আসে ডাইনির সঙ্গে একাত্মতার কথা, এই তার এক সমর্থ প্রতিবাদের ভাষা :

'আমরা ডাইনি আমরা আগুনে মরি না
আগুন জ্বেলেছে পুরুষ আমরা মরিনি
সহমরণের চিতায় তবে কে মরলো?
কার জিভ থেকে ছিঁড়ে নিয়েছিলো কাব্য?
সূর্য তোমাকে দেখিনি, কখনো দেখিনি।'

(মল্লিকা সেনগুপ্ত)

'এখন স্বরূপ ধরতে বাধা নেই—দরজা হাট করে রেখে বেরিয়ে পড়ি / ডাইনিপনায়। চৌষট্টি চাবুকের দাগ থেকে ফুটিয়ে তুলেছি চৌষট্টি / রকম লোভের খেলা—আতঙ্কে কারখানার চিমনিও চেম্বারে / ফিরিয়ে নিচ্ছে বিষনিঃশ্বাস। শহর ছেয়ে যাচ্ছে নুলো / আর উন্মাদে।'

(অঞ্জলি দাশ)

'ও মেয়ে তোকে ডাইনি বলে ওরা
নজর ছোঁড়ে আড়ালে আবডালে'

(চৈতালী চট্টোপাধ্যায়)

'আমিও মানুষ নই, ডাইনি মায়ের
অষ্টম গর্ভের মেয়ে, বিষকৌটো জিভের তলায়।'

(চৈতালী চট্টোপাধ্যায়)

'ডাইনি' শব্দ এঁদের লেখায় প্রতিমা হয়েও উঠে আসে (তুকতাক ছিল, ছিল ডাইনি রাতের মোহ'—ঊর্মিলা চক্রবর্তী), তেমনি আসে 'পরী' বা 'জিন'-এর কথাও—কাল্পনিক জাদুশক্তিই তাঁরা যেন প্রয়োগ করতে চান 'বাস্তবের প্রতিকারহীন ক্ষমতাচাপের বিরুদ্ধে :

'রাংতাকে আড়াল করে ঝেঁপে আসছে ছোটোবেলা—
আমি আর বন্দী থাকবো না
মিহি হেরোইন কণা—মাখামাখি বুড়ো আঙুলের চে'ও ছোটো এক
এইটুকু পরী
ধরতে না-ধরতেই লুটোনো শাড়ির ভাঁজে লুকিয়ে ফেলবো।'

(সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়)

'জিনের মেয়েরা রোজ লম্বাচুল মেলে দিয়ে
কুলকাঁটা নিতে আসে সন্ধে ভর করে
তাদের চোখের চেয়ে নখ ও কেশাগ্রে বেশি লাবণ্যবিহার,
দুই দণ্ড হাত পা ছড়িয়ে বসে, বুক খোলা
তাকালেই শিউরে ওঠে বাতাসের শান্ত শাদা।'

(অঞ্জলি দাশ)

আবার, 'পরী'র প্রতিমা তো রূপকথার আবহও ঘনিয়ে তোলে—'পরী' চাঁদ টি দিয়েছে, আহ্লাদ-কাজল দেবে মেঘ'

(দেবারতি মিত্র)

—ছড়ার ভাষা রূপকথার ছবি নারীকবি তাঁর ঐকাত্ম্য-অর্জনের তাগিদেই ব্যবহার করেন। নারীরচিত আদি সাহিত্য তো ছড়া, রূপকথাই। বুদ্ধি আর যুক্তি যদি হয় এই আত্মবিনাশী সভ্যতার বুনিয়াদ, নারী বরং তবে বুদ্ধিপারের জগতের কাছেই হাত পাততে রাজি। রূপকথার নানান উপাদান এঁদের কবিতায় চলে আসে। 'ডুবো জাহাজের রূপকথা। ঢেউ তোলা সোনার কেশর ঘোড়া, শঙ্খের সাদা' (রমা ঘোষ), 'তিনবার হাততালি দেওয়ার আগেই পুতুলেরা নড়েচড়ে ওঠে' (সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়) 'মড়ার খুলিতে কড়ি নড়ছে ফিরছে' (অঞ্জলি দাশ)—এরকম অজস্র পংক্তি উদ্ধৃত করা যায়। সভ্যতার সংকটের ছবি এঁরা ব্যক্ত করতে পারেন রূপকথা দিয়েই, যে-ভাষা শুধু নারীকবিই জানেন :

'রাক্ষসীর বর এলে সেও এক গলা ঘোমটায় লজ্জার ব্যঞ্জনা আনে, বেড়ে দেয় স্তূপ স্তূপ রিরংসা, কুটিল ব্যঞ্জন। যে-সব শিশুরা জানতো না বিষ আছে রাক্ষসীর স্তনে, কুহকের ঘোরে দুধ খেতে গিয়ে মরে গেছে, তাদের ছোটো ছোটো করোটি গেঁথে সে পরেছে মালাখানি।'

(রমা ঘোষ)

ছড়া বা রূপকথাকে এইভাবে এঁরা ঐতিহ্য হিসেবে তুলে নেন, কিন্তু শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যকে এঁরা অস্বীকার করতেই চান : 'আমি হাওয়াভুক, পুরাণ-কথা আমার নয়।' কিন্তু তাই-ই কি? রামায়ণ মহাভারতের সরকারি ভাষ্য এঁদের গ্রহণযোগ্য নয় ঠিকই, কিন্তু তারও মধ্যে এঁরা নিজস্ব প্রবাহ খুঁজে নেন :

'তাহলে ঝাড়বাতি তুমিই ভেঙে ফেলো তুমিই দাঁতে কাটো টুকরো কাচ।
লজ্জাবস্ত্রটি আগুনে পুড়ে গেলে পারসি কার্পেটে সিঁদুর ছাপ

নদীর বুক চিরে কলার মান্দাসে যে মেয়ে বহে গেছে মৃত্যুতে
ঘুঙুর বেজেছিল নৃত্যে অপমানে মিথ্যা মহিমায় তাকে বেঁধে

অথবা যে সেদিন ইন্দ্রপ্রস্থের কামুক পুরুষের ভোজসভায়
আঁচল তুলল না বিনুনী বাঁধল না দু-চোখে অভিশাপ নীরবতার

তুমিও প্রবাহিত হয়েছে সেই স্রোতে যে স্রোতখানি ছিলো কালো আঁধার
ভাসিয়েছিল কারা হাত-পা বেঁধে কারা চিতায় তুলেছিল অনেকবার

তাহলে ভাঙা কাচ তুমিই জড়ো করো আঙুলে মিজরাব না-পরা থাক
তাহলে প্রেমিকার ছদ্মবেশ খোলো চৈত্র রাতগুলি বিফলে যাক।'

(চৈতালী চট্টোপাধ্যায়)

সেই 'কালো আঁধার' প্রবাহের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে যে মেয়ে, শূন্যতা-বোধই তার ভবিতব্য। সেই শূন্যতার যন্ত্রণা যত প্রবল ততই নঙর্থক শব্দে ভরে ওঠে এঁদের কবিতা-শরীর—ঘুরে ঘুরে আসে মৃত্যু এবং মৃত্যুর অনুষঙ্গী যা-কিছু শব্দ, আসে 'শ্মশান', 'বিষ', 'করোটি', 'রক্তগঙ্গা', 'প্রেত' বা 'প্রেতিনী', 'ছুরি' বা 'হত্যা'র মতো শব্দ। সেই যে কাব্যবন্দিতা সদর্থক স্বপ্ননারী, যার 'পরনে ঢাকাই শাড়ি। কপালে সিঁদুর'—তার খুব বিপরীতে আছে এঁদের কবিতার নারী, যার কাছে 'সিঁদুর' শব্দটি আসে এইভাবে :

'আমি সেই আয়নাটুকু ছিঁড়ে নিয়ে মুখে ধরি ভয়ে
ছুঁচের-ডগায়-মাখা দেখি সিঁদুরের গুঁড়ো, মৃত।'

(সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায)

'সিঁদুরের রঙ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওপরে উঠছে
এক অব্যক্ত বাষ্প, ভরে ফেলছে ঘর, দলা পাকাচ্ছে গলায়।'

(চৈতালী চট্টোপাধ্যায়)

সমাজের দেওয়া ভুল গৌরবচিহ্ন এইভাবে এঁরা প্রত্যাখ্যান করেন। প্রত্যাখ্যান করেন কোনো তত্ত্ব থেকে নয়, জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই। প্রেম এঁদের কোনো হ্যাঁ-তে নিয়ে যায়নি, প্রকৃতির দিকে চোখ ফিরিয়ে এঁরা দেখেছেন 'সঙ্গত পুরুষের মতো মিথ্যুক রোদ্দুর', মাতৃত্ব এঁদের মনে এনে দিয়েছে 'শূকর-প্রসব'-এর ছবি :

'যদি কখনো শূকর প্রসব করি
তুমি কোনোদিন পশু ছিলে না এই বোধে
সন্তানের সবুজ কান্না আমায় নির্বাসন দেবে।'

(অহনা বিশ্বাস)

জীবন থেকে এই-ই হয়তো প্রাপ্য মেয়েদের—না-এর পর না, তারপর না...

কিন্তু তারপর? কীভাবে এঁরা এগোবেন? অস্তিত্বের যে-সংকট একান্তই নারীর, তার চেহারা তো আদ্যিকাল থেকেই এক, শূন্যের সঙ্গে যতগুলি শূন্যই যোগ করা হোক, যোগফল তো সেই শূন্যই

থেকে যায়। তবে কি এঁরা একই বৃত্তে ঘুরবেন? এককালের কৃত্তিবাসী কিংবা ক্ষুধার্ত আন্দোলন পরের কালে নিঃশেষিত। মেয়েদের এই অনামী আন্দোলন তুলনীয় নয় সেসবের সঙ্গে। যে-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ, সে প্রতিষ্ঠান তাঁদের গ্রাস করতে পারবে না কোনোদিনই। কিন্তু 'না'-র থেকে কোনো 'হ্যাঁ'র দিকে এগিয়ে যেতেও কি পারবেন না তাঁরা? অন্তত না-হ্যাঁ-র ক্রমান্বয় সংঘর্ষও তো দিতে পারে গতির সঞ্চার, হয়তো বা ঘটছেও কোথাও সেই সঞ্চার—অঞ্জলি দাশ বলতে পারেন যেমন—

'তেপান্তর? না না আর নয়, ডানায় আগুন দিয়ে
দেখো আজ দুই হাতে শিকড় ছুঁয়েছি।'

তাই মনে হয়, নিছক না-তে নয়, না-হ্যাঁ-র সংঘর্ষের মধ্যে দিয়েই হয়তো বা জীবনের বলয় থেকে বলয়ে এঁরা যোগ করে যাবেন নারীবোধের মাত্রা।

'মহিলা-কবিদের প্রত্যেকের কবিতায়ই একটা বিষাদের সুর—একটা নিরাশার সুর প্রবাহিত, এই বিশেষত্বটুকু সকলেরই চক্ষে পড়িবে'—এই কথা লিখেছিলেন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে। আজও হয়তো তাঁর মন্তব্য প্রযোজ্য, কিন্তু কোনো এক কালকে-দিনে কি পরিবর্তন আসবে না? বিচ্ছিন্নবোধের সঙ্গে লগ্নতার আকাঙ্ক্ষা হয়তো প্রকাশ পাবে, কোনোদিন, সভ্যতার কোনো এক রূপান্তরে।

১৯৯১

তসলিমা নাসরিনের লেখা

১. নির্বাচিত কলাম

'শ্যামলী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ এক 'বাংলাদেশের মেয়ে'র কথা বলেছিলেন, ব্যথায় আর বুদ্ধিতে যার মিল হয়নি, মিল হয়নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়।

অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে এসে এর খুব বিপরীত এক বাংলাদেশের মেয়েকে দেখতে পাচ্ছি তসলিমা নাসরিনের লেখায়, ব্যথা আর বুদ্ধি যেখানে মিলেছে, মিলেছে ইচ্ছার সঙ্গে শক্তি। কোনও বাঁশিওয়ালার বাঁশির সুরের অপেক্ষা না রেখেই, সেই মেয়ের মধ্যে জেগে উঠেছে বিদ্রোহিণী, তীক্ষ্ণ চোখের আড়ে যে ঘৃণা জানায় চারদিকের ভীরুর ভিড়কে, কৃশ কুটিলের কাপুরুষতাকে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মেয়েটির এই জাগরণ পুরুষ-সাপেক্ষ—'তোমার ডাক শুনে একদিন/বেরিয়ে এল ঘোমটা-খসা নারী'। কিন্তু কেনই বা? মেয়েরা যে অন্য নিরপেক্ষভাবেই আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে—তসলিমা নাসরিনের লেখা তার প্রমাণ। অন্য নিরপেক্ষভাবে আগুনের ডানা মেলে দিয়েছে তার বারণ-না-মানা আগ্রহ প্রথম ক্ষুধায় অস্থির গরুড়ের মতো।

কিন্তু শুধুই আগুন নয়, তার আড়ালে রয়েছে নদীমাতৃক বাংলার অথই জলরাশি—দৃপ্ত প্রতিবাদের আড়ালে ঝরছে অঝোর কান্না। এইখানেই তসলিমা অনন্যা। নারীবাদী রচনা, প্রতিবাদী রচনা কম পড়ছি না আমরা, নারীর অর্থনৈতিক-সামাজিক বিবিধ সমস্যা নিয়ে নারীবাদী লেখিকারা বেশ কিছুদিন ধরেই সরব। বুদ্ধির দীপ্তিতে, বিশ্লেষণের দক্ষতায় ঝকঝকে প্রবন্ধ লিখছেন অনেকেই। তাঁদের মধ্যে কেউ লিবারল, কেউ র‍্যাশনলিস্ট, কেউবা সোশ্যালিস্ট। একেক ধারার চিন্তা-পদ্ধতি একেক রকম, তাত্ত্বিকতা একেক রকম। তসলিমা কোনও তাত্ত্বিকতার ধার ধারেন না, প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তের অভিজ্ঞতাগুলিকে শুধু সঞ্চারিত করে দেন ভাষার মাধ্যমে। প্রত্যক্ষণ সর্বদা সজাগ, বেদনাবোধ সর্বদা টানটান থাকে যার, তারই না অভিজ্ঞতার সঞ্চয় এত বিপুল! তাই বলে তসলিমা নারীবাদী তাত্ত্বিকতা কিছু যে কম জানেন এমনও নয়। বিস্তৃত পড়াশুনোর স্বাক্ষর তাঁর রচনায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। কিন্তু পাণ্ডিত্যের ঘোষণা নয়, বেদনাবিদ্ধ সমগ্র সত্তাটিকেই তিনি মেলে ধরেন তাঁর পাঠকের কাছে—জীবনের ব্যক্তিগত তথ্যগুলি পর্যন্ত আড়াল করার প্রয়োজন বোধ করেন না।

নারীবাদী অন্যান্য লেখার থেকে তসলিমার কলাম আরও একদিক থেকে পৃথক। সমাজের পুরুষ-প্রাবল্য নারীর প্রতি বিবিধভাবে যেসব অন্যায় করে থাকে—নারীবাদী লেখিকা সচরাচর সেসবেরই প্রতিবাদ করেন। তসলিমাও করেছেন সেরকম প্রতিবাদ, কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি প্রতিবাদ করছেন নারীর আচরণেরও—তার মেনে-নেওয়ার, তার বুদ্ধিহীনতার, তার অ-সচেতনতার। বড় ব্যথাময় তাঁর এই প্রতিবাদ। বড় জ্বালাময় তাঁর প্রতিবাদ যখন তিনি ক্ষমতাসীন নারীর চেতনাহীনতার প্রতিবাদ করেন। নিগৃহীত নারীর জন্যই তিনি লেখেন, কিন্তু তিনি জানেন নারীর নিগ্রহ দূর করার দায়িত্ব মূলত নারীরই। এবং নারী যদি ক্ষমতায় থাকেন, তবে তাঁর দায়িত্ব আরও দূরপ্রসারী।

একটি ইসলাম-রাষ্ট্রে বাস করেও ইসলাম ধর্মের নামে যে নারী-নির্যাতন চলছে তার প্রতিবাদ করার সাহস রাখেন তসলিমা। কিন্তু তাই বলে কি ইসলাম-বিদ্বেষী তিনি? অবশ্যই নন। ধর্মের নামে নারীর অবমাননা হিন্দুসমাজেও কম নয়—তসলিমা তারও উল্লেখ করেছেন। তাই বলে তিনি হিন্দুবিদ্বেষীও নন। সমালোচনা যখন অযৌক্তিক, তখনই তাকে বলা যায় বিদ্বেষ। তসলিমা যে কোনো সমালোচনাই করুন, তার যুক্তিটুই তাঁর লেখায় যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন। তাই তাঁকে 'পুরুষ-বিদ্বেষী' অভিধা দেওয়াও সঙ্গত নয়। (দিলে তো তাঁকে 'নারী-বিদ্বেষী'ও বলা যায়। মেয়েদের সাজগোজ করা, নিছক ঘরকন্নায় আবদ্ধ থাকা, বাইরের ঘটমান জীবন সম্বন্ধে নিঃসাড় থাকা—এসব নিয়ে তো তিনি কম সমালোচনা করেননি!)

তা হলে কেনই-বা তাঁর অসংখ্য নিন্দুক? শুধু তাঁরাই নন, যাঁরা ধর্মকে তাঁদের 'নিজস্ব সম্পত্তি' বলে মনে করেন, তাঁকে 'নামে ও বেনামে' কেন আক্রমণ করে 'প্রগতির পক্ষের কথিত শক্তি'ও?

তার কারণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অধিকাংশ মানুষই আমরা আত্মছলনার মধ্যে বাস করি। নিজেদের বিষয়ে সত্যিটা শুনতে আমরা ভয় পাই। স্পষ্টবাদী মাত্রেই তাই সমাজে অপ্রিয় ব্যক্তি। বানিয়ে বানিয়ে মিষ্টি মিষ্টি মিথ্যে বলতে পারলেই সবার মন পাওয়া যায়। আর মন পাওয়ার দায় তো দুর্বলেরই, ক্ষমতাশালীর নয়। মেয়েদের উঁচুগলায় কথা বলা তাই সইতে পারে না কেউ। নারীবাদী মেয়েমাত্রেই তাই তার পরিপার্শ্বের মধ্যে কিছুটা অবাঞ্ছিত—একা।

'একা'—এই বিশেষণটি নিজের সম্বন্ধে বারবার ব্যবহার করেছেন তসলিমা—'এই ব্রহ্মাণ্ডে একটি বিন্দুর মতো আমি একা'। একাকিত্বের একটি মাত্রায় থাকে সম্বন্ধের সংকট। সম্বন্ধের সংকটের মূলে তসলিমা যেভাবে লিঙ্গভেদকেই দেখেছেন, তা হয়তো একপেশে কিছুটা। তসলিমা দেখেছেন নারী-পুরুষে কোনো সম্বন্ধ হয় না—'পিতা ও কন্যার সম্পর্কও তিনি মনে করেন 'আরোপিত সামাজিক সংরক্ষণের ব্যাপার, যা আদৌ আন্তরিক নয়' ; তিনি দেখেন, 'মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাইদের মধ্যে বোনের মায়ার চেয়েও বোনের জমির মায়া বেশি' ; এমনকি এও তাঁর এক নিষ্ঠুর সত্যেরই উচ্চারণ হয়তো 'পুত্র যত বড় হয়, মা-পুত্রের সম্পর্কটা ততই সাধারণ সৌজন্যবোধে গিয়ে দাঁড়ায়'। তসলিমা অবশ্য বলেননি মায়ের সঙ্গে কন্যার কিংবা বোনের সঙ্গে বোনের সম্পর্ক—সত্যতর ঘনিষ্ঠতর কিনা। ছেলেতে-মেয়েতে বন্ধুত্ব যৌনতা এসে নষ্ট করে দেয়—তসলিমা দেখান, কিন্তু মেয়েতে-মেয়েতে বন্ধুত্বরই-বা গভীরতা কতদূর, ব্যাপ্তি কতদিনের? সম্বন্ধের সংকটের জন্য কি নিছক লিঙ্গভেদকে দায়ী করা সঙ্গত?

প্রতিযোগিতামূলক এই সভ্যতা ব্যক্তিকে যতটা স্বাতন্ত্র্য দেয় ততটাই কি বিচ্ছিন্ন করে রাখে না? কিন্তু তসলিমার একাকিত্ব নিছক নিঃসম্বন্ধজনিত একাকিত্ব নয়। তাঁর একাকিত্ব প্রতিবাদী মানুষের একাকিত্ব। জোট বাঁধলে প্রতিবাদের শক্তি বাড়ে। এই কারণে নারীবাদীরা নানা জাতীয় সংগঠন রচনা করে কাজ করেন। তসলিমা কোনো সংগঠনে বিশ্বাসী নন—একরোখা একাকিত্ব নিয়ে তিনি তাঁর মতো কাজ করে চলেন।

সেই একাকিত্ব তাঁকে কোনো অসহায়তার বোধ দেয় না, যদিও তিনি খুব ভালো করে জানেন প্রতিপক্ষ যে কোনো সময় আঘাত হানতে পারে তাঁর উপর। কিন্তু অন্য একদিকে মনে হয় অসহায়তার বোধ তাঁর রয়েছে—নারীকে সচেতন করতে যিনি প্রয়াস করবেন, তাঁকে সেই অসহায়তার মুখোমুখি হতেই হয়। ইতিহাসের আদিমুহূর্ত থেকে মানুষের সমাজ, তার ধর্ম, তার ভাষা, তার রাষ্ট্র, তার বাণিজ্য—সব কিছু একজোট হয়ে নারীকে যৌন-বিষয়ে পর্যবসিত করে রাখতে চাইছে—জীবনের সর্বক্ষেত্র জুড়ে প্রবল তার টান। তার বিপরীতে একা দাঁড়িয়ে নারীকে বিষয়ী-রূপে প্রতিষ্ঠিত

দেখতে যে চায় তার তো অসহায়বোধ করাটাই স্বাভাবিক। আর তাই হয়তো, 'নির্বাচিত কলাম' নামপত্রের পরের পাতায় থাকে এই পংক্তি—'তবে কি এই-ই সত্য যে নারীর না মরে মুক্তি নেই'? তাই হয়তো, তসলিমার মাঝে মাঝে আফিম খেতে ইচ্ছা হয়। তাই হয়তো, নারীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন : 'জগতের সকল নারীকে বলছি, আসুন আমরা আমাদের জন্য একবার কাঁদি। আমাদের জন্য একবার আমরা কাঁদি। একবার চলুন চিৎকার করে কাঁদি আমরা, ধুলোয় গড়িয়ে কাঁদি। আমরা তো এক-একটা নির্বাক পাথর, আমরা কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে খেলা দেখছি। আমাদের নিয়ে মানুষ মজাদার খেলা খেলছে। আমরা কেউ রা-শব্দ করছি না। আমাদের জন্মের জন্য, আমাদের এ-ঘর থেকে ও-ঘর, এ-দেশ থেকে ও-দেশ চালানের জন্য একবার আমরা খুব কাঁদি।' আর, এই কান্নারই তো আর একপিঠে থাকে মরিয়া ক্রোধ ; 'নারী যতদিন ছিঁড়েখুঁড়ে পুরুষ না খাবে, নারী যতদিন পুরুষ শরীরকে একদলা মাংসপিণ্ড হিসেবে ভোগের নিমিত্ত গ্রহণ না করবে ততদিন নারীর রক্ত-মাংসে-মজ্জায় নিহিত পুরুষকে প্রভু ভাববার সংস্কার দূর হবে না।...নারী ধর্ষণ করতে শিখুক, ব্যভিচার করতে অভ্যস্ত হোক। নারী খাদকের ভূমিকায় না এলে 'খাদ্য' নামের কলঙ্ক ঘুচবে না।' কিন্তু এ নিছক ক্রোধের আবেগ। ধর্ষণ হল ক্ষমতাদম্ভের চূড়ান্ত বিকার। তসলিমা ভালো করেই জানেন ধর্ষণের প্রতিবাদে ধর্ষণ কোনো সুস্থতার পথ নয়। কুকুর মানুষকে কামড়ালেও মানুষ কুকুরকে কামড়ায় না। তেমনই সাহিত্যে পুরুষ 'রমণী-ব্যবসা' করে বলে মেয়েদেরও শিল্পে সাহিত্যে পুরুষ-ব্যবসা করা প্রয়োজন—এ পরামর্শেরও মূলে আছে দুরন্ত ক্রোধের দহন। যতদিন মানুষের সভ্যতায় পুরুষতন্ত্র বজায় থাকবে, ততদিন পুরুষকে বিষয়মাত্র করে তোলা সম্ভব হবে না। পুরুষতন্ত্রের পরিবর্তে যদি কোনোদিন নারীতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে হয়তো এরকম হতে পারে—নারীর পরিবর্তে পুরুষই হতে পারে ভোগ্যবস্তু। কিন্তু সেও কি কোনো কাম্য সভ্যতা? ক্ষমতার দাঁড়িপাল্লায় কোনো একদিকে ওজনটা অসম্ভব ভারী থাকুক—আমরা কি সেটাই চাই? পুরুষতন্ত্রের পরিবর্তে নারীতন্ত্র নয় ; প্রতিষ্ঠিত হোক মানবতন্ত্র—এই কি আমাদের একান্ত অভীপ্সা নয়? নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষই যেন পায় বিষয়ীর সম্মান—সব জাতির সব শ্রেণীর মানুষ—সেই কি আমাদের, তসলিমার ভবিষ্যতের স্বপ্ন নয়?

কিন্তু যে দেশে যে কালে যে পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তসলিমা কথা বলছেন—সেখানে এ স্বপ্ন অলীক। দেশের সব অত্যাচারিত নারীর অপমানের জ্বালা যদি কেউ নিজের বুকে ধারণ করেন, তবে তাঁর দু চোখ থেকে সুস্থতার স্বপ্ন মরীচিকার মতো মিলিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। সেই জ্বালা থেকে, তার যন্ত্রণা নিয়ে এই তরুণী যে শুধুই পাষাণে নিষ্ফল মাথা কুটতে রাজি হননি, তিনি যে ঘুরে দাঁড়াবার, রুখে দাঁড়াবারও সামর্থ্য রেখেছেন—এইটেই বড়ো কথা। তিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন তাঁর প্রবল 'আমি' নিয়ে। আদ্যন্ত 'আমি'-লাঞ্ছিত তাঁর রচনা তবু যে কোনোখানেই আত্ম-বিজ্ঞাপন হয়ে ওঠে না, তার কারণ নারীর বিষয়ীতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই এই 'আমি'র ব্যবহার। 'আমি' নামে লেখার মানে—'সকলের বেদনাগুলো আমি আমার ভেতরে ধারণ করি বলে 'আমি' নামে লিখতে আমি বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি'—তসলিমা তাঁর কবিতার সূত্রে একথা নিজে জানান। তাঁর 'আমি' তাই মূলত 'আমরা'। তাঁর পাওয়া মান, তাঁর পাওয়া অপমান তাই আমাদের, যে কোনো নারীর মান কিংবা আমাদের সকলের অপমান।

১৯৯২

তসলিমা নাসরিন, 'নির্বাচিত কলাম' কলকাতা, ১৯৯২

২ প্রেম-অপ্রেম বিষয়ে তসলিমা

'ওথেলো' নাটকের সেই রুমালটার কথা মনে পড়ে অনেক সময়। শেক্স্পিয়র বলেননি, অথচ কথাগুলি যেন শুনতে পাই কানে, ডেস্‌ডিমনার কথা—রুমালটার বিষয়ে, দয়িতের কাছ থেকে প্রথম পাওয়া উপহার বিষয়ে তার বিচিত্র অনুভবের কথা—রুমালটা হাতে নিলে মনে হত যেন এক টুকরো জীবন্ত অস্তিত্ব, তার হাতের মুঠোর মধ্যে অবয়বময় হয়ে উঠতো যেন তার দয়িতের ভালোবাসা, সে যেন পেত তার ছোঁয়া! অথচ ওথেলোর কাছে তো রুমালটা ছিল তার অস্তিত্বের সম্প্রসারণ, তার ভীষণ ভালোবাসা মানে ভীষণ আমিত্ব, আর ভীষণ আমিত্ব মানে ভীষণ ক্ষমতা। একই রুমাল, কিন্তু দুই পিঠ তার দুই রকম, একপিঠে তার দখলদারি, অন্য পিঠে সমর্পণ। ডেসডিমনার রুমাল এইভাবে যেন প্রতীক হয়ে ওঠে—নারী-পুরুষের বিবাহিত ভালোবাসার প্রতীক, পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতার পুরো ইতিহাস জুড়ে ক্ষমতা আর ভালোবাসার নিবিড় সেই বুনটের প্রতীক!

আশ্চর্য নয়, মেয়েরা যখন কলম ধরেছেন, তখন অনেকেই খুলে দেখাতে চেয়েছেন সেই বুনট। বাংলা সাহিত্যের খ্যাত-অখ্যাত অনেক নারী-ঔপন্যাসিকের নাম এই সূত্রে মনে পড়ে যায়। পুরুষ এবং নারীর জন্যে বৈষম্যমূলক সামাজিক-নৈতিক মূল্যবোধ রচনা করে পিতৃতন্ত্রের ক্ষমতাচাপ অনেকদিন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে পুরুষ-নারীর নিবিড়তম সম্পর্ককে। পুরুষের বহুবিবাহ একদিন ছিল সমাজ-স্বীকৃত বিধি, আর পাশাপাশি, মেয়েদের জন্যে ছিল পতিপরায়ণতাই জীবনের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ। সধবার সতীত্ব আর বিধবার ব্রহ্মচর্য ছিল নারীজীবনের প্রথম এবং প্রধান পালনীয় কর্তব্য। অথচ পুরুষের জন্যে কর্তব্যের তালিকায় একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেম, কিংবা মৃত পত্নীর জন্যে অবশ্যকরণীয় কোনো কৃচ্ছ্রসাধনের কথা তো কল্পনাতে আনাই যায় না। এই বৈষম্যের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ তত হয়তো করেননি মেয়েরা, যতটা প্রয়াস করেছেন পুরুষের ক্ষমতাচাপের স্বরূপ খুলে ধরতে, দেখাতে চেয়েছেন মেয়েদের বদ্ধ, অধীন, অত্যাচারিত নিরর্থক জীবনচিত্র।

কিন্তু কালের গতিতে সে জীবনচিত্র তো পাল্টে গেল অনেক, হয়তো গোটা দেশটাতে নয়, তার কোনো কোনো অঞ্চলে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্কের জটিলতার ধরন এখন পাল্টে গেছে অনেকটাই। এখন উপন্যাসে যদি কোনো লেখিকা নারী-পুরুষের সম্পর্ককেই মূল সমস্যাপট হিসাবে উপস্থিত করতে চান, তবে ক্ষমতা আর ভালোবাসার সংঘর্ষ নয়, সেখানে প্রধান হয়ে ওঠে দুটি ব্যক্তিত্বের ঘাত-প্রতিঘাত।

তসলিমা নাসরিনের 'চার কন্যা' ঠিক উপন্যাস নয়, উপন্যাসোপম চারটি বড়গল্পের সমষ্টি। তাঁর বহুখ্যাত উপন্যাস 'লজ্জা' কিংবা 'ফেরা'-র সমস্যাপট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এই গল্পগুলির সমস্যাপট। বলা যায় নারী-পুরুষের সম্পর্কের সেই আদিম বুনট, সেই ক্ষমতা আর ভালোবাসা বুনটকেই নতুন করে দেখাতে চেয়েছেন তসলিমা।

তবে কি তসলিমা পিছন পথে হাঁটা দিলেন? তা আদৌ নয়, কেননা, নারী-পুরুষ সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে তিনি স্থাপন করেছেন নারীর যৌনতা—যৌনতাকে ঘিরে যেভাবে গড়ে উঠেছে গল্পগুলির সমস্যাপট, বাংলা সাহিত্যের আর কারো কলমে তার দোসর আছে বলে মনে হয় না।

পুরুষ-সাহিত্যিকরা নারীকে দেখেন পুরুষের যৌন-আবেগের বিষয় হিসাবে, তাই নারীর নিজস্ব যৌন-অনুভব তাঁদের লেখায় অনুপস্থিত থাকবে—সেটাই তো স্বাভাবিক। যৌন-বিষয় হিসেবে নারী যেখানে নিগৃহীতা, বলাৎকৃত, সেখানে পুরুষ-সাহিত্যিকের নারীর প্রতি সহানুভূতির কোনো অভাব নেই। বলা চলে নারীর প্রতি যৌন-প্রঘাতের ছবি পুরুষ-সাহিত্যিকের লেখাতেই অজস্র পেয়েছি। পুরুষ-

সাহিত্যিকের তৈরি নারী-চরিত্রের মুখেই আমরা শুনেছি : 'They are all but stomachs, and we all but food'। নারী-পুরুষের এই খাদ্য-খাদক সম্পর্ক পুরুষ-সাহিত্যিকেরাই এঁকেছেন বেশি, বরং নারী লেখিকারা, অন্তত বাঙালি লেখিকারা বিষয়টিকে অনেকদিন পর্যন্ত এড়িয়ে চলেছিলেন। মহাভারতের 'স্ত্রী-পর্ব'-কে এই সম্পর্কের প্রতীকরূপে দেখে জ্যোতির্ময়ী দেবী লিখেছিলেন—স্ত্রীপর্বের কোনো ইতিহাস কোথাও নেই, কেননা নারীকবি মহাকবি নেই। 'থাকলেও নিজেদের মান, লজ্জা, মর্যাদা, সম্ভ্রমহানির কথা লিখতে পারতেন না। সে ভাষা আজও পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি।' কিন্তু আজকের দিনে নারী-ঔপন্যাসিক সে ভাষা লিখতে আদৌ কোনো কুণ্ঠা বোধ করেন না। পেষক পুরুষ পেষিত নারীর প্রতি কীভাবে যৌন-প্রঘাত হানতে পারে, তার বর্ণনা আমরা তো মহাশ্বেতা দেবীর কলমে দেখেছি। লিঙ্গ-শোষণ সেখানে শ্রেণী-শোষণের আরো একটি মাত্রা। কিন্তু 'চার কন্যা'র 'নিমন্ত্রণ' গল্পে তসলিমা যে যৌন প্রঘাতের চিত্র আঁকেন, তার মধ্যে শ্রেণী-বৈষম্যের ভাবনা থাকে না, সমাজবিরোধী অচেনা দুষ্কৃতকারীর কথাও সে চিত্রে নেই। একেবারে নগ্ন নিষ্ঠুর লিঙ্গ-বৈষম্যজাত প্রঘাতেরই ভয়ঙ্কর সেই ছবি।

প্রহৃত মেয়েটির স্বপ্নের পুরুষটিই এ গল্পের বলাৎকারী! একটি সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত সুন্দর তরুণ তার বান্ধবদের নিয়ে গণধর্ষণ করে যে অনাঘ্রাত পুষ্পটিকে, সে তারই আমন্ত্রিত বান্ধবী, শরীর-মন-ভরানো ভালোবাসা নিয়ে বিশ্বাস নিয়ে যে তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিল। মেয়েটি যখন তার আকাঙ্ক্ষিত পুরুষটিকে নিয়ে মনে মনে সৌন্দর্যময় স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে, ছেলেটি তখন মেয়েটিকে আকণ্ঠ ভোগ, নিষ্ঠুর ভোগের ফন্দি আঁটছে। সেই সুন্দর শিক্ষিত রুচিবান ছেলেটিকে আগের দিনেই এই মেয়েটি দুশোটাকার লাল গোলাপ উপহার দিয়েছিল! সেই লাল গোলাপগুলির পাশেই বয়ে গিয়েছিল গণধর্ষিতা মেয়েটির লাল রক্তের ধারা। তসলিমা ধর্ষণের প্রতিটি অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। করার প্রয়োজন ছিল। কেননা জান্তব ধর্ষণের পরও ছেলেটি ভালোবাসার ভাষা উচ্চারণ করতে পারে : 'শীলু নোড় না। সোনা আমার নোড় না'—এই ভাষা ব্যবহারের মিথ্যা, প্রতারণা এতটাই না হলে তো প্রকট হয়ে উঠত না! সন্দেহ হয়, তসলিমা কি বলতে চাইছেন পুরুষের মুখের প্রেমের ভাষা মাত্রেই এতটা প্রতারক? ব্যঙ্গচিত্রে যেমন মুখের কোনো একটি বৈশিষ্ট্যকে অনেকখানি বাড়িয়ে আঁকা হয়, তেমনিভাবেই কি পুরুষের নারী-প্রেমের স্বরূপকে, তার অন্তঃসারশূন্যতাকে অনেকটা বাড়িয়ে দেখাতে চেয়েছেন তসলিমা?

অনেক যত্ন করে লেখিকা এ গল্পের নায়িকার চরিত্র উপস্থাপন করেছেন। কবিতা লেখে মেয়েটি, ধর্মের নিয়মকানুনের অর্থহীনতা যুক্তির আলোয় ধরা পড়ে তার কাছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে মেয়েটিকে তার দাদা বিয়ে করে ঘরে আনে—তার কষ্ট উপলব্ধি করতে পারে সে। বুদ্ধি, বোধ অনুভব—সবদিক দিয়েই ঋদ্ধ এই মেয়েটি একটি মাকাল ফল যুবককে শুধুমাত্র চোখের দেখা দেখেই প্রেমপত্র পাঠাবার মতো ভুল করে বসে কী করে যে! কমবয়সী, অনভিজ্ঞ মেয়ের পক্ষে এ হয়তো খুব অস্বাভাবিক কাজও নয়। আর সেই যুবক—যার কাছে তার বুদ্ধি বোধ অনুভব আবেগ কিছুরই কোনো অস্তিত্ব নেই—শুধু তার যৌনতাটুকুরই অস্তিত্ব আছে—শুধু তার নগ্ন শরীরটুকুর! পুরো গল্প জুড়ে টুকরো টুকরোভাবে থাকে তার আকাঙ্ক্ষিত পুরুষটিকে নিয়ে মেয়েটির নানাবিধ মধুর স্বপ্ন দেখা—তার প্রত্যাশিত আচরণের বর্ণনা, আর সব স্বপ্ন খানখান হয়ে ভেঙে পড়ে গল্পের পরিণামে, ছেলেটির জান্তব আচরণের প্রঘাতে। কেউ বলতে পারেন এমন অমানুষিকতা স্বাভাবিক সংসারের কোনো নজির হতে পারে না, এ হল অস্বাভাবিকতার, বিকৃতির দৃষ্টান্ত। কিন্তু তসলিমা কি তাই-ই বলতে চেয়েছেন? যৌন বিষয় হিসাবে পুরুষের কাছ থেকে নারী যে প্রচণ্ড আঘাত পায়—যা বহু সময়ে বহু সংসারে ঘটে থাকে, মনে হয় না কি, তসলিমার অঙ্গুলি-নির্দেশ সেইদিকেই?

২.

'নিমন্ত্রণ' গল্পের শীলার কোনো প্রতিবাদের উপায় ছিল না। সে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত, লুণ্ঠিত, শরীর-মনে ছিন্নভিন্ন। কিন্তু 'চার কন্যা'র বাকি তিন কন্যারা একজনও কেউ পরাভূত নয়, প্রত্যেকে প্রতিবাদী, প্রতিশোধকামী এবং জয়ীও। তিনটি গল্পের নায়িকাই বিবাহিতা এবং বিবাহ-প্রতিষ্ঠানই তাদের পেষণের মূল যন্ত্র। দুটি গল্পে বিবাহ ভেঙে যায়, অন্যটিতে বিবাহ না ভাঙা হলেও স্বামী দেবতার প্রভুত্বপরায়ণতাকে ব্যঙ্গের বিষয় করে তোলা হয়।

আরো একবার মনে পড়ে যায় 'ওথেলো', মনে পড়ে এমিলিয়া আর ডেসডিমনার সংলাপ : এমিলিয়া বলে :

> '–yet have we some revenge
> let husbands know
> their wives have sense like them ;
> they see and smell.
> And have their plate both
> for sweet and sour
> As husbands have, what is it that they do
> When they change us for others?
> Is it sport?
> I think it is. And doth affection breed it?
> I think it doth. It's frality thus errs?
> It is so too. And have not wc affections
> Desires for sport, and frailty as men have?
> Then let them use us well ; else let them know
> The ills we do their ills instruct us so.'

এমিলিয়ার এই কথাগুলিই যেন এতকাল পরে উঠে এসেছে তসলিমার নায়িকাদের আচরণে। শেক্‌স্‌পিয়র অবশ্যই পছন্দ করেন না এমিলিয়ার মত, তাঁর আদর্শ প্রকাশ পায় সাধ্বী ডেসডিমনার উত্তরে—

> '...God me such uses send.
> Not to pick bad from bad, but
> by bad mend.'

নৈতিকতার দিক থেকে ডেসডিমনাই যথার্থ। ও খারাপ কাজ করে বলে আমিও খারাপ কাজ করব—এ কোনো সাধু যুক্তি নয় অবশ্যই। কিন্তু যুগ যুগ ধরে পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতা নারীর কাছ থেকেই কেবল সতীত্ব দাবি করে এসেছে, পুরুষের কাছ থেকে সম্পর্কের সততা চাওয়া হয়নি ; এমনকি নিজেকে শোধরাবার দায়িত্বও শুধু মেয়েদেরই যেন, পুরুষের অন্যায়গুলিকেও যেন সস্নেহে লালন করে এসেছে সমাজ ; তাই ডেসডিমনার বাণীকে ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়ে দিয়ে তসলিমার নায়িকারা যদি এমিলিয়ার প্রতিধ্বনিই করে থাকে, তবে খুব কি সেটা দোষের?

এমিলিয়ার প্রতিধ্বনি—তার মানে এই নয় যে, শেক্‌স্‌পিয়রের অনুকরণ করেছেন তসলিমা। তার মানে এই যে, শেক্‌স্‌পিয়রের সময় থেকেই কিংবা তার অনেক আগে থেকেই এমিলিয়ার এই ভিন্নপন্থী মতটিও কিন্তু রয়ে গেছে, যদিও আমাদের সীতা-সাবিত্রীর দেশে এ জাতীয় মতকে

আমল দেননি পুরুষ সাহিত্যিকরা কোনোদিনই। পিতৃতন্ত্র চেয়েছে ভালোবাসা আর ক্ষমার প্রতিমা হোক মেয়েরা—যেমন সীতা, যেমন ডেসডিমনা, আর তার সুযোগ নিয়ে চলুক পুরুষ! ভালোবাসার সব সুখটুকু থাকুক পুরুষের জন্যে, আর মেয়েদের জন্য বরাদ্দ হোক সবটুকু দুঃখ :

> 'Then nothing by us women can be done,
> But weep in wretchedness and sit and think
> This is our lot the cup of woe to drink.'–

যুগ যুগ ধরে দুঃখের পেয়ালা পান করাই যেন মেয়েদের বিধিলিপি! মেয়েদের তো সুখ চাইতেই নেই, চাইলেই তারা হয়ে যায় খারাপ মেয়ে, নষ্ট মেয়ে! শুধু পুরুষ নয়, মেয়েরাও এইভাবেই ভেবে এসেছে এতদিন, মেয়েদের মনেও কোনো প্রশ্ন ওঠেনি, কিংবা বলা ভালো কোনো প্রশ্ন কোনো সংশয় তাঁরা প্রকাশ করেননি। যখন থেকে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন তাঁরা, তখন থেকেই ভালোবাসার তাৎপর্যও পাল্টে যাচ্ছে, অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে প্রেম, বিবাহ হয়ে উঠেছে ততটা সম্বন্ধ রচনা নয়, যতটা সম্বন্ধহীনতাকে ঢেকে রাখা।

ধরা যাক 'চারকন্যা'র 'অপর পক্ষ' নামে গল্পটির কথা। দুই বোনের পত্রালাপের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে এ গল্পের আখ্যান। দুই বোনেরই জীবনচিত্র আর চরিত্র তাদের চিঠির মধ্যে দিয়েও প্রকাশ পেলেও, প্রধান এখানে বড় বোন যমুনার কথা। সে মেয়ে কেবলই দড়িদড়া ছিঁড়ে বাঁচতে চেয়েছে, শিকল খুলে পালাতে চেয়েছে, পালাতে পালাতে নিজের কাছে ছাড়া আর কারো কাছে আশ্রয় পায়নি। ছেলেমেয়ের বৈষম্য তাকে পীড়া দিয়েছে শৈশব থেকেই। এমন একটি মেয়ের বিবাহ হয়েছে এমন পুরুষের সঙ্গে, যে চায় তার উপার্জনশীলা স্ত্রী উপার্জনের সবটুকুই তার হাতে তুলে দিক। যমুনা তা মেনে নেয় না বলে তার নামে চরিত্রগত অপরাধ ছড়াতে থাকে স্বামী। এবং শেষ পর্যন্ত তালাক দেয় যমুনাকে, দ্বিতীয় বিবাহও করে। স্বামীকে ভালোবাসতে চেয়েও যমুনা এই স্বামীর প্রতাপই শুধু সয়েছিল, জেনেছিল স্বামী শব্দটির অর্থ প্রভু, মনিব, মালিক, অধিপতি। এই বিবাহ ছিল বাবা-মার সম্বন্ধ করে দেওয়া বিয়ে। দ্বিতীয়বার যমুনা নিজে যাকে বিয়ে করে সেই হুমায়ুন বিয়ের আগে অনেক মিষ্টি-মধুর প্রণয়-বচন বলেছিল। যমুনার দিক থেকে তত কিছু আগ্রহ আকুলতা না থাকলেও পারিবারিক চাপে তাকে বিয়েটা করতেই হয় আর বিয়ের পর হুমায়ুনের ভালোবাসা ক্রমশ আধিপত্যের নামান্তর হয়ে ওঠে। যমুনার ক্ষুব্ধ মন স্বাধীনতা খোঁজে, এমনকি যৌনতার স্বাধীনতাও। সে স্বাধীনতার অভাব পুরুষের কোনোদিনই নেই, তবু তাতে যদি তারা নষ্ট না হয়, তবে মেয়েরা তা চাইলেই নষ্ট হবে কেন—এই তার প্রশ্ন। সমাজের এই বৈষম্যময় মূল্যবোধের বিরুদ্ধেই তার প্রতিবাদ। এমন নয় যে সে প্রবলভাবে যৌন-সম্পর্কে আগ্রহী, বরং সে বলে এই সম্পর্কের প্রতি তার বিশেষ কোনো আবেগ কখনো কাজ করে না। শুধু শরীর বিষয়ক ঘটনায় মেয়েদের চরিত্র ও চরিত্রহীনতা মাপা হয় যে—এইটাতেই তার আপত্তি। পুরুষ এবং নারী কারো জন্যেই বিবাহ যেন খাঁচা না হয়, উভয় তরফেই সবরকম স্বাধীনতা থাকলেই পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর হয়ে ওঠে—এরকমই মনে করে যমুনা, সম্ভবত তার স্রষ্টাও।

এ কি কোনো নীতিহীনতার কথা? না কি এ-ই হওয়া উচিত নতুন যুগের নতুন নীতি? কেবলই মিথ্যা, কেবলই ভান, কেবলই সত্যগোপন—এই তো এতকালের নীতিবাগীশদের নীতিপালনের নমুনা। তার চেয়ে কি ভালো নয় পরস্পরের কাছে সত্য থাকাকেই সবচেয়ে বড়ো মান দেওয়া? যমুনার দ্বিতীয় স্বামী অন্যত্র বদলি হয়ে যাবার পর তৃতীয় একটি পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় তার, সে বন্ধুত্ব শারীরিক সম্পর্কে গড়ায়, সন্তানও গর্ভে আসে। গর্ভধারণের কথা স্বামীকে জানাতে যমুনা

বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। এ তো খুবই স্বাভাবিক যে, সে কথা শুনে যমুনার স্বামী যমুনাকে বেশ্যা বলে গাল দেবে। এ কিছু নতুন নয়। কিন্তু এইটে খুব নতুন যে সে গাল যমুনার গায়ে লাগবে না, কেননা বেশ্যা শব্দটি তার কাছে আদৌ ঘৃণ্য নয়, সে জানে কেন কীভাবে কাদের হাতে মেয়েদের বেশ্যা হতে হয়। এইভাবেই তসলিমা প্রতিটি প্রচলিত ধারণাকে ভাঙতে চান। এ গল্পের শেষে যমুনা তার সন্তানের জন্মের প্রতীক্ষা করে, একলা তারই যে সন্তান, যে তারই নামে পরিচিত হবে, কোনো পিতার নামে নয়। কিন্তু পিতৃতন্ত্রের কি দাঁত নখ কিছু কম ধারালো, মায়ের নাম নিয়ে কোনো সন্তান কি সুস্থভাবে বাঁচতে পারবে? নিষ্ঠুর বাস্তবতা তসলিমার অজ্ঞতা নয়, যমুনার বোনের জবানিতে প্রশ্নটি তিনি তোলেনও, তবু, বাস্তবকে কিছুটা অগ্রাহ্য না করতে পারলে সাহিত্য আগামী সমাজের বার্তা বহন করে আনবেই বা কীভাবে?

৩.

তিনটি পুরুষের সঙ্গে যমুনার সম্পর্ক হয়, এর মধ্যে তৃতীয়জনের সঙ্গে সম্পর্কের কথা যে-ভাষায় বলে যমুনা, তাতে মনে হয় এই বুঝি একটা সত্যিকার সম্পর্কের কথা পাওয়া গেল তবে। কিন্তু পাপা নামে এই পুরুষটির সঙ্গে যত সহজে সম্পর্ক পাতাল যমুনা, তত সহজেই তো সে সম্পর্ক চলেও গেল! আসা-যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দ্বার—তবে কি তসলিমার মতো লেখিকার মতে এইটেই প্রেমের সার সত্য? কিন্তু নারী-পুরুষ উভয়েরই সবরকম স্বাধীনতা বজায় রেখেও তো হতে পারে চিরস্থায়ী সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধ নিছক শরীরের নয়, সমস্ত সত্তার, সার্ত আর সিমনের বন্ধুত্ব যার দৃষ্টান্ত। তসলিমার তত্ত্বভুবনে এমন কোনো সম্পর্কের সম্ভাবনার কথা কি নেই কোথাও? হয়তো আছে, হয়তো বা তেমন কোনো সম্পর্কের কোনো ছবি নেই তাঁর চেনাজানা বাস্তব ভুবনে। তাঁর নায়িকা যমুনার কথা থেকে সেরকমই মনে হয় : 'আমি যে একজন মানুষ, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে সম্মান করবার কোনো পুরুষ যদি না থাকে দেশে, তবে কি দরকার এইসব প্রেম বা বিয়ের মতো অগভীর সম্পর্কে?—যে সমাজ নারীকে পুরুষের শাসন-শোষণে বড় হওয়াকেই শোভা বলে মানে, সেই সমাজে নারী-পুরুষের প্রাক্-বিবাহ সম্পর্কটিকে ভালোবাসা বলে ধরা হয়। ভালোবাসার আমরা ভুল অর্থ করি। পুরুষেরা নারীর মন ও শরীরকে নিজের অধীন চায়, এবং নারীও তাই পুরুষের ইচ্ছের যূপকাষ্ঠে নিবেদিত হতে চায়—আর যে যাই বলুক, আমি একে ভালোবাসা বলি না।' কিন্তু যদি এর উল্টোটা ঘটে, যদি নারী তার নিজের ইচ্ছের অধীনে পায় কোনো পুরুষ-শরীর, তবে কি সেটাকেই যমুনা ভালোবাসা বলে? স্বামী সহবাসের পর একদিন যমুনার মনে হয়েছিল 'এতদিন হুমায়ুনের ইচ্ছার কাছে বন্দী ছিল আমার শরীর, হুমায়ুনের শখ ও সুবিধেমত আমাকে গ্রহণ করত অথবা ভোগ করত। সেদিন আমি ভোগ করেছি হুমায়ুনকে। আমি সত্যি বলছি বড় আনন্দ পেয়েছি এতদিনে।' কিন্তু এর ফলে কি যমুনার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হলো কোনো? কিছুমাত্র না। কেননা পরের চিঠিতেই যমুনা লেখে : হুমায়ুনকে নয়, আমি একটি পুরুষকে আমার প্রয়োজনমত চাই। তাহলে কি পুরুষের যৌনতার মতো নারীর যৌনতাও ততটাই মনোহীন? মনোবিজ্ঞানীরা সম্ভবত বলেন না তা। আসলে যমুনা যেন এমিলিয়ার ধরনেই বলতে চায়, ওরা যদি আমাদের নিয়ে খেলা করে, আমরাই বা ওদের নিয়ে করব না কেন? হ্যাঁ, যমুনা পাপার কথা বোনকে জানাতে গিয়ে খেলা শব্দটিই লেখে : 'মরেই যখন যাব এত ছুঁৎমার্গ কেন গো? এই যে টগবগ বেঁচে আছি—এই তো জীবন, জীবন তো এক রকম খেলা নূপুর।' পাপার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলাতে যমুনার যে কোনো অপরাধবোধ নেই। এতে তত অবাক

লাগে না, কেননা হুমায়ুনের প্রতি তার কোনো ভালোবাসা কখনোই হয়নি। অবাক লাগে পাপার সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে ফেলাতেও যমুনার কোনো বেদনাবোধ কোনো অপরাধবোধ, থাকে না বলে। ব্যাপারটা বেশ পুরুষের মতো ঠিকই, কিন্তু মানুষের মতোও কি?

একই রকম প্রশ্ন তুলতে ইচ্ছে করে 'শোধ' গল্পটি নিয়েও। ঝুমুরের প্রেম করে বিয়ে করা স্বামী হারুণ বিয়ের দেড় মাস পরে ঝুমুরকে গর্ভবতী দেখে সন্দেহ করে—সে অন্য কোনো পুরুষের সন্তান ধারণ করেছে। এতই প্রবল তার সন্দেহ যে, ভ্রূণটিকে জোর করে হত্যা না করে সে ছাড়ে না এবং অবিশ্বাসী স্ত্রীকে প্রায় বন্দীজীবন যাপন করতে বাধ্য করে। অপমানিতা ঝুমুর শোধ নিতে চায়। স্বামীকে লুকিয়ে ঝুমুর সত্যিই একদিন বাড়ির নীচের তলার যুবক আফজলের সঙ্গে শরীরী-সম্পর্ক পাতায়। আফজলের সন্তান শরীরে নিয়ে সে স্বামীর অবিশ্বাসের প্রতিশোধ নেয়। নিজের ঔরসজাত সন্তানের ভ্রূণকে অকারণ সন্দেহে খুন করে ঝুমুরের স্বামী মহানন্দে আফজলের সন্তানকে আত্মজের প্রাপ্য ভালোবাসা দেয়। এই হলো ঝুমুরের শোধ নেওয়া—নারীর গর্ভের উপর পুরুষের আধিপত্য ফলানোর এ এক করুণ পরিণতি। এই শোধ-নেওয়াকে কেউ কি বলতে পারে অনৈতিক? কোনো নীতিবাগীশ তা যদি বলেও, অন্যায় অন্তত বলতে পারবে না। কিন্তু যে-আফজলের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ থেকে মিলন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা ঝুমুর প্রেমিকার মন নিয়ে বর্ণনা করে, সেই আফজলকে যে সে শুধু শোধ নেবার জন্য ব্যবহার করেছে মাত্র, এর কি নেই এক অন্যায় এবং অনৈতিকতার দিক? প্রতিমাসে যে দশটি দিন তার শরীর বীজ বোনার উপযুক্ত, সেই দশটি দিন, সে আফজলের সঙ্গে শরীরী-সম্পর্ক রাখত, অন্যদিন নয়। আর গর্ভবতী হবার সঙ্গে সঙ্গে সে আফজলকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করল, একবারের জন্যও আর আফজলের সঙ্গে দেখা করেনি সে। আফজল যদি কোনো মনোহীন শরীরসর্বস্ব মানুষ হতো, তবে ঝুমুরের এ ব্যবহারের একটা অর্থ থাকত তবু। কিন্তু আফজল শিল্পী, আফজল বোহেমিয়ান, আফজল সুন্দরকে চেনে। আফজলকে ঝুমুর তুমুল আনন্দে গ্রহণ করেছে, সে আনন্দ তরঙ্গে ভেসে যেতে দেখেছে তার এতদিনের সংস্কার, আফজলকে সে অনুভব করেছে তার স্বপ্নের পুরুষ বলে। সেই আফজলকে ঝুমুর তার প্রতিশোধের স্বার্থে নিছক ব্যবহার করতেও পারল। ঝুমুরের যুক্তি এইটে হতে পারে যে, আফজল অনেক নারীর সঙ্গেই সম্পর্ক করেছে, সম্পর্ক করবে, তাহলে তাকে কাজে লাগানোতে অপরাধ কোথায়? কিন্তু আফজল বিষয়ে কোনো অপরাধবোধের প্রশ্ন পর্যন্ত ওঠে না ঝুমুরের মনে—এইখানেই বেশ অবাক লাগে। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই দ্বিচারিতায় তার কোনো অপরাধবোধ নেই—ঝুমুর জোরের সঙ্গে জানায় সে কথা, কিন্তু আফজলের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার অনৈতিকতা তাকে একবারও বেঁধে না! তসলিমা তাঁর নায়িকাদের মুখ দিয়ে বারবারই বলেছেন সতীত্বের সংস্কারের অর্থহীনতা। কিন্তু যা তারা বলে না, অথচ যা তাদের ব্যবহারের মধ্যে থাকে, তা হলো সম্পর্কের অর্থহীনতা। এইটে মেনে নিলে নতুন দিনের কোনো সুস্থ সমাজের দিকে এগোবার কথা ভাবা যায়? পুরুষ নারীর সঙ্গে যে দায়হীন খেলা খেলে থাকে, নারী সেইটেই খেলবে প্রতিবাদে? তাকে কি বলা যাবে নারীর মনুষ্যত্ব?

৪.

নারী-পুরুষ সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে যৌনতা 'চারকন্যা'র চারটি গল্পেই অল্প-বিস্তর উপস্থিত, তবে 'নিমন্ত্রণ' এবং 'ভ্রমর কইও গিয়া' গল্পদুটিতে মূল সমস্যাই যৌনতাকেন্দ্রিক। 'নিমন্ত্রণ' গল্পে পুরুষের যৌন সক্ষমতা প্রচণ্ড ভয়ালতা নিয়ে প্রঘাত হেনেছে নারীর উপর ; আর তার ঠিক উল্টোদিকে, 'ভ্রমর কইও গিয়া' গল্পে পুরুষের অক্ষমতা পীড়ন করেছে নারীকে। সক্ষমতা যখন

অত্যাচারের মাধ্যম, তখন অক্ষমতা দিতে পারতো পুরুষকে কিছুটা নম্রতা। কিন্তু শারীরিক দিক থেকে অক্ষম হলেও স্বামী তো স্বামীই। পেষকের ভূমিকা নিতে কোনো অসুবিধা নেই তাঁর সংসারে, সমাজে—এমনই পিতৃতন্ত্রের মহিমা। বন্ধ্যা স্ত্রীকে ত্যাগ করবার অধিকার শাস্ত্র দিয়েছে পুরুষকে, কিন্তু স্বামীকে অক্ষম বলে অভিযোগ আনার অধিকার শাস্ত্র দেয়নি নারীকে। এখন সে অধিকার দিয়েছে আইন, কিন্তু আইন তো সমাজের বাইরের ব্যাপার। স্বামীকে সুখী করবে স্ত্রী—এইটাই সমাজের দাবি, এর উল্টোটা নয়। 'ভ্রমর কইও গিয়া' গল্পের নায়িকা হীরার বিয়ে হয় ধনী ঘরের ইঞ্জিনিয়ার ছেলে আলতাফের সঙ্গে। ক্রমশ হীরা আবিষ্কার করে তার স্বামী তার শরীরে তৃষ্ণা জাগিয়ে তোলে, কিন্তু তৃষ্ণা মেটাবার কোনো ক্ষমতা তার নেই। অথচ তার অক্ষমতা নিয়ে সে আদৌ লজ্জিত নয়, উপরন্তু নিজের অক্ষমতার ঢাকতে স্ত্রীকে অকারণে অন্যায় সন্দেহ করে কুৎসিত গালাগালি দিতে পিছপা নয় সে। আর তার জন্যে এমনকি মেয়েটির বাবা-মাও জামাইকে দোষ দেন না, উল্টে মেয়েকেই শাসন করেন তাঁরা। কেন? কেননা স্বামীর ঘরই মেয়েদের শ্রেষ্ঠ স্থান—এই ধারণাই দীর্ঘদিন ধরে লালন করে এসেছে সমাজ। স্বামী শব্দের অর্থই যখন প্রভু, তখন স্বামীর প্রভুত্ব তো দোষের কিছু নয়, এমনকি মেয়ের বাবা-মা'র কাছেও না!

অন্যদিকে স্বামী বিষয়ে মোহভঙ্গের ফলে খুব সাদাসিধে মেয়ের মধ্যেও আত্মানুসন্ধানের তাগিদ শুরু হতে পারে, ইবসেন তাঁর 'পুতুলের ঘর' নাটকে যেমন দেখিয়েছিলেন অনেকদিন আগেই। হীরাও বলে, 'আলতাফের স্বামীত্ব আমাকে সচেতন করিয়েছে যে স্বামীত্বের আরেক নাম প্রভুত্ব। আর তার প্রভুত্ব মানবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না বলে আমার ভেতরে অবচেতনেই জন্ম নিয়েছে একটি সত্তা অর্জনের তাগিদ।'

কিন্তু কী সেই সত্তা অর্জনের পথ? গল্পটি শেষ হয় কায়সার নামে এক যুবকের সঙ্গে হীরার শরীর-সম্পর্ক এবং শীর্ষসুখ পাওয়ার বর্ণণায়। তবে কি সত্তা অর্জনের তাগিদ শেষ হয় সেই শীর্ষসুখেই? না কি শীর্ষসুখ পাবার জন্য সত্তা-অর্জন কোনো আবশ্যিক শর্ত? অন্যদিকে, একটি মেয়ে বিষয় হিসেবে পুরুষের কাছে নিজেকে নিবেদন করার গতানুগতিকতা ভেঙে যদি বিষয়ী হিসেবে নিজেকে চিনে নেয়, এবং পুরুষটিকেও তার বিষয় নয়, স্বতন্ত্র এক চৈতন্যময় সত্তা বলেই যদি উপলব্ধি করে, তবে তার শীর্ষসুখ তো শরীরকে অতিক্রম করে যায়, তখন তা আর সুখ থাকে না নিছক। সান্ত শরীর থেকে জ্বলে ওঠা অনন্তের অনুভবকে কি আর সুখ বলা যায়, সে তো প্রবল এক যন্ত্রণা, জীবনের চূড়ান্ত পাওয়া—যে পাওয়ার কথা জ্ঞানদাসের রাধা জানায় : 'সুখের লাগিয়া/এ ঘর বান্ধিলু/আনলে পুড়িয়া গেল/অমিয় সাগরে সিনান করিতে/সকলই গরল ভেল।' পুরাণ কাহিনী অনুসারে রাধার স্বামীও ছিল অক্ষম, কিন্তু যে-কোনো সক্ষম পুরুষ নয়, শুধু পুরুষোত্তমই রাধাকে দিতে পারে সেই প্রেমের আস্বাদন, বিষামৃতের একত্র মিলন যে প্রেম।

তসলিমার নায়িকা হীরা এই যন্ত্রণার কথা জানে না। সে চেয়েছে সুখ, যে সুখ তাকে দিতে পারে যে-কোনো সুস্থ-সক্ষম পুরুষ শরীর।

কায়সার সম্বন্ধে যখন হীরার মনে প্রশ্ন ওঠে : এ কি দুদিনের মোহ, এক সময় কেটে যাবে, তখন? উত্তরে তার মন বলে : সে যদি সুস্থ, সবল সমর্থ পুরুষ হয়, ভালোবাসা ম্লান হবে কেন? কিন্তু সংসারে তো সুস্থ সমর্থ পুরুষের কোনো অভাব নেই, 'নিমন্ত্রণ' গল্পের সেই পৈশাচিক বলাৎকারী যুবকদল সকলেই খুব বেশি সুস্থ-সমর্থ। আত্মসচেতন হীরা সমর্থ পুরুষ পেলেই খুশি? পুরুষোত্তম চাই না তার?

'চারকন্যা'-র চারটি গল্পই নায়িকাদের উত্তম-পুরুষ জবানিতে কথিত। চারটি মেয়ের পৃথক পৃথক

চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি গল্পগুলিতে, চারটি মেয়ে আসলে একটিই মেয়ে। এদের শিক্ষাগত যোগ্যতায় হেরফের আছে, থাকলেও এরা প্রত্যেকেই শিক্ষিত মেয়ে বলতে যা বোঝায়, তা-ই। সেইসঙ্গে, এরা প্রত্যেকেই ধর্মাচরণে বীতস্পৃহ, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিহীন, সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যাচার বিষয়ে বেদনাবোধ করে, সকলেই ভালোবাসে প্রকৃতি, ভালোবাসে শিল্প, মানুষের অধিকার বিষয়ে সকলেই সচেতন। বুদ্ধি, অনুভব, ন্যায়বোধে ঋদ্ধ এই মেয়েরা যদি তাদের স্বপ্নের পুরুষ খুঁজে না পেতো আদৌ, তাহলে বিস্মিত হবার কিছু ছিল না। কিন্তু স্বপ্নের পুরুষ খুঁজে পেতে এ মেয়েদের কোনো অসুবিধা হয় না, বড়ো সহজেই স্বপ্নের পুরুষ তাদের জীবনের অতি-ছোট চৌহদ্দির মধ্যেই মিলে যায় তাদের। কেন অত সহজ অত সংক্ষিপ্ত তাদের অন্বেষণ? সে কি এই কারণে নয় যে, নিছক রূপকেই বরণ করে তারা, নিছক শরীরকেই? বড়োজোর তারা দেখে তাদের নির্বাচিত পুরুষটির রুচি আছে কিনা! কিন্তু ধর্ম বিষয়ে, সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে, চারপাশের মানুষের বেঁচে থাকার নানান সমস্যা নিয়ে তাদের সেই স্বপ্নের পুরুষ কীভাবে ভাবছে, আদৌ ভাবছে কিনা—তাই নিয়ে এই মেয়েদের কোনো মাথাব্যথা নেই। ফলে প্রেম বা বিবাহ তাদের যে অগভীর সম্পর্ক বলে মনে হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। পুরুষ তাদের প্রতারণা করে—চারজন মেয়ে নানাভাবে বলছে সে কথা, আমরা শুনতে পাচ্ছি তাদেরই কণ্ঠস্বর। আর পুরুষেরা, তারাও তো বলেছে তারা জানত না যাকে বিয়ে করেছে সে এইরকম! অর্থাৎ প্রতারিত হবার বোধ তাদেরও থেকে যাচ্ছে! তারা মানে, একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে ভীষণ ভীষণ প্রেম করছে, কিন্তু কেউ কাউকে জানতে চাইছে না!

ঠিক এই জাতীয় কথাই পড়েছিলাম মিলান কুন্দেরার কোনো লেখায়। তিনি বলেছেন, আকণ্ঠ ভালোবাসায় ডুবে আছে বলে ভাবছে যে দুজন নারী-পুরুষ, ভাবছে তাদের প্রেমাস্পদের সব কিছু জেনে ফেলেছে তারা, আসলে কিন্তু তারা পরস্পরের একতিলও জানে না। মিলান কুন্দেরার উপন্যাসজগৎ তাই ভরে আছে শরীরসর্বস্ব প্রেমের বা প্রেম-করার আদ্যন্ত নঙর্থক ছবি দিয়ে। নঙর্থক—এই শব্দটা চলে এলো হয়তো ব্যক্তিগত মূল্য-বিচারের টানে, হয়তো আজকের পৃথিবীতে নারী-পুরুষ সম্পর্ক এমনি হালকা এবং পলকা, এটাই স্বাভাবিক, একে নঙর্থক বলার কোনো অধিকার আমার নেই। তবু হয়তো আমার মতো আছেন আরো কেউ কেউ, নারী-পুরুষ দুই পক্ষই, প্রেম বলতে নিছক সুখ বোঝেন না যাঁরা, হয়তো আজও খোঁজেন কেউ কেউ তপ্ত ইক্ষু চর্বণের স্বাদ। কিন্তু প্রেমের গুণগত মান তসলিমার চারকন্যার আলোচনার বিষয় নয়। তিনি শুধু দেখাতে চেয়েছেন নারী-পুরুষ সম্পর্ক, যাকে প্রেমসম্পর্কই বলা হয়ে থাকে, তার মধ্যে পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতাচাপ কতদূর ভয়ানক! স্বাধীনতা—মানুষের যা স্বাভাবিক অধিকার—মেয়েদের সে অধিকারকে প্রতিমুহূর্তে কীভাবে টুঁটি টিপে ধরে পুরুষ আধিপত্য! চারকন্যার তিনটি কন্যা এই নিয়ে প্রতিবাদ করেছে, একজন করেনি। ভবিতব্য কি পৃথক? ডেসডিমনা আর এমিলিয়া—দুজনকেই যে তাদের প্রিয়তম স্বামীর হাতেই নিহত হতে হয়, আজকের সমাজ কি তার থেকে খুব বেশি বদলেছে?

১৯৯৪

তসলিমা নাসরিন, চারকন্যা, ঢাকা, ১৯৯৩
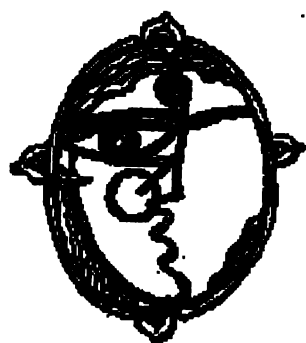
পুরুষের কলমে নারী

বিভূতিভূষণের উপন্যাসের মেয়েরা

'বিভূতিসাহিত্যে নারী সেবিকা, স্নেহময়ী রূপে সে প্রেমাস্পদকে আহার করায় সাধ্যমতো এবং ক্রমাগত। শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীও ক্রমাগত লুচি ভেজেছিলেন, এরাও লুচি ভাজে, কিন্তু কত পার্থক্য'—কথাগুলি বলেছেন বাণী রায়, কিন্তু তিনি দেখিয়ে দেননি পার্থক্যটা কোথায়, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের স্নেহময়ী মেয়েদের থেকে বিভূতিভূষণের উপন্যাসের স্নেহময়ী মেয়েরা কোথায় আলাদা। সেই পার্থক্যটা বুঝে নিলে বিভূতিভূষণের উপন্যাসজগতের মেয়েদের বৈশিষ্ট্যও যেন অনেকটাই বোঝা হয়ে যায়।

প্রথমত দেখি, বিভূতিসাহিত্যে মেয়েরা সেবিকা ঠিকই, স্নেহময়ী ঠিকই, তবে তাদের সে সেবা, সে স্নেহ কেবল প্রেমাস্পদের প্রতিই নয়। প্রেমের দৃষ্টি ছাড়াও মেয়েরা যে পুরুষকে অন্য দৃষ্টিতেও দেখে, বিভূতিভূষণের উপন্যাস তারই সাক্ষ্য দেয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'তে মেয়েদের প্রেমিকারূপ একান্তই গৌণ, সেখানে সর্বজয়ার মাতৃ-প্রতিমার পাশাপাশি প্রাধান্য পেয়েছে দুর্গার ভগ্নী-প্রতিমা। শুধু দুর্গা নয়, ভগ্নী-প্রতিমা এই উপন্যাসে ঘুরেফিরেই আসে। দুর্গার যেমন অপুর জন্যে যখন-তখন মন কেমন করে, অপুর সাধ মেটাতে না পারলে মনখারাপ হয়, গোকুলের বউয়েরও 'নিঃসহায় ছন্নছাড়া ভাইটার জন্য সন্ধ্যাবেলা কাজের ফাঁকে মনটা হু হু করে।' যাত্রা-অভিনেতা বালক অজয়কেও দুর্গা মুহূর্তে ভাইয়ের আসনে বসায়, রাণুও অনায়াসে অপুর মনে দিদির আসন নেয়। বিভূতিভূষণের একটি অপ্রধান উপন্যাস—'আদর্শ হিন্দু হোটেল'-এ আবার দেখি কন্যা-প্রতিমার প্রাধান্য। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হাজারি ঠাকুরের গ্রামের মেয়ে কুসুম তাকে জ্যাঠামশাই বলে ডাকে আর মেয়ের মতোই যত্ন করে খেতে দেয়। শুধু কুসুমই নয়, আরো দুটি অনাত্মীয়া মেয়ে সরল বিশ্বাসে টাকা দিয়ে 'তাহাকে তাহার উচ্চাশার পথে ঠেলিয়া দিতে চাহিয়াছে।' মেয়েদের এই সেবাময়ী স্বভাব, যত্ন করে আহার করিয়ে আনন্দ পাওয়ার স্বভাব অন্য একটা মাত্রা পেয়ে যায় 'অশনি-সংকেত' উপন্যাসে দুর্ভিক্ষের অনাহারের পটভূমিতে। এ উপন্যাসের নায়িকা অনঙ্গ বউ নিছক লক্ষ্মীপ্রতিমাই নয়, আপন্ন মানুষকে আহার্য জুগিয়ে যাবার আপ্রাণ প্রয়াসে সে যেন হয়ে ওঠে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা-প্রতিমাও!

দ্বিতীয় আরো একটি দিক আছে, বিভূতিভূষণের সেবাময়ী মেয়েরা শরৎচন্দ্রের মেয়েদের থেকে যেখানে পৃথক—সে হলো তাদের অহং-শূন্যতায়। বাণী রায় হয়তো এই দিকটিই নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন। 'অপরাজিত' উপন্যাসের নায়ক অপুর জীবনে মুখ্যভাবে অপর্ণা আর লীলা এসেছে, গৌণভাবে এসেছে নির্মলা আর পটেশ্বরী। নির্মলা আর পটেশ্বরী অপুর সাধ্যমতো পরিচর্যা করেছে, পরিবর্তে পেয়েছে উদাসীন ব্যবহার। কিন্তু আহত হয়ে তারা আঘাত ফিরিয়ে দেয়নি। নির্মলা বিষয়ে অপুর মনোভঙ্গি উপন্যাসে স্পষ্টভাবে বলাই আছে। নারীর সৌন্দর্যের কোনো আবেদন কিশোর অপুর কাছে ছিল না, রাইডার হ্যাগার্ডের 'ক্লিওপেট্রা' পড়ে তাই তার অন্তরুক্তি : 'নির্মলার সহিত দেখা অপুর মনের সেই অবস্থায়—অপ্রকৃতিস্থ, মত্ত, রঙিন—সে তখন শুধু একটা সুপ্রাচীন রহস্যময়, অধুনালুপ্ত

জাতির দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ক্লিওপেট্রা! হউন তিনি সুন্দরী—তাঁহাকে সে গ্রাহ্য করে না!...অপূর্ব রহস্যে ভরা মিশর!' অপুর 'নবীন জীবনের আনন্দভরা প্রথম পদক্ষেপের কাছে 'নির্মলা তুচ্ছ' হয়ে যায়! পটেশ্বরী বিষয়ে অপুর মনোভঙ্গি অবশ্য পাণ্ডুলিপিতে যেভাবে ব্যক্ত হয়েছিল, প্রকাশিত উপন্যাস থেকে তা বাদ পড়েছে। সেই বর্জিত অংশে শুধু যেন পটেশ্বরী-অপুর কথাই নয়, সেবাপরায়ণা এই মেয়েদের কীভাবে দেখে পুরুষেরা, লেখক কিছুটা সমালোচনার সঙ্গেই তা উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন : 'এই সঙ্গীহীন প্রবাসে পটেশ্বরীর এইসব ছোটোখাটো যত্ন তাহার ভালো লাগে—পটেশ্বরীর প্রতি কিন্তু এজন্য তাহার কোনো কৃতজ্ঞতা নাই—এ যেন তাহার ন্যায্য দাবি সে আদায় করিতেছে। অপুর মনের ভাবটা অনেকটা এইরকম। পটেশ্বরী তো সেবা করিবেই, সেবা করিতে বাধ্য—সে রিপণ কলেজের নামকরা ছাত্র, 'বঙ্গ সুহৃৎ' কাগজের সহকারী সম্পাদক, গঙ্গানন্দ-কাঠি জমিদারবাড়ির জামাই, ইতিহাসে পণ্ডিত...পটেশ্বরীর মতো একটা পাড়াগেঁয়ে মেয়ে তাহার সেবা করিবে—এ আর বেশি কথা কি? অপুর মনের ভাবটা যেন অনেকটা এরকম। তাহা ছাড়া পটেশ্বরী কুরূপা না হইলেও অপুর সৌন্দর্যবোধকে সে তৃপ্ত করিতে পারে নাই কোনোদিন—অনেকটা এ কারণেও অপুর মনোভাব একটু উদাসীন, কিছু গর্বিত এবং সম্পূর্ণ অকৃতজ্ঞ।'—পুরুষী উচ্চমন্যতার ভাবটিকে যেন লেখক এখানে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন! হ্যাঁ, এই হলো সেবাময়ী মেয়েদের অবধারিত নিয়তি! এই অকৃতজ্ঞতাই তাদের প্রাপ্য! কেননা তারা পুরুষের সৌন্দর্যবোধকে তৃপ্ত করতে পারে না! নির্মলা আর পটেশ্বরী অবশ্য উপন্যাসের গৌণ চরিত্র। কিন্তু 'দম্পতি'র পাটের ব্যবসায়ী গদাধর যখন ঘরের লক্ষ্মীমূর্তি সেবাপরায়ণা বধূটিকে বিস্মৃত হয়ে সিনেমাস্টার উর্বশীমূর্তি শোভারাণীর প্রেমে মশগুল থাকে, তখন সেই অনঙ্গবউও কোনো প্রত্যাঘাতের কথা ভাবেও না! 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসে বিপিনের স্ত্রী মনোরমা গোটা সংসার দেখে এমনকি বাড়ির কৃষাণকে পর্যন্ত। যৌথ সেবার কিছু অংশ পেয়ে তার স্বামীর তৃপ্তি হয় না, তার জীবনে অন্য একাধিক নারী আসে। গ্রাম্য এই বধূটিকে এইভাবে অবহেলা করে তার স্বামী, এর মধ্যেও থাকে সেবাপরায়ণা মেয়ের সেই অবধারিত নিয়তি।

২.

নারীচরিত্রসৃষ্টিতে কোথাও কোথাও, শুধু শরৎচন্দ্র নন, যে-কোনো পুরুষ ঔপন্যাসিকের থেকেই বিভূতিভূষণ স্বতন্ত্র। সেবাপরায়ণা মেয়েরও যে সৃজনশীলতা থাকতে পারে, বিভূতিভূষণের কলমই তা দেখিয়েছে। 'শ্রীকান্ত'র কমললতা আর 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এর মালতী—দুজনেই এরা বৈষ্ণব আখড়ার মেয়ে, আখড়ার কর্মকুশলতার দিক থেকে সেবাপরায়ণতার দিক থেকে, দুজনের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে, অমিল সেইখানে, যেখানে মালতী কবি। হতে পারে মালতীর কাব্যরচনা উঁচুদরের নয়, তার খাতার উপর সে লিখেই রেখেছে—'পাষণ্ডদলন গ্রন্থের অনুকরণে লিখিত', তবু সমস্ত কাজের মধ্যে সে যে নিজের সৃষ্টিপরিসর অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে, এইখানেই মালতীর বিশিষ্টতা। মালতীর ব্যক্তিত্বে অহং-প্রাখর্য নেই, কিন্তু দৃঢ়তা আছে। পুরুষের প্রতি ভালোবাসার থেকে তার জীবনের কাজের দাবি বড়। বিষ্ণুমন্দির শেষ করা আখড়ার সম্পত্তির দেখাশোনা করা, অতিথি-বোষ্টম যাতে আখড়ার দরজা থেকে আতিথ্য না পেয়ে ফিরে না যায় তা দেখা—এসব দায়িত্ব ফেলে মালতী প্রেমাস্পদ পুরুষের সঙ্গে চলে যেতে পারে না, তার আবেগের থেকে তার কর্তব্য বড়। মালতী যেমন কবিতা লেখে, 'অথৈ জল' উপন্যাসে তেমনি এক নারীচরিত্রের কথা পাই, যে গান লেখে, যে ঝড়ু কবির সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। 'দুই-বাড়ি'র মঞ্জু গান করে, মূকাভিনয় করে, নাটক করতে চায়, হাতে-লেখা কাগজ বার করে। সেবাপরায়ণতাই তাই বিভূতিভূষণের রচিত মেয়েদের শেষ কথা নয়।

এদিক থেকে বিভূতিভূষণের সবচেয়ে বিশিষ্ট চরিত্র—'অপরাজিত'র লীলা, যার আশা ছিল সে আর্টিস্ট হবে—ছবি আঁকবে। নারী-পুরুষ যুগ্মতার সমান্তরালে বন্ধন-মুক্তির যুগ্মতা সচরাচর রাখা হয়ে থাকে। পুরুষ যেখানে 'জগতের সমস্ত নূতন নূতন দেশ ঘটনা এবং অবস্থার মধ্যে নব নব রসাস্বাদ করিয়া আপন অমর শক্তিকে বিচিত্র বিপুলভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্যে সর্বদা ব্যাকুল', নারী সেখানে 'শত সহস্র অভ্যাসে বন্ধনে প্রথায় প্রচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত'।[১] এই লিঙ্গ-নির্মাণ ভেঙে দিয়ে লীলাকে সৃষ্টি করেছেন বিভূতিভূষণ। লীলা অপুর প্রণয়িনী নয়, সে অপুর সখী, সে অপুরই মতো সুদূরের স্বপ্ন দেখে—পোর্তো প্লাতায় যাবার কথা ভাবে। বিবাহিত জীবনে সে অবমাননা মেনে নেয় না, প্রতিবাদ করে অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘর ছাড়ে এবং অবশেষে আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি পেতে চায় আত্মহত্যা করে। এইভাবে, অভ্যাস, বন্ধন প্রথা—সবকিছুকেই অস্বীকার করতে পারে সে।

লীলার মতো এতটা উচ্চশিক্ষিত, যে অপুর সঙ্গে বিয়াত্রিচে-দান্তের ছবি নিয়ে কথা বলতে পারে, বিভূতি-সাহিত্যের অন্য কোনো নারীচরিত্র নয়। কিন্তু নায়কের তুলনায় অনেক বেশি শিক্ষিত নায়িকাকে দেখা যায় তাঁর একাধিক উপন্যাসে। 'দুই-বাড়ি'র মঞ্জু রবীন্দ্রনাথ পড়েছে ভালোভাবে, যা নায়ক নিধিরাম পড়েনি। 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসের প্রধান নারীচরিত্র মানীই নায়ক বিপিনকে বই পড়িয়ে শিক্ষিত করে তোলে। বিপিন এমনকি শরৎচন্দ্রেরও নাম জানত না, মানী তাকে এই বলে ধিক্কার দেয়—'আজকাল মেয়েরা যা জানে, তুমি তাও জানো না। দুঃখু হয় তোমার জন্যে।' জীবনের প্রতিটি বিষয়েই বিপিনকে মানীই চালনা করে, কিন্তু তার জন্যে বিপিনের প্রতি ভালোবাসা তার কিছু কমে যায় না। 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখক যেন প্রমাণ করতেই চেয়েছেন—পুরুষ-নারীর মধ্যে কে কার অধীন হবে, তার কোনো প্রকৃতিগত কারণ নেই, কোনো প্রকৃতিগত শ্রেষ্ঠতা নেই পুরুষের। শিক্ষাই সেই সম্পদ, যে সম্পদ অধিকার করলে শ্রেষ্ঠতা পাওয়া যায়, সে নারী বা পুরুষ যেই হোক না কেন। বিভূতিভূষণ 'অপরাজিত' রচনাকালেই মেয়েদের শিক্ষার কথা ভেবেছেন, পাণ্ডুলিপিতে অপুর ভাবনায় সে কথা ছিল : 'আমাদের দেশের মেয়েদের জীবন বড়ই সংকীর্ণ ও দুঃখময়—সে সারাজীবন ধরিয়া এই দুঃখ দেখিয়া আসিতেছে, নির্জনে বসিলেই মেয়েদের এই পরাধীনতার দৈন্য, অজ্ঞানতার চিন্তা তাহার বাজে—মেয়েদের কে এত ছোট করিয়া রাখিয়াছে? আনন্দের সকল পথ রোধ করিয়া জীবনের মুক্ত অবাধ প্রসারতা হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের ঘরে ঘরে বিনা বেতনের সেবাদাসী করিয়া রাখিবার জন্য দায়ী কে?...পুরুষেরা।' মেয়েদের এই দৈন্য দূর করতে পারে শিক্ষা, আর তাই অপু কল্পনা করে 'অপর্ণা দেবী মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়' পত্তনের, মেয়েরা যেখানে সবরকমের শিক্ষা পাবে। অপুর এই কল্পনা 'অপরাজিত'র খসড়াতেই থেকে গেছে, বাদ পড়েছে মুদ্রিত বইয়ের অবয়ব থেকে। কিন্তু বিভূতিভূষণের ভাবনায় যে মেয়েদের শিক্ষা পাওয়ার দিকটি থেকে গেছে, মঞ্জু বা মানী তারই পরিচায়ক।

শিক্ষা মেয়েদের মনে শক্তি জোগায় ঠিকই, কিন্তু যখন মেয়েরা ইস্কুল-কলেজে যেত না, তখন কি সকলেই তারা শক্তিহীনা ছিল? নারীকে লক্ষ্মীর প্রতিমায় উর্বশীর প্রতিমায় সব লেখকই দেখে থাকেন, কিন্তু 'ইছামতী' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ দেখাতে চেয়েছেন নারীর দশ প্রহরণধারিণী দুর্গা বা

১. উপরের দুটি উদ্ধৃতিই রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্য' বইয়ের 'বিহারীলাল' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সেখানে নর-নারীর বৈশিষ্ট্য নয়, প্রতি মানুষের ভিতরকার নরসত্তা আর নারীসত্তার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন।

সংহারকারিণী কালীমূর্তি। বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছিলেন লেখক এই উপন্যাসে, সে ইতিহাসে গ্রামবাংলার মেয়েদের শক্তিমত্তার কথা বিশেষভাবেই প্রাধান্য পেয়েছে। ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করেছে এক গৃহবধূ, তার বর্ণনা দিচ্ছে ডাকাত নিজেই : 'সাক্ষাৎ কালী পিরতিমে। মাথার চুল এলো, দশাসই চেহার., কি চমৎকার গড়ন-পেটন, মুখ-চোখ—সড়কি ধরেচে যেন সাক্ষাৎ দশভুজা দুগ্‌গা। ঘাম-তেল মুখে চক্‌চক্ করচে, চোখ দুটোতে যেন আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে।...আর সড়কি চালানো কি? যেন তৈরি হাত। ব্যাঁকা করে খোঁচা মারে, আর লাগলি নাড়ি-ভুঁড়ি নামিয়ে নেবে এমনি হাতের ট্যারচা তাক্।' এই বধূটি উচ্চবর্ণের মেয়ে, তিলুও উচ্চবর্ণের। তিলুও নাকি লাঠি খেলা জানে। আকবর আলি লেঠেলের সঙ্গে লড়ি চালিয়েছিল ঢাল আর লড়ি নিয়ে। তার বোনেরা বলে : 'শরীরে শক্তিও আছে বড়দির। দুটো বড় বড় ক্ষিত্তুরে ঘড়া কাঁকে মাথায় করে নিয়ে আসতে পারে'। এসব কথা তো কেবল শোনানো হয়, কিন্তু তিলুর শক্তিমত্তা দেখানোও হয় একটি ঘটনায়। ডুবন্ত স্বামীকে রীতিমত বীরত্বের সঙ্গে উদ্ধার করে তিলু। এর উলটোটাই সচরাচর আমরা দেখতে অভ্যস্ত—কোনো মেয়ে ডুবে যাচ্ছে আর তাকে উদ্ধার করছে পুরুষ। নারী-পুরুষ যুগ্মতার সঙ্গে যে দুর্বল-সবল যুগ্মতাকে অন্বিত করা হয়, এই লিঙ্গভেদে ক্ষমতাভেদের ধারণা যে সমাজের বানিয়ে তোলা, ইংরেজ-প্রভাবিত আধুনিক সমাজের বানিয়ে তোলা রটনা মাত্র—লেখক যেন সচেতনভাবেই তা প্রতিষ্ঠা করতে চান। তাই কুমুদিনী জেলের কথাও সবিস্তারে শোনানো হয় উপন্যাসে, যে ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর সঙ্গে তুলনীয় : 'এই দশাসই চেহারা, দেখতিও দশভুজা পিরতিমের মত। তেমনি সাহস আর বুদ্ধি'। এই কুমুদিনী গ্রামের মানুষদের তীর্থযাত্রা করাতে নিয়ে যেত, যে কাজ, সচরাচর পুরুষরাই করে থাকে। কুমুদিনীর অভিভাবকত্বে তীর্থ করে এসেছে এমন একজন তার কাজের বর্ণনা দিচ্ছে : 'একবার আমাদের মধ্যি দুজনের ভেদবমির ব্যারাম হোল গয়া যাবার পথে, নিজের হাতে তাদের কি সেবাটা করতি দ্যাখলাম! মায়ের মত। একবার গয়ালি পান্ডার সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করলেন, যাত্রীদের ট্যাকা মোচড় দিয়ে আদায় করা নিয়ে। সে কি চেহারা! বললে, তুমি জানো, আমার নাম কুমুদিনী, আমি ফি বচ্ছর দুশো যাত্রী গয়ায় নিয়ে আসি। গোলমাল করবা, তো এইসব যাত্রী আমি অন্য গয়ালি পাণ্ডার কাছে নিয়ে যাব। পাণ্ডা ভয়ে চুপ। তার কথাটি নেই।...অমন মেয়েমানুষ আমি দেখিনি। কেউ কাছে ঘেঁষে একটা ফষ্টিনষ্টি করুক দেখি? বাব্বা, কারু সাধ্যি আছে? নিজের মান রাখতি কি করে হয়, তা সে জানে।' মেয়েদের এই শক্তিমত্তার বিবরণ পড়ে বোঝা যায় গ্রামবাংলার মেয়েরা কৃষকবিপ্লবে অংশ নিয়েছিল অবশ্যই। উপন্যাসে বলাও আছে—দুলেদের মেয়ে এমন তীর চালায় যে নীলকুঠির বরকন্দাজ হটে যায়। এও বলা আছে : 'বাগদি, দুলে, মুচি, নমশূদ্দুরের মধ্যে অনেক মেয়ে পাবেন যারা ভালো সড়কি চালায়, কোঁচ চালায়, ফালা চালায়, কাতান চালায়।'

৩.

এমন সব শক্তিমতী মেয়েরা যে সমাজে বাস করত, পুরুষ-শাসিত সেই সমাজ কিন্তু তাদের জন্যে হাজার বিধিনিষেধের বেড়াজাল বিছিয়ে রাখতে ছিল রীতিমত সক্রিয়। একা-একা কিংবা কোনো পুরুষমানুষের সঙ্গে এমনকি নিজের স্বামীর সঙ্গেও পথে বেরোনো তখন নিষিদ্ধ ছিল মেয়েদের। অন্য পুরুষের খবরটুকু নেওয়াও ছিল নিষেধ, জোর গলায় গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ—এরকম কতরকমের যে নিষেধাজ্ঞা মেনেগ্রামের বধূদের দিন কাটাতে হতো—তার বিস্তারিত

ছবি আছে 'ইছামতী'তে। নিষেধাজ্ঞার সেই খাঁচার জীবনকে অস্বীকার করেছে—এমন তিনটি নারীচরিত্র আছে এ উপন্যাসে—গৃহবধূ নিস্তারিণী, সন্ন্যাসিনী ক্ষেপী আর সাহেবের পরিচালিকা গয়ামেম। সন্ন্যাসিনীকে তো সমাজের বাইরে থাকার অধিকার সমাজই দেয়, গয়ামেম সাহেবের পরিচালিকা বলে সমাজে অবহেলিত, তবু তো সে নেহাতই নিম্নবর্ণের মেয়ে, নিম্নবর্ণের সমাজের চোখরাঙানি অনেকটা কম। কিন্তু নিস্তারিণী উচ্চবর্ণের সমাজে বাস করেই সমাজের এইসব নিয়মকানুন অমান্য করার সাহস দেখিয়েছে। উপন্যাসের প্রতিফলক চরিত্র ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবানিতে এমন বিদ্রোহিণী প্রসঙ্গে শুনতে পাই : 'এরা সব ভবিষ্যতের মেয়ে, অনাগত ভবিষ্যৎ দিনের আগমনী এদের অলক্তরাগরক্ত চরণধ্বনিতে বেজে উঠছে, কেউ কেউ শুনতে পায়। আজ গ্রাম্য সমাজে পুঞ্জীকৃত অন্ধকারে, এইসব সাহসিকা তরুণীর দল অপাংক্তেয়—প্রত্যেক চণ্ডীমণ্ডপের গ্রাম্য বৃদ্ধদের মধ্যে ওদের বিরুদ্ধে ঘোঁট চলছে, জটলা চলছে, কিন্তু ওরাই আবাহন করে আনছে সেই অনাগত দিনটিকে।'

তাঁর শেষ উপন্যাসে 'ইছামতী'তে বিভূতিভূষণ এইভাবে অনাগত দিনের স্বপ্ন দেখেছেন, গ্রামবাংলার মেয়েদের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু মেয়েদের যাপনের বাস্তবকে তিনি কোনো স্বপ্ন কোনো কল্পনা দিয়ে কখনো ঢাকতে চাননি। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তাঁর প্রথম উপন্যাসের প্রধান দুই নারীচরিত্র সর্বজয়া আর দুর্গা। বৃদ্ধা ইন্দিরঠাকরুণের চোখ দিয়ে প্রথম দেখানো হয় সর্বজয়াকে—'হরিহরের বৌ দেখিতে টুকটুকে সুন্দরী হইলে কি হইবে, ভারি ঝগড়াটে...'। নিঃসহায় ঐ বৃদ্ধার সঙ্গে সর্বজয়া কী নিষ্ঠুর ব্যবহার না করেছে! আর দুর্গা—দুর্গার শৈশব আদৌ কোনো অপাপবিদ্ধ শৈশব নয়! তার না-মেটা সাধ মেটাতে সে চুরি পর্যন্ত করতে পারে! দুর্গারই অন্তরুক্তিতে শোনা যায় পিতম পিসির কথা—বাংলার মেয়েদের নিদারুণ বিধিলিপির কথা! দুর্গা অবাক হয়ে ভাবে—'মাগো, মানুষ কেমন করিয়া এমন নিষ্ঠুর হয়! কেন তাহার খোঁজ কেহ যে করে নাই। কতদিন সে নির্জ্জনে এই পিতম পিসির কথা ভাবিয়া চোখের জল ফেলিয়াছে।' কিশোরী দুর্গার অজানা ভবিষ্যতের ভয় এই পিতম পিসির জন্যে চোখের জলের সঙ্গে মিশে রয়েছে। কে জানে, মৃত্যু তাকে টেনে না নিলে সেও আর এক পিতম পিসিই হতো কিনা। 'পথের পাঁচালী'তেই আমরা একটি গ্রাম্য বধূ—গোকুলের বউ-এর উপর তার স্বামীর নিষ্ঠুর শারীরিক অত্যাচারের ছবি পাই। এরকম ছবি হয়তো আমরা তারাশঙ্করের লেখাতেও দেখেছি। কিন্তু আমার পাঠের সীমাতে আমি আর কোনো পুরুষ লেখককে জানি না, যিনি বিধবার একাদশী পালনের কষ্ট দেখাতে পেরেছেন। 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসে শুধু বয়স্কা বিধবা মায়ের কথা আছে তাই নয়, আছে তরুণী বীণার কথাও, আছে বেশ ধিক্কারের ভাষাতেই : 'মা কাল একাদশীর উপোস করে রয়েছেন, উনি কি আজও উপোস করে পড়ে থাকবেন?...ওই বীণারও গিয়েছে কাল একাদশী, ও ছেলেমানুষ, কপালই না হয় পুড়েছে, খিদেতেষ্টা তো পালায়নি তা বলে?' বীণার বঞ্চিত জীবনকে কী সহানুভূতি দিয়ে যে এঁকেছেন লেখক! এই বীণারই জবানিতে সমাজ-সংস্কারকে প্রশ্ন করেছেন লেখক—'পটল-খেতে মেয়েমানুষের যেতে নেই অযাত্রা বলে। আচ্ছা, মেয়েমানুষ কি সত্যিই অযাত্রা?'

গ্রামবাংলার কৌমজীবনে মেয়েদের দুরবস্থার একটা কারণ তাদের অশিক্ষা, আরেকটা কারণ কি তাদের অর্থনৈতিক সহায়হীনতা নয়? বিভূতিভূষণ জানতেন সেকথা! তাই 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' উপন্যাসে এক নামহীন গোয়ালা-বউকে দেখি শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনকে লুকিয়ে হাজারি ঠাকুরকে টাকা ধার দিতে চাইতে : 'আমি আপনাকে টাকা ধার দিচ্ছি, আপনি সুদ দেবেন কত করে বলুন।' এই মেয়েটির কাছ থেকে অবশ্য হাজারির আর টাকা নেওয়া হয়নি, কিন্তু অন্য দুজন মেয়েই তাকে

টাকা দেয়। হাজারি তাদের হোটেলের অংশীদারও করে দেয়। কুসুম এ কথা শুনে খুব খুশি হয়ে ওঠে—'মুখে তাহার আহ্লাদের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। এমন একটা হোটেলের সে অংশীদার ও মহাজন—এ একটা নতুন জিনিস তাহার জীবনে।' গ্রামবাংলায় মেয়েদের, যাদের হাতে সামান্য 'ব্যাঙের আধুলি পুঁজি' থাকে, তারাই ধার দিয়ে উপার্জন করার প্রয়াস করে। আর তো কোনো পথ নেই তাদের নিঃসম্বল অবস্থা দূর করার। হাজারি যেভাবে কন্যাসমা বিধবা মেয়েটির উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেয়, মনে হয় যেন বিভূতিভূষণও চেয়েছেন তার মধ্যে ঘরে ঘরে বাঙালি মেয়ের মুখে সম্বলময়তার হাসি ফুটিয়ে তুলতে। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' যে ইচ্ছাপূরণেরই উপন্যাস!

অবশ্য শুধুই মেয়েদের জীবনের দুরবস্থার কথাই বলেননি লেখক, বরং বেশিই বলেছেন বারোমাসের তেরো পার্বণে মেয়েদের আনন্দময় যোগদানের কথা—তাদের হাসি-ঠাট্টা গল্প-গাছার মতো। মেয়েদের যাপনের যেমন এই দুই দিকই তিনি দেখাতে চান, তেমনি দেখান মেয়েদের স্বভাবেরও দুই দিক—অত্যাচারী আর অত্যাচারিতা—এই দুই শ্রেণী। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'-এর হাজারি যে অতসীকে বলেছিল : 'তোমরা মেয়েরা যদি ভালো হও তো খুবই ভালো, মন্দ হও তো খুবই মন্দ'—এ বিশ্বাস মনে হয় লেখকের নিজেরই। তাই 'পথের পাঁচালী'র সেজ ঠাকরুণ সখীঠাকরুণ কিংবা 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র জ্যাঠাইমার মধ্যে যেমন মেয়েদের চূড়ান্ত মন্দ স্বভাব দেখতে পাই, তেমনি 'অশনি-সংকেত'-এর অনঙ্গ-বউ কিংবা 'কেদার-রাজা'র শরৎসুন্দরীর মধ্যে দেখি মেয়েদের চূড়ান্ত শক্তির দিক। কিন্তু মানুষ বিভূতিভূষণকে ছাপিয়ে গেছে শিল্পী বিভূতিভূষণ। তাই এমন চূড়ান্ত কোনো কিছু নেই যাদের মধ্যে, সেই ভালোয়-মন্দয় মেশানো মেয়েরাও যথেষ্ট বেশিসংখ্যকই উপস্থিত বিভূতি-সাহিত্যে। সৃষ্টি হিসেবে অসাধারণ এরাই। যেমন 'পথের পাঁচালী'র দুর্গা, যেমন 'অপরাজিত'র লীলা, যেমন 'আরণ্যকে'র কুন্তা। এদের ভুল-ভ্রান্তিই এদের মহান করেছে। একমাত্র বিভূতিভূষণই পারেন এমন চরিত্র আঁকতে।

১৯৯৭

তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে নারী

'তাঁহার উপন্যাসে স্ত্রী-চরিত্র অপ্রধান এবং প্রেম গৌণ'—এই মন্তব্য করেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্করের উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে। স্ত্রী-চরিত্র এবং প্রেম সম্বন্ধে একটা কোনো বিশেষ ধারণা থেকেই সমালোচক এমন মন্তব্য করেছেন। সে ধারণা সম্ভবত গড়ে উঠেছে পশ্চিমের উপন্যাস থেকে, আর বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পড়েও হয়তো।
কিন্তু তারাশঙ্করের উপন্যাসের ধরনই তো স্বতন্ত্র। সেই স্বাতন্ত্র্যের কথা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেভাবে বলেননি। ব্যক্তি নয় কৌম, অন্তর্জগৎ নয় বহির্জগৎ তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রাধান্য পায় বেশি। আর তাই নারী-পুরুষের যে হৃদয়-সংঘাত, আর সেই সংঘাতের সূত্রে যে ধরনের মেয়েদের উপন্যাসে দেখতে অভ্যস্ত আমরা, সেই মেয়েদের কোনো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চরিত্র আমরা তারাশঙ্করের উপন্যাসলোকে পাই না হয়তো, কিন্তু তাই বলে কি বলতে পারি 'তাঁহার উপন্যাসে স্ত্রীচরিত্র অপ্রধান?' আরেক ধরনের মেয়েদের কি দেখি না সেখানে আমরা, যাদের তারাশঙ্করই শুধু পারেন সৃষ্টি করতে?

চরিত্র-বিশ্লেষণে ততটা নয়, যতটা সমাজ-বিশ্লেষণে তারাশঙ্করের প্রতিভা স্ফূর্তি পায়—সে কথা বুঝে নেবার পর প্রশ্ন ওঠে—সে কোন্ সমাজ? তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে পেষণ এবং শোষণের বিবিধ তল-অবতল উন্মোচিত হচ্ছে ঠিকই, পেষ্য এবং শোষিত জনগোষ্ঠীর হাহাকার ধ্বনিত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেই হাহাকারই প্রধান বিষয় হয়ে ওঠেনি কখনো। কেননা সেসব উপন্যাসের দরিদ্র মানুষ দরিদ্র, কিন্তু ছিন্নমূল নয়। কৌমে তাদের মূল প্রোথিত। সেই কৌম ভেঙে যাচ্ছে, শিকড় থেকে উৎপাটিত হচ্ছে মানুষ—সেই ট্র্যাজেডিরই রূপকার তারাশঙ্কর। আর যা ছিল, তার বর্ণবৈভব উজ্জ্বল করে আঁকা হলে তবেই না ভাঙার ট্র্যাজেডি মর্মন্তুদ হয়ে উঠতে পারবে। তাই তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে-উপন্যাসে ফিরে ফিরে কৌমের ছবি আঁকেন। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : 'বস্তুর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলে যে-সামাজিক অগ্রগতির জন্ম হয়, এটাকে তারাশঙ্কর শুধু কথার কথা মনে করেন। না করলে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' বনোয়ারীর গল্প না হয়ে করালীর গল্পই হত।' এই সমালোচককে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয় করালীর গল্প হলে কি আর উপন্যাসটি 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' থাকতো আর, অর্জন করতে পারত তার শ্রেষ্ঠত্ব? করালীর গল্প বলতে পারেন অনেকেই, কিন্তু বনওয়ারীর গল্প বলতে পারেন একমাত্র তারাশঙ্করই। বনওয়ারীর গল্পই যে বলেন তারাশঙ্কর, তার মূলে সরোজবাবু দেখেন তাঁর নাটকীয়তা প্রীতি। তাই কী? সমালোচক যদি বোঝেন, করালীর মানসলোকেরও নাটকীয় সার্থকতা থাকা সম্ভব—তাহলে নাটকীয়তাপ্রিয় তারাশঙ্করকে তা তো আকর্ষণ করতেই পারতো। তাই মনে হয়, নাটকীয়তা প্রীতি নয়, তারাশঙ্করের আকর্ষণ কৌমের প্রতি, সেই পক্ষপাত থেকেই তিনি বনওয়ারীর কাহিনী লেখেন, দেবুর কাহিনী লেখেন।

আর কৌমের প্রতি যাঁর পক্ষপাত, তাঁর লেখায় স্ত্রীচরিত্র অপ্রধান হওয়া কি সম্ভব? কৌমকে ধরে রাখে যে মেয়েরাই। 'গণদেবতা' উপন্যাসে কৌমকে আঘাত করে অনিরুদ্ধর বিদ্রোহ, কৌম

তাকে প্রত্যাঘাত করে তার স্ত্রীর নবান্নর পূজা ফেরত দিয়ে। নবান্নই চাষিগ্রামের 'সত্যকার সর্বজনীন উৎসব', আর সে উৎসবে প্রধান ভূমিকা মেয়েদেরই—কুমারী কিশোরী মেয়েরা স্নান করে নতুন বাটিতে নতুন ধানের আতপ চাল, চিনি, মণ্ডা, দুধ, কলা ইত্যাদি মন্দিরে দিয়ে আসে। কুমারী মেয়ে যে বাড়িতে নেই, সে বাড়ির প্রবীণা মেয়েরা পূজা দিতে আসে। নবান্নের পর অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে 'ইতুলক্ষ্মী'—এ উৎসবে চাষিদের নিজের নিজের খামারে লক্ষ্মী পাতে মেয়েরা। কোনো মেয়ে ব্রতকথা বলে, অন্য মেয়েরা শোনে। অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তির পর পৌষ-সংক্রান্তি। পৌষ-সংক্রান্তিতে লক্ষ্মী পাতা—আঁউরি-বাউরি দিয়ে অর্থাৎ 'মুঠ-লক্ষ্মী'র ধানের খড়ের দড়িতে সমস্ত সামগ্রীতে বন্ধন দেওয়া, শেষ রাত্রে পৌষ আগলানো পর্ব—এসবই তো মেয়েদের করণীয়, উৎসব যদিও গোটা গ্রামের। মেয়েদের নিজস্ব অনুষ্ঠান হলো ষষ্ঠীপূজা—তারও বিবরণ আছে 'গণদেবতা'য়, বারোমাসের বারো ষষ্ঠির কথা আছে, আর বিশদ বর্ণনা আছে অশোক ষষ্ঠীর—পৌষ-সংক্রান্তির পর আসবে অশোক ষষ্ঠী, সকাল থেকে উপবাস করে মেয়েরা ষষ্ঠীদেবীর পূজা করবে ব্রতকথা শুনবে, অশোকফুলের আটটি কলি খাবে, প্রসাদী দই-হলুদ মিশিয়ে ফোঁটা দেবে ছেলেদের কপালে। অশোক ষষ্ঠীর পর নীল ষষ্ঠী—চৈত্র-সংক্রান্তির আগের দিন। মেয়েদের এইসব কৃত্যের ভিতর দিয়েই গড়িয়ে চলে 'গণদেবতা'র সময়।

এই গোষ্ঠী-চরিত্র প্রাধান্য পেলেও, মেয়েদের ব্যক্তিচরিত্রও তো উপেক্ষিত নয় 'গণদেবতা'তে। প্রধান পুরুষচরিত্র দেবু ঘোষের স্ত্রী বিলু অবশ্য কৌমেরই লক্ষ্মীপ্রতিমা, সে খুব ভালো ব্রতকথা পড়তে পারে, এছাড়া আর কোনো চরিত্রবৈশিষ্ট্য, গোষ্ঠী-স্বভাবের অতিরিক্ত কোনো ব্যক্তিস্বভাব দেওয়া হয়নি তাকে, কিন্তু তার বিপরীতে যে উর্বশী-প্রতিমাটি রচিত হয়েছে, সেই দুর্গা-চরিত্র কিন্তু ব্যক্তিত্বময়ী, কৌমস্বভাবকে ছাপিয়ে যায় তার বুদ্ধির উজ্জ্বলতা, মোহিনী উচ্ছলতা। উপন্যাসের যে একটি-দুটি চরিত্রে গতি আছে, 'দুর্গা'-চরিত্র তার অন্যতম। উপন্যাসের শুরুতে যাকে দেখি এক লাস্যময়ী স্বৈরিণী, দেবুর বিপদের দিনে তারই মধ্যে দেখা দেয় অন্য এক রূপ—'উদয়াস্ত দুর্গা বিলুর কাছে থাকে, দাসীর মত সেবা করে...'। ডেটিনিয়ু যতীনের ঘরে প্রজা-সমিতির সভা বসলে শ্রীহরি যখন জমাদার সাহেবকে ডেকে আনে, তখন এই দুর্গাই সাপের কামড় খাবার অভিনয় করে প্রজাসমিতির লোকজনদের পালিয়ে যাবার অবকাশ করে দেয়। উপেনের কলেরা হলে দুর্গাই সর্বাগ্রে যায় তার পরিচর্যা করতে। দেবুর ছোঁয়াচ লাগে তার মধ্যে। 'লীলাচঞ্চলা তরঙ্গময়ী' দুর্গা আশ্চর্য রকমের শান্ত হয়ে যায়, যতীনের মতো রূপবান তরুণ আর তাকে বিচলিত করতে পারে না। 'গণদেবতা'র পরের খণ্ড 'পঞ্চগ্রাম' দুর্গার জন্মান্তরে দেবুকে পাবার কামনাতে শেষ হয়। শুধু দুর্গা নয়, দুর্গার প্রেমকেও তারাশঙ্কর কিছু কম মর্যাদা দেননি। অথচ দুর্গা ডোমেদের মেয়ে, দুর্গা স্বৈরিণী।

এইখানেই প্রকাশ পায় তারাশঙ্করের জীবনকে দেখার বৈশিষ্ট্য। ডোম বলে স্বৈরিণী বলে তিনি দুর্গাকে নিচু চোখে দেখতে পারেননি। কেননা তিনি জানেন কীভাবে উচ্চবর্ণের বাবুরা লোভ এবং ক্ষমতার জোরে এইসব নিম্নবর্ণ মেয়েদের ভোগ করে এসেছে—'আমরাই এদের সমগ্র নারী-সমাজকে এমন করে তুলেছি যে এরা ক্রমে হয়ে উঠেছে জন্মগত স্বৈরিণী, চারিদিকের সমাজের সকল লম্পটের দেহজ বিষ এদের দেহে সঞ্চারিত হয়েছে, গোটা সম্প্রদায়কে বিষাক্ত ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলেছে।' দুর্গাকে দুর্গা রেখেই তাই তারাশঙ্কর তাকে মহিমা দিতে পারেন, শরৎচন্দ্র যেমন রাজলক্ষ্মীকে আদর্শায়িত করে আঁকেন, তার কোনো প্রয়োজন দেখেন না তারাশঙ্কর। মোহিতলালের ভাষায় 'জীবন সম্বন্ধে কোনো থিয়োরী বা মতবাদ, কোনো বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক ধমক বা চমক তাহাতে নাই'। জীবনের

বিচিত্র রূপের কুতূহলী তিনি, সে রূপ তিনি খুঁজে পান সমাজের উপরতলায় নয়, অন্ত্যেবাসীদের নানান সম্প্রদায়ের মধ্যে—সেইসব বিচিত্র সম্প্রদায়ের বিচিত্ররূপিণীদের তিনি নিয়ে আসেন তাঁর সৃষ্ট জগতের আঙিনায়, এমন সব চরিত্র সৃষ্টি করেন, যার জন্যে 'মেধ্য-অমেধ্য শুচি-অশুচি বিচার ত্যাগ করিতে হয়।' ভদ্র-সমাজের পোষমানা প্রেমের ছবি নয়, তারাশঙ্করের কলমে ফোটে বন্য প্রেম, সেই আদিম আবেগ, তাঁর 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'র কাহাররা যাকে বলে 'অং' ধরা।

সে রঙের নেশায় কাহার সম্প্রদায়ের পুরুষেরা পারে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রাণ নিতে, কিন্তু প্রাণ দিতে পারে মেয়েরাই। প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের উদগ্র কামনায় প্রাণ দেয় কালোশশী, প্রেমিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ, প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতা মানতে না পেরে প্রাণ দেয় পাখি। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'তে আছে লক্ষ্মী-উর্বশীর যুগ্ম প্রতিমা—বনওয়ারীর স্ত্রী গোপালিবালা যেন লক্ষ্মী-প্রতিমা—শান্ত, বাধ্য ঘরোয়া ঠাণ্ডা মেয়ে সে, আর বনওয়ারীর প্রেমিকা কালোশশী যেন উর্বশী-প্রতিমা—কামরূপের ডাকিনীর মতন তার সাহস, আর 'তেমনি মোহিনী'। লক্ষ্মী-প্রতিমার তুলনায় তারাশঙ্করের পক্ষপাত কিন্তু উর্বশী-প্রতিমা নির্মাণেই। ঘরের মেয়েদের তো এঁকেছেন অনেকেই, তারাশঙ্করের প্রতিভা চিনিয়েছে পথের মেয়েদের—বিচিত্র উপজীবিকার মেয়ে, যারা পথে পথে ঘোরে। পুতুল তৈরি করে ফেরি করে বেড়ায় পোটোর মেয়ে রাঙাদিদি, বাজীকরি বাড়ি বাড়ি নাচ-গান দেখায়, বশীকরণের ওষুধ দেয়, কিংবা বাঘ নিয়ে খেলা দেখায়, নাচ-গান করে বেড়ায় বেদের মেয়েও, আর গান গেয়ে ভিক্ষা করে পথে চলা বৈষ্ণবের মেয়ের উপজীবিকা।

এই বিচিত্ররূপিণীরা কেবল পুরাণ-প্রতিমায় নয়, এরা প্রাণ পায় জন্তু-প্রতিমাতেও। বনওয়ারীর দ্বিতীয় স্ত্রী সুবাসী বনওয়ারীর মুখের দিকে সাপের মতো নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে : 'ঠিক সাপের মতো।' জন্তু-প্রতিমার এক বিপরীত প্রয়োগ দেখি 'নারী ও নাগিনী' গল্পে, নাগিনীর মধ্যেই সেখানে দেওয়া হয়েছে নারীর স্বভাব। 'নাগিনী-কন্যার কাহিনী'-তে আছে সাঁতালি গ্রামের বিষবেদে সম্প্রদায়ের বেদেনী মেয়েদের কথা : 'বেদের মেয়েদের চলনই খর, বলনও খর, চাওনিও খর...বেদের কন্যের লাজ নাই শরম নাই, বেদের কন্যের ধরম নাই, বেদের কন্যের ঘরের মায়া নাই ; বেদের কন্যে বেদেনী অবিশ্বাসিনী। রীতিচরিত তার লাগের কন্যে লাগিনীর মতন। রাত লাগলি, আঁধার নামলি চোখে নেশা লাগে, বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে, নাগিনীর মতন সনসনিয়ে চলে, ফণা তুলে নাচে। সে নাচন যে দেখে সে সংসার ভুলে যায়।' কিন্তু বেদেনী যদি নাগিনীকন্যা হয়? বিষবেদে সম্প্রদায়ের কেন্দ্রমণি এই নাগিনীকন্যার ধারণা—বাইরের কিছু লক্ষণ দেখে কোনো মেয়েকে 'নাগিনীকন্যা' রূপে বরণ করে নেয় কৌম, তারপর তাকে হতে হয় তপস্বিনী—বিষবেদে সম্প্রদায়ের 'জীবনের সকল অনাচারের পাপের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে ওই তপস্বিনী-কন্যার পুণ্য তাদের সম্বল ; অনায়াস নির্ভাবনায় তারা মিথ্যাচরণ করে চলে, ওই অক্ষয় সত্যের ভরসায়।' কৌমের মধ্যে অন্যায় ঘটলে তার প্রতিবাদ কিন্তু করে এই মেয়েরাই—শবলা কন্যা প্রতিবাদ করে জীবন নেয়, আর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিজের ধর্ম রাখতে জীবন দেয় 'সাক্ষাত দেবতার মতো পিঙ্গলা কন্যা।' এই পিঙ্গলাকন্যাই কৌমের মর্যাদা রাখতে অনায়াসে নির্বসনা হতে পারে বহু লোকের সামনে। বাড়ি থেকে সাপ বের করবার জন্যে বেদেদের ডাকলে বেদেরা নিজেদের কোমরের কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে সাপ নিয়ে যায় পুরস্কার পাবার লোভে। পিঙ্গলার সঙ্গী বেদেরাও তাই করেছিল একবার, একজন ওঝা এসে তাদের কাপড়চোপড় পরীক্ষা করতে চাইলে তাদের বাঁচাবার জন্যে পিঙ্গলা মুহূর্তের মধ্যে পরনের কাপড় খুলে ফেলে আবার পরে নিয়ে সাপ ধরতে যায়। ভদ্রলোকের বিচারে এই লজ্জাহীনা নারী ঘৃণ্য, কিন্তু তারাশঙ্কর একেই দিতে পারেন দেবীর মর্যাদা।

একটি ছোটোগল্পেও এমন একটি বাজিকরী মেয়ের চরিত্র পাই, যে টাকার জন্যে বিবসনা হয়ে নাচতে পারে স্বচ্ছন্দে—'মেয়েটা সত্যই নাচে সমস্ত আবরণ পরিত্যাগ করিয়া। এতটুকু সঙ্কোচ নাই কুণ্ঠা নাই, যৌবন-লীলায়িত অনাবৃত তনুদেহ, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি।' এই মেয়েটিরও মহত্ত্বের দিকই দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর 'যাদুকরী' নামে গল্পটিতে। মেয়েটির কাজেকর্মে মানুষের মঙ্গলেচ্ছা, মানুষের জন্যে মমতাবোধ ছাড়া আর কিছু নেই, সেইসঙ্গে আছে ক্ষুরধার বুদ্ধি। বুদ্ধি করেই সে ডোমেদের ঘরের একটি ছেলেকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচায়। এই বাজিকর-সম্প্রদায়ের কথা তারাশঙ্কর জানান এ গল্পে—'নটী ও রূপোপজীবিনীদের সন্তান-সন্ততি লইয়া গঠিত হইয়াছিল এই সম্প্রদায়।' এ সম্প্রদায়ের নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীই গুপ্তচরের কাজ করত।

জন্তু-প্রতিমা তারাশঙ্করের গল্পে আরো এসেছে, বিশেষ করে সাপের মোটিফ, ব্যবহৃত হয়েছে নারীর আচরণ-বর্ণনায়। 'বেদেনী' গল্পের 'রাধিকা' জন্তু-প্রতিমার আরেক দৃষ্টান্ত। সে কখনো সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে যায়, কখনো হিংস্র সাপিনীর মতো শনশন করে চলে। সাপের মোটিফ পাবো 'ডাইনী' গল্পেও, তবে সেখানে বহিরঙ্গে নেই সে উপমা, আছে ডাইনির মনোজগতের বর্ণনায়—'সর্বনাশী লোলুপ শক্তিটা সাপের মতো লকলকে জিহ্বা বাহির করিয়া ফণা তুলিয়া নাচিয়া উঠে।' বৃদ্ধা ডাইনী ক্রোধে সাপিনীর মতো ফুলেও ওঠে, আবার ক্রুদ্ধা অজগরীর মতো ফোঁসফোঁসও করে।' একটু অন্যভাবে জন্তুর মোটিফ এসেছে 'রাখাল বাঁড়ুজ্জে' গল্পে—ধুরন্ধর রাখাল বাঁড়ুজ্জে বিধবা হৈমর নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করে তার সম্পত্তি গ্রাস করবার জন্য। ফন্দি ব্যর্থ হলে তার সমস্ত আক্রোশটা গিয়ে পড়ে হৈমর বাড়ির একটা বিড়ালের উপর, বিড়ালটাকেই তখন পৈশাচিকভাবে হত্যা করে সে। এই বিড়াল রাখাল বাঁড়ুজ্জেকে দেখলেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতো, হৈম যে রাখাল বাঁড়ুজ্জের শয়তানিকে প্রতিহত করতে পারছিল না, তারই লুকানো মর্মজ্বালা যেন প্রকাশ পেত ঐ বিড়ালটার আচরণে। অসহায় নারীর উপর পুরুষ-শাসিত সমাজের পেষণের গল্প এই 'রাখাল বাঁড়ুজ্জে'। এ জাতীয় গল্প কমই লিখেছেন তারাশঙ্কর। তাঁর অনেক গল্পে সংসারী মেয়েদের দেখা যায়, তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বলে মনে হয় না তাদের। তারাশঙ্কর মোহিত হয়ে দেখেছেন মোহিনীদেরই। সেই মোহিনীদের মধ্যে কেউ কেউ 'বেদেনী' গল্পের রাধিকার মতো বাসনায় উন্মত্ত, হাঁসুলি বাঁকের কালোশশীর মতন তারা মাতন চায়। আরেক ধরনের মোহিনী আছে, যারা মাতায় কিন্তু নিজেরা মাতে না, 'রাঙাদিদি' গল্পের রাঙাদিদি যেমন। রাঙাদিদির অনুগ্রহ পেতে চাইত যারা, রাঙাদিদি তাদের সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলত, তাই নিয়ে তাকে কথা শুনতে হত বিস্তর। কিন্তু বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যুর পর সে সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলেই সকলকে ছেড়ে দূরে চলে গেল। রাঙাদিদি পোটো সম্প্রদায়ের মেয়ে, 'রাঙাদিদি' গল্পে এই সম্প্রদায়ের কথা বিস্তারিতভাবে বলেছেন তারাশঙ্কর। পোটো সম্প্রদায়ের তুলনায় বাংলা সাহিত্যে বেশি পরিচিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়। তবে তারাশঙ্কর লিখেছেন বিশেষ করে রাঢ় অঞ্চলের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কথা। এই সম্প্রদায় নিয়ে যে গল্পগুলি লিখেছেন তিনি, তার প্রতিটিতেই পাই সেই দ্বিতীয় ধরনের লীলাচঞ্চলা মোহিনী নারীকে, যে বহু পুরুষকে আকর্ষণ করে সহজে, আর এজন্যে কলঙ্কও রটে তাদের, কিন্তু নিজে তারা বহু পুরুষে আকর্ষিত হয় না। রসকলি, রাইকমল, মালাচন্দন—এসব ছোটোগল্পে, রাইকমল উপন্যাসে ফিরে ফিরে সেই বৈষ্ণবীর সঙ্গে দেখা হয় আমাদের, যার বর্ণনা : 'মুখে তার মধুর হাসি, চোখে তার আনন্দ, কোন অসূয়া নাই, আক্ষেপ নাই—এলানো চুল, সে চুলের রাশির পরে খাঁজ কাটিয়া গলাটি বেড়িয়া অঞ্চলখানি।' এরা সকলেই শেষ পর্যন্ত একাকিনী, ঘর ছেড়ে পথের পথিক। এদের চরিত্রে মাধুর্যর সঙ্গে একধরনের সবলতাও আছে, গল্পের নায়কদের

তুলনায় এরা মানবতাতেও অনেকটা উন্নত। পুলিনের তুলনায় মঞ্জরী, রঞ্জনের তুলনায় কমলিনী, মোহন দাশের তুলনায় তুলসী মানুষ হিসেবে অনেক বড়ো। 'শ্রীকান্ত'র কমললতা বৈষ্ণবী কিন্তু শ্রীকান্তর থেকে বড়ো নয়। বৈষ্ণবী চরিত্র নিয়ে তুলনা করলে বলা যায় তারাশঙ্কর শরৎচন্দ্রের থেকে নারীচরিত্রকে মূল্য দিয়েছেন অনেক বেশি।

নারীচরিত্রের দিক থেকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তারাশঙ্করের আরো একটু তুলনা করতে ইচ্ছা হয়। 'দেবদাস'-এ যেমন পার্বতী আর চন্দ্রমুখীর বিপরীতধর্মী লক্ষ্মী-উর্বশী যুগ্মতা আছে, তেমনি। যুগ্মতা পাই 'কবি' উপন্যাসের ঠাকুরঝি আর বসনের মধ্যেও। পার্বতী আর ঠাকুরঝি দুজনেই গৃহবধূ, চন্দ্রমুখী আর বসন দুজনেই বারবনিতা। পার্বতী আর চন্দ্রমুখী দুটি চরিত্রই শরৎচন্দ্র মেয়েদের যেমন হলে ভালো মনে করতেন, তেমনই। বৃদ্ধ স্বামীর প্রথমপক্ষের বড়ো বড়ো ছেলেমেয়ে নিয়ে দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী পার্বতীর শান্তির সংসার। আর চন্দ্রমুখী দেবদাসকে ভালোবেসে বারবনিতার জীবন পরিত্যাগ করে। তারাশঙ্করের ঠাকুরঝি কবিয়াল নিতাইকে ভালোবেসে তার অদর্শনে পাগল হয়ে মৃত্যুবরণ করে, আর বসন—সে নিতাইকে ভালোবাসলেও তার বারবনিতা-জীবনের কোনো অনাচারই ত্যাগ করে না, বারবনিতা যেমন হয়, ঝুমুর দলের মেয়ে যেমন হয়, বসন ঠিক তেমনি থেকে গেল আমৃত্যু। বসন চরিত্রের উৎস সম্বন্ধে তারাশঙ্কর লিখেছেন, 'রাঢ় অঞ্চলের মেলায় ঘুরে ঘুরে নিম্নস্তরের দেহপণ্যাদের নিদারুণ দুর্দশা আমি দেখেছি। এদের অধিকাংশই অবশ্য প্রেমের ছলনায় ভুলে গৃহত্যাগ করে এই পাপপঙ্কিল চোরাবালিতে এসে পড়ে তিলে তিলে ডুবে মরে।...দুঃখবোধ লজ্জা নেই, সবই নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যায়। মানবাত্মার এই নিষ্ঠুর অপমান অসহ্য।' সেই অসহ্য বোধ থেকেই জন্ম নিতে পারে বসনের মতো চরিত্র, পদে পদে মানবাত্মার অপমানের মধ্যে যে চরিত্রে মানবাত্মার ঐশ্বর্যও প্রকট পেতে পারে। মোহিতলালের ভাষায়, 'একমাত্র রুশ-সাহিত্যিক ডস্টয়েফ্স্কি ছাড়া আর কোনো পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিকের বাস্তবনিষ্ঠ কল্পনা নারীদেহের এতখানি দুর্গতি ও সেইসঙ্গে নারী-আত্মার এতখানি শক্তি এমন গভীর বর্ণে চিত্রিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু এ কাহিনীর কবিশক্তি এই কারণে আরও বিস্ময়কর যে, এখানে নারী-জীবনের সেই এক ট্র্যাজেডি, একই মাত্রায় ও প্রায় একই আকারে সংঘটিত হইয়াছে—অতি সাধারণ প্রতিবেশে, অতি সামান্য আয়োজন-উপকরণে ; ইহা আভিজাত্যের সকল আভরণ-বর্জ্জিত। কিন্তু তাহাতেই ক্রুশবিদ্ধ মহাপুরুষের মত ঐ ক্রুশবিদ্ধ নারীর অন্তরাত্মার—তাহার নিঃসঙ্গ নৈরাশ্য যাতনার—মর্মভেদী রব আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।'

বসন ঝুমুরদলের মেয়ে। ঝুমুর দলের মেয়েদের সম্বন্ধে বলা আছে উপন্যাসে : 'বহু-পরিচর্যাই ইহাদের ব্যবসা, কিন্তু নারীচিত্তের স্বভাবধর্মে একটি বিশেষ অবলম্বন ভিন্নও ইহারা থাকিতে পারে না।' নারীচিত্তের এই স্বভাবধর্মে যেমন বিশ্বাস ছিল তারাশঙ্করের, তেমনি তাঁর নীতি-দুর্নীতি-জ্ঞানহীন সত্যদৃষ্টি ছিল নারীদেহের ধর্মের প্রতিও। সেই দেহধর্মের তাগিদেই 'পঞ্চগ্রাম'-এ অনিরুদ্ধর স্ত্রী এসেছে উপযাচিকা হয়ে দেবুর কাছে, দেবুর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে-মুহূর্তে সে এমনকি গিয়ে দাঁড়াতে পেরেছে তার চরম ঘৃণ্য শ্রীহরি ঘোষের কাছেও! জৈবিকতার ঘোর কেটে গেলে অবশ্য সে সেখান থেকে চলে যায়। নারীর এই দেহধর্মের কথা স্পষ্টভাষায় বলেছেন তারাশঙ্কর 'অভিযান' উপন্যাসে ফটকির কথা বলতে গিয়ে : 'তার নারী-জীবনের দেহগত স্বাভাবিক ক্ষুধা বৈধব্যের বাঁধে বাঁধা পড়েছিল সমাজ ও শাস্ত্রের নির্দেশে। সে বাঁধের গায়ে রাত্রির অন্ধকারে সরীসৃপের মতো বিষ-নিঃশ্বাস দিয়ে নির্গমনপথ সৃষ্টি করে গিয়েছে বড় মোড়লের ছেলে। অভ্যাস ও প্রবৃত্তির তাড়নায় রাত্রির অন্ধকারে সে ক্ষুধার্ত ধারা উতলা এবং মত্ত হয়ে উঠেছে। ভালমন্দ পাপপুণ্য সব তার কাছে এখন তুচ্ছ।' কিন্তু এরকম নগ্ন প্রবৃত্তির ছবি কমই আছে তারাশঙ্করের সাহিত্যে, তুলনায় নারীস্বভাবগত

একনিষ্ঠ প্রেমের ছবিই বেশি। এই ঝটকিও তো বদলে যায়—যে তাকে স্নেহ দিয়েছে, দেহসর্বস্ব করে দেখেনি, সেই দরিদ্র নরসিং-এরই আশ্রয়ে আসে সে নিজে থেকে, উকিলবাবুর ঘরের সুখকে প্রত্যাখ্যান করে। নরসিং অবাক হয়ে ভাবে—'কিসের গুণে এমন হয়? পেটের জ্বালায় যে দুনিয়ায় মা ছেলে বিক্রি করে, ভাল খাবার-পরবার লোভে যে দুনিয়ায় সধবা কুমারীতে ইজ্জৎ বিক্রি করে—সেই দুনিয়ায় এও ঘটে?'—এই তো ভালোবাসার গুণ, যা দেহকামনার থেকে অনেক বড়ো। তাঁর পরবর্তীযুগের উপন্যাস 'যতিভঙ্গ'-র নায়িকা রৌশন তাই বলেছে—'আমি মডার্ন মন্দ মেয়ে রৌশন বাপুজী, সেই আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, বাপুজী, দুনিয়ার মেয়েরা বাপ ভুলতে পারে মা ভুলতে পারে, সন্তানও ভুলতে পারে, কিন্তু তার সেই দিলের আদমি পুরুষকে ভুলতে পারে না।'

এই হলো প্রিয়ার জাতের মেয়েদের কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন মেয়েদের আরেকরকম জাতের কথা, যা মায়ের জাত, তারাশঙ্করও তা দেখতে পেয়েছিলেন ঠিকই। মায়ের জাত আর প্রিয়ার জাতের যুগ্মতা একই সঙ্গে ধরা আছে 'গণদেবতা' উপন্যাসে—পদ্ম আর দুর্গা চরিত্রে। পদ্ম আর দুর্গা দুজনেই বন্ধ্যা, কিন্তু দুর্গার 'ছেলে-ছেলে করিয়া আকুতি নাই', যেমন আছে পদ্মর। পথে যেতে পথের ধূলায় কোনো শিশুকে দেখলেও পদ্মর মায়ের স্নেহ জেগে ওঠে, দুর্গা তার দিকে ফিরেও তাকায় না। ডেটিনিয়্যু যতীন গ্রামে বাস করতে এলে পদ্ম তার সঙ্গে মা-ছেলের সম্পর্ক পাতিয়ে নেয় অনায়াসে, আর দুর্গাকে সে টানে তার তারুণ্য-দীপ্ত রূপে। 'চাঁপাডাঙার বৌ' উপন্যাসে বউদি-দেবরের ঘনিষ্ঠতাকে সকলেই বাঁকা চোখে দেখেছে, উপন্যাসের শেষে পৌঁছে সকলে জেনেছে বন্ধ্যা চাঁপাডাঙার বউ তার দেবর মহাতাপের চোখে ছিল মাতৃপ্রতিমা, তার মাতৃত্বের ক্ষুধা সে দেবরকে দিয়ে মিটিয়েছে, বয়সে খুব কাছাকাছি হলেও। 'স্বর্গ-মর্ত্য' উপন্যাসের টানাপোড়েন মা আর তার পালিত পুত্রের। সন্তানের জন্যে মায়ের কান্না কবিত্বময় ভাষায় রূপ দিয়েছেন তারাশঙ্কর : 'পৃথিবী বলিল—আরও কাঁদ তুমি। তোমার সন্তানেরা তোমার কোল ছাড়িয়া ছুটিয়া চলে ভবিষ্যবধূর হাতছানিতে! প্রৌঢ়া তুমি অনুসরণ করতে পারো না, এমনি করিয়া চিরকাল কাঁদিয়া আসিয়াছ, আজও কাঁদিতেছ ; সেই অশ্রুর একটি বিন্দু বিন্দু হইয়া আমাদের স্নান করায়।' মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা কোনো পাত্র-অপাত্র জ্ঞান করে না, নারী, সে যে পরিস্থিতিতেই থাকুক না কেন, মায়ের ব্যাকুলতা তার অন্তর মথিত করে। 'মেলা' গল্পে দেখি স্বৈরিণী কমলির মাতৃত্ব হঠাৎ জেগে ওঠে মেলায় হারিয়ে যাওয়া মণিকে পেয়ে। 'ডাইনির বাঁশি' গল্পে অনাথিনী স্বর্ণ মাতৃত্বের পিপাসায় 'টুকুকে আবার তেমনি করিয়া বুকে চাপিয়া চুম্বন' করিতে চায়, আর তারই অধীরতায় সে ডাইনি প্রতিপন্ন হয়ে যায়!

কিন্তু এই প্রিয়া বা মায়ের জাতের মেয়েদের সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক কি কেবলই প্রেমের? তার মধ্যে সংঘর্ষ নেই কোনো? নারী-পুরুষ সম্পর্ক কি পেষ্য-পেষকের সম্পর্ক নয়? আর তাহলে তার মধ্যে যে প্রঘাত (Violence) থাকবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। গ্রামীণ নিম্নবর্ণ সমাজে পুরুষ-প্রঘাত এমনই জলভাত, মেয়েরা তাতে এতই অভ্যস্ত যে, তাতে নারী-পুরুষ সম্পর্কের কোনো হেরফের ঘটে না। 'গণদেবতা' উপন্যাসে যেমন : 'পাতুর আর সহ্য হইল না, সে বাঘের মত লাফ দিয়া বউকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকে বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিল।' তারাশঙ্কর জানেন পাতুর সমাজে এ প্রঘাত নিত্য নৈমিত্তিক, এ ছবি মেয়েদের উপর অত্যাচারের ছবি বলে তিনি গুরুত্ব দেন না, তিনি শুধু পাতুর জীবনের বাস্তব ছবিটুকু ফুটিয়ে তোলেন। মেয়েদের উপর প্রঘাত স্বাভাবিকতার সীমা ছাড়িয়ে অস্বাভাবিক হয়ে যায় কখনো, যদি মৃত্যু ঘটে মেয়েটির। হাঁসুলি বাঁকের উপকথায় আছে এরকম কিছু অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিবরণ, সেইসঙ্গে এও বলা আছে—থানায় লেখা হয় মেয়েটি চরিত্রহীনা, অতৃপ্ত বাসনা থেকে আত্মহত্যা করেছে। অর্থাৎ পুরুষ-প্রধান সমাজ এবং রাষ্ট্রের মদতও পায় অপরাধী

পুরুষ! অথচ কী ভয়াবহ সেসব হত্যা! সুচাঁদ বুড়ি বলে তার কত্তাবাবা তার প্রথম কত্তামাকে মেরেছিল বুকের উপর বসে শিলনোড়ার নোড়ায় মাথা ছেঁচে! রতনের পূর্বপুরুষ চড় মেরে মেরে ফেলেছিল তার বোনকে। গুপীর পূর্বপুরুষ বিষ খাইয়েছিল স্ত্রীকে। পরমের পূর্বপুরুষের বাহাদুরি সবচেয়ে বেশি। সে তার বউয়ের হাতে পায়ে বেঁধে মুখে কাপড় বেঁধে গলায় দড়ি ঝুলিয়ে দিয়েছিল—কোনো প্রমাণ রাখেনি তার হত্যার। শুধু হাঁসুলি বাঁকই নয়, তারাশঙ্করের উপন্যাসে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে নারীর উপর পুরুষ-প্রঘাতের ছবি। কিন্তু সে তো অন্য ঔপন্যাসিকদেরও কারো কারো রচনায় দেখি, দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করতে পারি শৈলবালা ঘোষজায়ার কথা। কিন্তু তারাশঙ্করের মেয়েরা শুধু মার খায় না, শুধুই মরে না, কোথাও কোথাও তারা মার দিতেও পারে, মারতেও পারে। হাঁসুলিবাঁকের পাখি তার বিশ্বাসহন্তা স্বামীকে এক কোপে রক্তাক্ত করে তারপর আত্মহত্যা করেছে। আর 'বেদেনী' গল্পের রাধিকা, নতুন প্রেমিকের সঙ্গে চলে যাবার আগে স্বচ্ছন্দে তার স্বামীর তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে বলতে পারে, 'মরুক বুড়া পুইড়্যা'। 'পিঞ্জর' গল্পে বাজিকরদের দলের পাহাড়ী হাতের অস্ত্রাঘাত পেয়ে মরবার আগে পাহাড়িনীও তার অস্ত্রের আঘাতে নৃশংসভাবে খুন করে পাহাড়ীকে। নাগিনীকন্যা শবলা—শিরবেদে মহাদেবকে উলঙ্গ হয়ে আলিঙ্গন করে তার বুকে বিঁধিয়ে দেয় বিষকাঁটা—এ হত্যা তার প্রতিশোধ, কুটিল মিথ্যাচারী মহাদেব হত্যা করেছিল তার প্রেমিককে—নাগিনীকন্যা নাগিনীর মতোই তার প্রতিশোধ নেয়। এমন প্রতিশোধের ছবি তারাশঙ্করই আঁকতে পারেন শুধু।

যে সমাজব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, যে সমাজে রয়েছি আমরা এখন, তার বাস্তবতায় নারী-পুরুষের পেষ্য-পেষক সম্বন্ধই সত্য, সেই সম্বন্ধের সঙ্গে জড়ানো থাকবেই ঘাত-প্রতিঘাত। কিন্তু অন্য আরেকরকম সমাজের স্বপ্ন ছিল 'পঞ্চগ্রামে'র দেবুর, সেই স্বপ্ন তারাশঙ্করেরই : 'তোমার আমার সে সংসারে সমান অধিকার, স্বামী প্রভু নয়, স্ত্রী দাসী নয়—কর্মের পথে হাত ধরাধরি করে চলব আমরা।...তোমার আমার দুজনের উপার্জনে চলবে আমাদের ধর্মের সংসার।'—দেবুর এই স্বপ্নে মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার কথাও বাদ যায়নি।

'পঞ্চগ্রামে'র এই স্বপ্ন কি পরবর্তী উপন্যাসমালায় ফলিয়ে তুললেন কোথাও তারাশঙ্কর? না, তা সম্ভব নয়, কেননা সুখী-পরিবারের নয়, অসুখী পরিবারেরই ছবি আঁকেন ঔপন্যাসিক, কেননা সব সুখী-পরিবারই একরকম, আর প্রতিটি অসুখী পরিবার স্বতন্ত্র—আনা কারেনিনা উপন্যাসের প্রথম এই বাক্যটি বড় মর্মান্তিক সত্য। হ্যাঁ, অসুখী পরিবার কিংবা অসুখী মেয়েদেরই ছবি এঁকেছেন তিনি পরবর্তীকালের অনেক উপন্যাসে—বিপাশা কিংবা রিনা ব্রাউন কিংবা রৌশন কিংবা মণিবউদি—এরা কেউ কারো মতো নয়, প্রত্যেকেরই আছে নিজস্ব জ্বালাময় অভিজ্ঞতার জগৎ, কিন্তু সকলেই তারা অসুখী। আরো একটা মিল আছে তাদের—তারা সকলেই ছিন্নমূল। মূল থেকে উৎপাটিত যে নয়, তার পৃথিবী যন্ত্রণাকাতরও নয়—শিকড়সন্ধানী তারাশঙ্কর এভাবেই দেখেছেন মানুষকে—নারীকে।

তাঁর সৃষ্ট নারীর মধ্যে রূপবৈচিত্র্যেরও অন্ত নেই—কোথায় ইতিহাসের পটভূমিতে রূপসী গন্নাবেগম, যে কবি, যে ঈশ্বর-সাধিকা, আর কোথায় বা মেয়ে-যাত্রা মঞ্জরী অপেরার প্রোপ্রাইটর মঞ্জরী। যে তারাশঙ্কর 'রাধা' উপন্যাসের মাধ্যমে বলতে পেরেছেন রাধাকে অস্বীকার করে সাধকের সাধনা সম্পূর্ণ হতে পারে না, তিনি যে তাঁর সাহিত্যসাধনায় নারীকে এইভাবে এমন বিচিত্ররূপে প্রকাশ করবেন—এইটেই তো প্রত্যাশিত।

১৯৯৭

নারীমুক্তি আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১. 'সুব্রতার মধ্যে ন্যাকামি নাই।' ('শহরতলী')

২. 'মেয়েরা আজ প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে ন্যাকামি আর ভাবপ্রবণতার। বিদেশী কর্তারা শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেনি...জীবনের মান নামিয়ে এনেছে একটানা শোষণে...তবু স্নেহাতুর, স্নায়বিক কোমলতার পাঁকে আটকে থাকার অপরাধ যেন শুধু মেয়েদের।' ('স্বাধীনতার স্বাদ')

৩. 'তবু যেন কেশব মানতে পারে না যে তার হিস্টিরিয়া হয়েছে। ন্যাকা মেয়েদের যে রোগ হয়।' ('আরোগ্য')

৪. 'সে ভাবে, এবার নিশ্চয়ই তাকে ঘরে ডাকা হবে। বলা হবে, বোসো। খানিকটা ন্যাকামি করেছে তো।' ('সার্বজনীন')

৫. 'দেবতাদের ভুলে যাও। দেখবে এ ভালোবাসা ন্যাকামির মত লাগছে।' ('পাশাপাশি')

তাঁর কলমের অস্ত্রে সমাজের যে যে ব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধ করে গিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ন্যাকামি যে তাদের অন্যতম, উপরের দৃষ্টান্তগুলি তারই পরিচায়ক। 'ন্যাকামি' শব্দটি, ভাববাচক বিশেষ্যর মধ্যে হয়তো-বা সবচেয়ে বেশিই ব্যবহৃত তাঁর রচনায়। 'ন্যাকামি'র পাশাপাশি 'ভাবপ্রবণতা' শব্দটিও কখনো তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে। ন্যাকামি বা ভাবপ্রবণতা বিষয়ে এই তীব্র প্রতিকূল মনোভঙ্গির প্রতিক্রিয়াই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নারীকল্পনার ভিত। তাঁর নায়িকারা তাই 'সবলা' হয়েই জন্মেছে মনে হয়, বিধাতার কাছে আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার ভিক্ষা করতে হয়নি তাদের। খুব সচেতন ভাবেই মেয়েদের স্টিরিওটাইপ ভাঙতে চেয়েছেন মানিক। তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত—'শহরতলী'র যশোদা, চেহারা যার চওড়ার দিকে একটু বেশি: রূপ নেই তার, আছে চারিত্র্য, আছে বীর্য, তার চেহারা নিয়ে রসিকতা করলে কাশীবাবুর মুখ সে মাটিতে ঘষে দিতে পারে। নেতৃত্বের ক্ষমতা তার সহজাত। কোনো রাজনৈতিক দীক্ষা ছাড়াই তাই সে রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে। আর রাজনৈতিক দীক্ষা আছে যে মেয়ের, তার শারীরিক সচলতার থেকেও চারিত্রিক সবলতার উপর জোর দিয়েছেন মানিক। 'পথের দাবি'র সুমিত্রা কিংবা 'চার অধ্যায়ে'র এলার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের মেয়ে মানিকের সেইসব নারীচরিত্র। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসের মনোজিনীর কথা—গভীর রাতে তাকে জড়িয়ে ধরে পার্টির এক পুরুষ সহকর্মী যখন তাকে প্রেম নিবেদন করে, তখন সে আবেগে আপ্লুতও হয় না, ভয়ও পায় না, ক্রোধও প্রকাশ করে না, শুধু খুব সহজ গলায় তাকে প্রত্যাখ্যান করে। নারীমুক্তি আন্দোলনে নয়, বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনে শামিল হলেই মানিকের উপন্যাসের মেয়েরা আদৌ আর নিজেদের যৌন-বিষয় হতে দিতে রাজি নয়। 'প্রতিবিম্ব'র মণিমালা তাই বলে : 'আমাদের মেলামেশায় সব কৃত্রিম ব্যবধান ভেঙে দেওয়া হয়, কাজেকর্মে চলাফেরার সময়ে অসময়ে সব অবস্থায় সবসময় সমানভাবে আমরা মেলামেশা করি। ঠিক এইজন্যই বাইরে আমাদের বদনাম রটে কিন্তু আসলে এইজন্যই সমাজের উঁচু থেকে নিচু পর্যন্ত সমস্ত স্তরের চেয়ে আমাদের মধ্যে বিকার কম, অসংযম

কম।...সর্বদা খোঁচা দিয়ে যৌনচেতনাকে জাগিয়ে রাখার সব ব্যবস্থা আমরা বাতিল করে দিয়েছি। তাছাড়া, আমরা সর্বদা কাজে ব্যস্ত থাকি, মস্ত একটা উদ্দেশ্য আছে আমাদের, দুদণ্ড বসে উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবার অবসরও আমাদের জোটে না।'

উর্বশী-লক্ষ্মীর পুরাণ তাই অনুপস্থিত মানিক-সাহিত্যে। তিনি মেয়েদের দেখেছেন জননী বা জায়ার ভূমিকা পালনের নানাবিধ সংকটে-সমস্যায়। তার ভিতরে থেকে তাদের সক্রিয়তায়। কিন্তু 'জননী' উপন্যাসে শ্যামার সক্রিয়তা অন্যজাতের। নিজের সংসার থেকে একপা বাইরে না গিয়েও, শুধু সংসারটাকে ধরে রাখতে, অকুলানকে কুলিয়ে দিতেও মেয়েদের সক্রিয় থাকতে হয়। ভাবাদর্শের আলো ছাড়াই, ভাবাবেগের অন্ধকার ছাড়াই, মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে মেয়েদের অতি সাধারণ অথচ অসাধারণ প্রত্যক্ষতা প্রকাশ পায় তাদের মাতৃত্বে। শ্যামার মতো মেয়ের কাছে মাতৃত্ব নিছক ভূমিকা পালন নয়, মাতৃত্বই তার সৃষ্টি-পরিসর। তার প্রথম মাতৃত্বের অভিজ্ঞতার বর্ণনা পড়ে বিস্ময় লাগে এই ভেবে যে, একজন পুরুষ হয়েও এতটা অথেনটিসিটি দিতে পারলেন কীভাবে এই লেখক : '...এ কি তার ছেলে? এই ছেলে তার? শ্যামা কাঁপিয়াছিল, শ্যামার হইয়াছিল রোমাঞ্চ! স্নেহ নয়, তাহার হৃদয় যেন ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। প্রসবের পর, নাড়ীসংযোগবিচ্ছিন্ন সন্তানের জন্য এ কি কাণ্ড ঘটিতে থাকে মানুষের মধ্যে?'—এর মধ্যে তো কোনো আদর্শবাদিতা নেই,—'তুই আমার ঠাকুরের সনে/ছিলি পূজার সিংহাসনে'—এমন কোনো বড় কথা নেই। এ হলো মেয়েদের যাপনের একান্ত বাস্তব। এই বাস্তবতার বোধ থেকেই উঠে আসে সন্তানের জন্যে মায়ের উৎকণ্ঠার অসাধারণ এক প্রকাশ : 'মেয়ের অসুখের ক'দিন শ্যামা যেন ছিল একটা কামনার রূপক, সন্তানকে সুস্থ করার একটি জ্বলন্ত ইচ্ছা-শিখা—...চৌদ্দ দিনে বকুলের জ্বর ছাড়িয়াছে? কিসের চৌদ্দ দিন—চৌদ্দ যুগ।'

শ্যামা মাতৃত্বকেই তার জীবনের প্রধান সৃজনশীলতার ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করেছিল। সব মেয়ে তা করে না। রাজনৈতিক-অধিকার-সচেতন মেয়েদের মাতৃত্ব সবসময় অভিপ্রেত নয়। 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসের নায়িকা মণিমালা একটি বিগত রাত্রির কথা স্মরণ করে যেন শিউরে ওঠে ভয়ে— 'আবার যদি তাকে মা হতে হয় ওই মানুষটার সন্তানের।' এ জাতীয় ভাবনা শ্যামার কখনো হয়নি— চোর, অসুস্থ, জড়বৎ স্বামীর অন্ধ মেয়ের মা হতে হলেও নয়। কেননা মাতৃত্বেই শ্যামার মুক্তি। কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি মাতৃত্ব বরণ করতে হয়, সচেতন মেয়ের কাছে তা শাস্তির শামিল। 'শহরবাসের ইতিকথা'র সন্ধ্যা তাই বিদ্রূপের স্বরে বলে—'ছেলে হোক মেয়ে হোক একটা ঘুষ দিতেই হবে এবার—নইলে সামলানো যাবে না। টাকায় জব্দ করে আমাদের মা করা, ধিক্ তোমরা পুরুষমানুষ।'

মাতৃত্ব যেমন কোথাও মুক্তি আনে আর কোথাও আনে বন্ধন, মাতৃস্নেহও তেমনি কোথাও-বা বেঁধে রাখে, কোথাও-বা দেয় বিশ্ববিস্তার। 'চিহ্ন' উপন্যাসে খুব সচেতনভাবে মাতৃস্নেহের এই দুটি বিপরীত ছবি প্রতিন্যস্ত হয়েছে। অনুরূপার সর্বনেশে মাতৃস্নেহ নিয়ে আক্ষেপ করে সীতা, সে দেখে এমন মাতৃস্নেহে 'স্নেহ যায় চুলোয়, বড় হয়ে থাকে শুধু বিকারটা।' সেই বিকার থেকেই ছেলের উপর অধিকার খোয়ানোর ভয়ে ছেলের বউকে নির্যাতন করে শাশুড়ি। সীতার মনে পড়ে যমপুকুরের ব্রত, যে ব্রতের মধ্যে যেন রয়ে গেছে—'যুগ যুগ ধরে শাশুড়িরা ছেলের বৌদের যত যন্ত্রণা দিয়েছে তারই বিরুদ্ধে কচি কচি মেয়ের ব্রতের বিদ্রোহ।' অনুরূপার বৈপরীত্যে আছে আমিনা, যার মাতৃস্নেহ সন্তানকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বে, তার মনে হয় 'অজানা অচেনা অসংখ্য ছেলে তার রসুলের সঙ্গে আহত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার বুকের মধ্যে'। রসুলের এক বন্ধুকে দেখে সে ভাবে রসুলের মতোই সে যেন তার চেনা-জানা, 'নিজের বুকের রক্ত ঢেলে মানুষ-করা সন্তান'।

জননী-চরিত্র নিয়ে যেমন, জায়া-চরিত্র নিয়েও তেমনি তাঁর অনুসন্ধিৎসা প্রায় যেন বৈজ্ঞানিকেরই ধরনে। দাম্পত্যকে প্রথমাবধি মানিক বুঝতে চেয়েছেন নানাদিক থেকে, বিশ্লেষণ করেছেন দাম্পত্যের বৈচিত্র্যময় বহুবিধ রূপ। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ নিয়ে এত ভাবছেন, অথচ পাতিব্রত্যের মূল্যবোধ নিয়ে তাঁর কিন্তু কোনো মাথাব্যথাই নেই। আইডিয়া হিসেবে নয়, স্বামীকে মানুষ হিসেবে ভালোবেসেই ঘরকন্না করতে হয় মেয়েদের। আর একসঙ্গে বসবাসের সাধারণ নিয়মেই স্বামীর প্রতি মায়াও জন্মে যায়, সে স্বামী যতবড় পাষণ্ডই হোক। মানিকের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক বলেই তা একপেশে নয় কখনো। 'ছিলাম যন্ত্র, আজ আমি মানবী'—স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যে বলতে পারে, স্বামীর শুভাকাঙ্ক্ষা না করে কিন্তু সে থাকতে পারে না। সে কি মায়ামমতার নাগপাশে বন্দি বলে, না কি আদর্শ পতিব্রতা বলে,—'বৃহত্তর মহত্তর' গল্পে লেখক এই প্রশ্নটিই রাখতে চেয়েছেন। তাঁর প্রথম গল্প 'অতসী মামী'-তে অসাধারণ রোমান্টিক প্রেমঋদ্ধ দাম্পত্যছবি এঁকেছেন মানিক, আবার 'অতসী মামী' গল্পগ্রন্থেরই গল্প 'আগন্তুক'-এর প্রেমহীন দাম্পত্যের রূঢ় উন্মোচন দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর শশীমুখীর স্বামী-সন্নিধান বর্ণনায়। 'প্রেম নয়, উত্তেজনা নয়, ভয়ে তার বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছে। স্বামী যখন আজও কাছে থাকিত কালও কাছে থাকিত, তখনও তার মন যোগাইয়া চলা সহজ ছিল না, রোজই ভালোবাসার পরিচয় দিতে হইত, ঘুমের জন্য মরিয়া গেলেও বলিতে হইত ঘুম পায় নাই, হাত অবশ হইয়া আসিলেও বলিতে হইত আর একটু বাতাস করি'—শশীমুখীর এ অন্তরুক্তি তো শুধু এক শশীমুখীর কথা নয়, শশীমুখীর মতো হাজার গৃহবধুর কথা, যাদের স্বামীরা নির্দেশ করে দেয় কীভাবে তাদের ভালোবাসতে হবে, স্বামীর 'হৃদয়কে নকল করিয়া চলিলেই' তাদের দিন বেশ কেটে যায়। এইখানেই বোধহয় দাসী চাকরানীর থেকে স্ত্রীর যেটুকু পার্থক্য—স্ত্রীকে শুধু যে স্বামীর অধীনতা মেনে নিতে হয় তাই নয়, তার ভালোবাসার খেলাতেও পুতুল বনে যোগ দিতে হয়। এটাই যে পাতিব্রত্যের ঠিক ঠিক রূপ, মানিক তা ভালো করেই বুঝিয়েছেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলির মধ্যে দাম্পত্যই নিঃসন্দেহে জটিলতম, আর সেই কারণেই হয়তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'বৌ' নামে গল্পগ্রন্থটির প্রতিটি গল্পে দাম্পত্য-সম্পর্কের বৈচিত্র্য উন্মোচন করতে চেয়েছেন। মেয়েদের জীবনযাপনের ছোটো ছোটো বাস্তব সমস্যা এমনভাবে এসব গল্পে স্থান পেয়েছে, যা রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের বড়ো পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো অবান্তর বলেই অবহেলিত। দৃষ্টান্ত হিসেবে উদ্ধৃত করা যায় 'কেরানির বৌ' গল্প থেকে : 'সংসারে নারী-সংক্রান্ত নিয়মগুলি এখন সে মোটামুটি বুঝিতে পারে। ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে যে খারাপ হওয়াটাই প্রত্যেক মেয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি : মেয়েদের খারাপ না হওয়াটাই আশ্চর্য। এই আশ্চর্য কাজটা করাই নারী-জীবনের একমাত্র সমস্যা।' একটি কিশোরী মেয়ে পুরুষের হাতে শারীরিক লাঞ্ছনা পেলে দোষ হয় মেয়েটিরই—সমাজের এই বিচিত্র নিয়ম নির্দেশ করেছেন মানিক। যৌনতার রাজনীতি বিষয়ে তাঁর মতো সচেতন লেখক তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে নিতান্তই বিরল। তবু কোনো কোনো গল্প পড়ে মনে প্রশ্ন জাগে, 'তেজী বৌ' সেরকম একটি গল্প। ভাবপ্রবণ বোনেদের থেকে অন্যরকম সেই তেজী মেয়েটির শ্বশুরবাড়িতে মানিয়ে চলতে না-পারাকে লেখক কি সমালোচনাই করছেন না? আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে এই ধরনের তেজী মেয়েদের মহিমান্বিতাই হয়ে উঠতে দেখি, আর মানিকের গল্পে মেয়েটি তেজ হারায় শেষ পর্যন্ত। এ কি তাঁর প্রত্যক্ষণের বাস্তবধর্মিতা, না কি পুরুষশাসিত সমাজের পুরুষ-লেখকের সীমাবদ্ধতা? লেখার স্বরভঙ্গি থেকে দ্বিতীয় উত্তরটিই যেন সঙ্গত বোধ হয়। আজকের কোনো নারীবাদী পাঠক এ গল্পগ্রন্থের শিরোনামগুলির বিষয়েও প্রশ্ন তুলতে পারেন। স্বামীর পরিচয়তেই স্ত্রীর পরিচয় প্রকাশ পায়—এরকম একটি ধারণাই কি ফুটে ওঠে না 'তেজী বৌ' বাদে আর সবক'টি নামের মধ্যেই?

অথচ 'কেরানির বৌ' কিংবা 'পূজারীর বৌ'-এর বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কোনো বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই বহন করে না গল্পের কেরানির বৌ কিংবা পূজারীর বৌ, কেরানি বা পূজারীর বৃত্তিগত পরিচয় নির্দিষ্ট হলেও। 'বৌ'-এর বৃত্তির তো আর কোনো হেরফের ঘটে না, সে বৌ যারই হোক। অবশ্য বৌ হওয়াও যে 'বৌয়ের চাকরিতে ডিউটি করা'—এভাবে ভাবেনি 'বৌ' গল্পগ্রন্থের কোনো নায়িকাই, এ কথাগুলি আছে 'সোনার চেয়ে দামী' উপন্যাসের সাধনার অন্তরুক্তিতে। 'বৌ' গ্রন্থটি প্রকাশ পেয়েছে ১৯৪০ সালে আর 'সোনার চেয়ে দামী'-র প্রকাশকাল ১৯৫১-৫২।

২.

'সোনার চেয়ে দামী' আর 'স্বাধীনতার স্বাদ'—একই সময়ে রচিত এই উপন্যাসদুটিতে আছে ঘরোয়া মধ্যবিত্ত মেয়ের রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে-ওঠার কাহিনী। দুটি উপন্যাসেই নায়িকার রূপান্তর ঘটছে—অসচেতনতা থেকে সচেতনতায়। ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডির ভিতরে নিজস্ব সমস্যার ভার নিয়ে যে বেঁচে আসছিল, গণ্ডি ভেঙে বাইরের নৈর্ব্যক্তিক জীবনের সঙ্গে সে যুক্ত করে নিজেকে, বেঁচে থাকার অর্থ তার কাছে বদলে যায়। মেয়েদের আত্মসচেতনতার অসাধারণ দলিল রয়েছে এ দুটি উপন্যাসে। দেশের সমাজের বড়ো কোনো কাজে যে মেয়ে শামিল হতে পারে, সন্তানপালন তার কাছে আর মুখ্য কর্তব্য থাকে না। সন্তানের ভালো-মন্দ বিচারকে শুধু সাংসারিক স্বার্থের দিক থেকে সে বিচার করে না, তবু মা হিসেবে সে আদৌ ছোটো হয়ে যায় না মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে। তিনি জানেন—শুধু সংসারটুকু যে মায়ের জীবনের ভিত, তার জীবন তো আজকের সমাজে অবলম্বনহীন, কেননা 'সংসারের ভিতটাই ধসে যাচ্ছে' (—'স্বাধীনতার স্বাদ')। এও তিনি জানেন—নৈর্ব্যক্তিক রাজনীতি বিষয়ে যে মেয়ে সচেতন হয়, ব্যক্তিত্ব রাজনীতি বিষয়েও সে অসচেতন থাকতে পারে না। রাষ্ট্রে বা সমাজে ক্ষমতার ব্যাকরণ যে বুঝে নিয়েছে, পরিবারের সীমাতে সেই ক্ষমতাচাপ সে বুঝবে না-ই বা কেন?

নারীমুক্তির প্রশ্ন এ দুটি উপন্যাসে সরাসরিই এসে পড়ে তাই, আসে বাইরের দাবি-দাওয়ার দিক থেকে নয়, ভিতরের চেতনা জাগরণের দিক থেকে। তাঁর উপন্যাসের পুরুষচরিত্র যেভাবে সে-প্রশ্নর মোকাবিলা করে, তার মধ্যে যেন মানিকের রাজনৈতিক দলগত বিবেচনাও কিছুটা থেকে যায়। সমাজতন্ত্রে যাঁদের বিশ্বাস, তাঁরা অনেকেই নারীমুক্তি আন্দোলনকে সমালোচনা করেন 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আখ্যা দিয়ে। 'সোনার চেয়ে দামী' উপন্যাসের নায়ক যেন তাদেরই মত তুলে ধরতে চায়। 'এতকাল নারী-আন্দোলন করে আমরা তবে করলাম কি?'—এ প্রশ্নের উত্তরে সেই নায়ক রাখাল যার নাম, জানায় : 'সারা দেশের মুক্তি-আন্দোলনকে এগিয়ে দিয়েছ। মেয়েপুরুষের আসল স্বাধীনতার লড়াইকে জোরালো করেছ। তবে শুধু মেয়েদের জন্য মেয়েদেরই পৃথক নিজস্ব নারী-আন্দোলন তো নিছক সস্তা শখের ব্যাপার—মেয়েরাও প্রাণের জ্বালায় যাতে আসল বড় আন্দোলনে যোগ দিয়ে না বসে সেজন্য তাদের স্বার্থ ভিন্ন করে নিয়ে একটা বেশ ঝালঝাল টকটক মিষ্টিমধুর আন্দোলনে তাদের মাতিয়ে দেওয়া। পুরুষেরা মেয়েদের দাসী করে রেখেছে, এই বলে মেয়েদের সরিয়ে নিয়ে গিয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করার মানেই হচ্ছে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের মত পুরুষ-রাষ্ট্র নারী-রাষ্ট্র চাওয়া।...পুরুষের বিরুদ্ধে মেয়েদের কোনো লড়াই নেই। সব লড়াই অবস্থা আর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। কোনো দেশে যদি একজন বেকার থাকে, সে দেশে একটি মেয়ের সাধ্য নেই স্বাধীন হয়। সকলের ভাত-কাপড় পাওয়া আর মেয়েদের স্বাধীন হওয়া—

হলে দুটোই একসাথে হবে, নইলে কোনোটাই হবে না।' রাখালের এই কথাগুলি শুধু যে রাখালেরই কথা, তা তো নয়। সমাজতন্ত্রী নারীবাদী ইংরেজ লেখিকা মিশেল ব্যারেট জানান 'By generations of socialists we stand accused of lourgeois, diversionary, individualist refornism'. সেই অভিযোগের সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন তিনি 'Womens Oppression Today' বইটি জুড়ে। রাখালের এই কথাগুলির প্রতিধ্বনি আমাদেরও এখনো চারপাশ থেকে ক্রমাগতই শুনতে হয়, শুনতে হয় মেয়েদের জন্যে মেয়েদেরই পৃথক নিজস্ব নারী-আন্দোলন সস্তা শখের ব্যাপার। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে 'সকলের ভাত-কাপড় পাওয়া' খুবই জরুরি, আর নারীমুক্তির ভাবনার তা আবশ্যিক শর্তও, কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত কখনোই নয়। তাহলে আমেরিকার মতো ধনী দেশে নারীমুক্তি আন্দোলন এত জোরদার হতো না। সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কাঠামোয় নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করে দেয় ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কি পরিবারের কাঠামো থেকেও মুছে যায় পুরুষ-প্রাবল্য? শ্রেণীসংগ্রাম খুবই জরুরি, কিন্তু মহারাষ্ট্রের দলিত আন্দোলনের মতো বর্ণ-সংগ্রামকে কি বলতে পারি 'সস্তা শখের ব্যাপার'—দলিতদের জন্যই দলিতদের পৃথক আন্দোলন বলে? করিমগঞ্জে একসময় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি নিপীড়ন চলছিল, বাঙালি যদি সেই নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তবে কি তাকে বলা হবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন?

তবে তাঁর উপন্যাসের নারীবাদী মেয়েদের চরিত্র-চিত্রায়ণে তাদের ভাবনায় মোটেই কোনো বিচ্ছিন্নবাদের ছবি ফোটাননি মানিক। 'সকলের ভাত-কাপড়'-এর জন্যে চিন্তা না করে তাঁর আত্মসচেতন নায়িকারা কেউ-ই নিছক আত্মমুক্তি নিয়ে ভাবিত হয়নি। তিনি যে আত্মসচেতনতার কথা বলেন, তার শর্তই যে বিশ্বসচেতনতা! কেননা প্রতিটি মানুষের ভিতরের 'আমি' যে প্রতিমুহূর্তেই না-আমির সঙ্গে সংঘর্ষে-সম্পর্কে যুক্ত-বিযুক্ত। দেশের মানুষের সুখদুঃখ ভালোমন্দ সম্বন্ধে অচেতন থেকে কোনো মেয়ে কীভাবেই বা নিজের মুক্তি খুঁজতে চাইতে পারে! মানিকের নায়িকারা বরং তাদের স্বামীদের থেকে অনেক বেশিমাত্রাতেই সমাজ-সচেতন। উপরতলার মানুষের বদমাইশি সাধনা বুঝতে পারে কিন্তু তার স্বামী রাখাল বুঝতে পারে না, তার বুদ্ধিশুদ্ধি জ্ঞানগম্যি বড়ো বড়ো কথা বলার অভ্যাস অনেক বেশি থাকা সত্ত্বেও। 'সোনার চেয়ে দামী' উপন্যাসের এই নায়ক-নায়িকার দাম্পত্য-সংকটের মূলে তো তাই দেখি রাখালের আঘাত-পাওয়া অহং-ই দায়ী, বউয়ের কাছে ছোটো হয়ে যাওয়ার আঘাত! 'স্বাধীনতার স্বাদ'-এর মণিমালা যেভাবে আত্মসমালোচনা করতে পারে, আত্মবিশ্লেষণ করতে পারে, তার স্বামী তার ধারেকাছেও যেতে পারে না। মণিমালা নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বলেই বুঝতে পারে এতদিন সে যে সংসারে প্রভুত্ব খাটিয়ে এসেছে, সে সংসারেও আসলে সে দাসীই, প্রভু তার স্বামী। এর ফলে তার অহং পীড়িত হয় বলেই তার এত অভিমান। ক্রমশ সে ভাবপ্রবণতার বাইরে আসে—দেশের মানুষের স্বাধীনতা-আন্দোলনে শামিল হয়। অথচ তার স্বামী থাকে উলটোপক্ষে, এইখানেই তার দাম্পত্য-সংকট। তার অন্তরুক্তিতে থাকে : 'সুশীল প্রভু আর সে দাসী বলে নয়, দাম্পত্য জীবনে তাদের অনেক মিথ্যা আর অনেক ফাঁকি ছিল বলে নয়,—এখানে এসে শুধু এই দিকটাই তার কাছে বড় হয়ে ওঠেনি, অসহ্য হয়ে ওঠেনি। এখানে এসে জীবনের আরও একটা সত্যও বড় উঠেছে তার কাছে, দেশের ও দশের মুক্তির জন্য যার যেটুকু সাধ্য না করলে সে মানুষ থাকে না, পশু হয়ে যায়! প্রকারান্তরে পোষা পশুর মতই মেনে নেওয়া হয় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর প্রভুত্ব, যার যেটুকু লড়াই সেটুকু যদি সে না করে।...এটা নিছক তাদের দাম্পত্য কলহ নয়, আদর্শের লড়াইও বটে, অথচ ক্রোধে-ঘৃণায় দিশে হারিয়ে সুশীলকে সে শুধু আঘাতই করেছে, দূরে ঠেলে দিয়েছে।' এই অন্তরুক্তির শেষ

বাক্যের 'অথচ' শব্দটির প্রয়োগ একটু ধাঁধা লাগায়। মণিমালা এখানে পশুত্বের যে সংজ্ঞা দেয়, সেই সংজ্ঞা অনুসারে তার স্বামী তো তবে পশুরই শামিল, কেননা সে হাত মিলিয়েছিল দশের উপর উৎপীড়নকারীদের সঙ্গে, তবে কি সে-স্বামীকে ক্রোধে ঘৃণায় দূরে ঠেলে দেওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক নয়, সে যখন আবার প্রভুত্বও ফলায়? আশ্চর্য লাগে, যে মানুষের কোনো উত্তরণ দেখানো হলো না, শুধু সর্বস্বান্ততার খবর শোনানো হলো, সেই স্বামীর কাছেই ব্যাকুল মণিমালাকে পাঠিয়ে দেন লেখক। যে দাম্পত্য-সংকটের মূলে আছে আদর্শের সংঘাত, তার সমাধান হয়ে গেল এতই সহজে? এইখানে কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো পিছুটান কাজ করেনি? যদিচ তাঁরই কলমে স্বামীর উপর মণিমালার রাগ ঘৃণা ব্যক্ত হয়েছে দিনের পর দিন, স্বামী সহবাসের পর তার গ্লানি মূর্ত হয়েছে তীব্র ভাষায়। আশ্চর্য কৌশলে এ উপন্যাসে নৈর্ব্যক্তিক রাজনীতির সঙ্গে ব্যক্তিত্ব রাজনীতির সমান্তরাল টানা হয়েছে বারবার। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় ভূষণের একটি বক্তৃতা শুনে মণিমালার প্রতিক্রিয়ার কথা : ভূষণ যখন বলে যে ফ্যাসিস্ট আইন দেশের মানুষকে দাস করে রাখার অস্ত্র, মণিমালা তখন ভাবে 'তাকে আর তার ছেলেমেয়েকে সুশীলের পায়ের জোরে দাস-দাসী বানিয়ে রাখার চেষ্টাও অনেকটা এইরকম।' এমন স্বামীর সঙ্গেও স্ত্রীর মিলন ঘটানোটাই লেখকের অভিপ্রেত কেন? এইখানেই মনে হয় কোথাও তাঁর একটা দ্বন্দ্ব থেকে গেছে। ব্যক্তিক রাজনীতির ভয়ংকর ছবি মানিক বহু রচনাতেই তুলে ধরেছেন ; দুটি পুরুষ চরিত্রের উক্তি দৃষ্টান্ত হিসেবে রাখা যায় :

(ক) 'দাম্পত্যকলহ নয়, সবিতাকে কাল আমি করেছিলাম শাসন...নিজের ভালোমন্দ মানুষ সবসময় বুঝতে পারে না। বিশেষত মেয়েমানুষ। ভুলত্রুটি দেখিয়ে দিলে, ভুল সংশোধনের জন্য একটু বকলে তাতে ওদের মঙ্গলই হয়।'

—'মিহি ও মোটা কাহিনী'

(খ) 'স্বামীর আগে যে ঘুমাইয়া পড়ে, স্বামীকে যে ঘুম পাড়াইতে জানে না, সে কি মেয়ে-মানুষ, সে কি বৌ?'

—'বৌ'

ব্যক্তিক রাজনীতির ক্ষমতাচাপ মানিক বিলক্ষণ বুঝেছিলেন। প্রথম উদ্ধৃতিটি যে-গল্পের, তাতে আত্মতৃপ্ত স্বামী স্ত্রীকে চটি ছুড়ে মারে আর স্ত্রীকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে হয়। কিন্তু পরিত্রাণের পথ কেন নির্দেশ করেন না মানিক, রাজনীতি-সচেতন হয়েও? কেন 'সোনার চেয়ে দামী' উপন্যাসে বাসন্তীর মুখে তাঁকে বারবার শরৎচন্দ্রের ধরনে কথা বসাতে হয় : 'ওই এক ধুয়া উঠেছে, শুনি, আমরা নাকি দাসী বাঁদী। যতই সুখে রাকুক সোহাগ করুক, আসলে আমরা চাকরানী।...সব নাকি ওনাদের খুশিতে হয়। আমরা কিনা পুতুল, ওনাদের হুকুমে উঠিবসি, খুশি-অখুশি খাটাই না মোটে। এমন ছিষ্টিছাড়া ইস্তিরি তো সংসারে দেখিনি ভাই! সবাই আমরা খুশি খাটাই, কর্তালি করি। আমরা মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের কায়দায় জোর খাটাই!' একথা ঠিক, বাসন্তীর চরিত্রের সঙ্গে কথাগুলো সুসমঞ্জস, এগুলি তারই কথা, লেখকের কথা নয়। কিন্তু বাসন্তীকে তো তার স্রষ্টা কম মূল্য দেননি। সাধনার মতো আত্মসচেতন মেয়ে বাসন্তীর মতামতকে কখনোই অবহেলা করেনি। বরং বাসন্তীর অভিমত তাকে তার স্বামীকে বুঝে নিতে সাহায্যই করেছে। এখানেও কি সেই দ্বিধার প্রশ্নই ওঠে না? সেই দ্বিধার কারণেই কি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা তুলেও শেষ অবধি দূরে সরিয়ে দিলেন লেখক 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসে? অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া মণিমালা স্বাধীনতার স্বাদ পায় কীভাবে?

অন্যদিকে, মানিক সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন মেয়েদের গৃহশ্রমের গুরুত্ব। এ হয়তো তাঁর রাজনৈতিক দলগত বিবেচনার ফল। মার্কসবাদীরা গৃহশ্রমকে পরিশ্রম বলে মনে করেননি, দেখেননি ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের পটান্তরালে গৃহশ্রম কতদূর আবশ্যিক। Wally Secoombe-এর সমালোচনা করেছেন 'The housewife and her labour under capitalism' প্রবন্ধে।[১] 'সোনার চেয়ে দামী' উপন্যাসের নায়ক তার স্ত্রীকে লক্ষ করে বলে : 'আমি রোজগার করি, তুমি ঘরে বসে খাও— এজন্য কিছুটা ফাঁকি থাকবেই আমাদের সম্পর্কে—সব দিক দিয়ে তোমাকে আমার সমান মানুষ আমি কিছুতেই ভাবতে পারব না। সেটা হবে অবাস্তর স্বপ্ন দেখা—নিজেদের ফাঁকি দেওয়া।' স্ত্রী যে বসে বসেই খায় না, সন্তান পালন, রান্না করা আর তার আনুষঙ্গিক নানা জাতের কায়িক পরিশ্রমও যে তাকে করতে হয়—রাখাল সে-বিষয়ে পুরোপুরি অন্ধ। স্বামীর রোজগার যদি স্বামীর একলারই, অর্থাৎ উপার্জনের একক যদি ব্যক্তিই, পরিবার যদি নয়, তবে তো স্ত্রীকেও উপার্জন করতে দিতে হবে যেন-তেন-প্রকারেণ, আর তখন গৃহশ্রমের দায় স্বামীকেও বুঝে নিতে হবে। অথচ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেন লিঙ্গভেদে কর্মভেদ প্রায় প্রকৃতিগতই মনে করেন। এক হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাই তাই যেন জানিয়ে দেয়—শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রয়োজনের কথা। মিশেল ব্যারেট তাঁর আলোচনার শেষের দিকে বলেন : 'The political and ideological processes that contribute so massively to women's oppression must be fought by those affected by them, and there has been little justification for the view that existing programme for socialism will automatically bring about women's liberation.' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সরাসরি নারীমুক্তি প্রসঙ্গ এনেছেন, সেভাবে তাঁর সমসাময়িক অন্য কোনো লেখক আনেননি। এরজন্য আমাদের কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। তবে নারীমুক্তি আন্দোলনকে একটু অকারণ সমালোচনাই করেছেন তিনি বা তাঁর চরিত্র। হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের মতো পৃথক নারীরাষ্ট্র পুরুষরাষ্ট্র কোন নারী-আন্দোলন কবে চেয়েছে? পুরুষের বিরুদ্ধে নয়, অবস্থা আর ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই নারীর আন্দোলন। তবে যুগ যুগ ধরে সেইসব অবস্থা আর ব্যবস্থা পুরুষই রচনা করেছে—মেয়েদের মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার জন্যে, সে-কারণে আপাতদৃষ্টিতে যেন মনে হয় বিদ্রোহটা পুরুষেরই বিরুদ্ধে। মেয়েরা যদি আজ ন্যাকামি আর ভাবপ্রবণতার প্রতীক হয়ে থাকে, তবে তার জন্যে দায়ী তো সেই যুগ যুগ পুরনো অবস্থা আর ব্যবস্থাই। ন্যাকামির ঘোর কাটিয়ে আজকের মেয়েরা রাগী হয়ে উঠেছে—তার প্রাথমিক ঝোঁক পুরুষদের পক্ষে প্রতিকূল হলেও সামগ্রিক মানবতার অনুকূলই, শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে তার কোনো বিরোধিতা নেই, বরং সহযোগিতাই আছে।

১৯৮৭

১. প্রবন্ধটি প্রকাশ হয়েছে New left Review, No. 83, 1974-এ। মিশেল ব্যারেট প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাঁর বইতে।

কুসুম আর কপিলা

'শরীর। শরীর। তোমার মন নাই কুসুম?'—পংক্তিটি 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র সব পাঠকেরই বোধহয় কণ্ঠস্থ। কথাটা কে বলে? শশী, না শশীর স্রষ্টা? 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র কথনভঙ্গির এই এক বৈশিষ্ট্য। উপন্যাসে শশীর দৃষ্টিকোণই প্রধান ; কিন্তু এমন নয় যে, গোটা উপন্যাসে সর্বত্রই সে উপস্থিত। সর্বজ্ঞ লেখক নিজে বরং সর্বত্র উপস্থিত। শশীর ভাবনা তো উত্তমপুরুষে কথিত হয় না কোথাও, তাই শশীর ভাবনা, শশীর দেখার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে শশীকে লেখকের দেখা, যে দেখা প্রায়শই আয়রনি-প্রধান। অর্থাৎ শশীর দৃষ্টিকোণ থেকে উঠে-আসা কথনভঙ্গি একইসঙ্গে শশীর বিশ্লেষণও। এই উপন্যাসে কথনভঙ্গির এই দ্বিস্তর লক্ষ না করলে হয়তো কিছুটা ভুল পাঠ ঘটে যায়।

কুসুমকে প্রধানত দেখা যায় ঘটনা-বর্ণনায়, অর্থাৎ লেখক তাকে দেখেছেন বাইরে থেকে, বর্ণনা করেছেন তার আচরণ শুধু, সর্বজ্ঞ তো তিনি, তবু কিন্তু কুসুমের মনের কথা জানাতে বড়ো একটা রাজি নন। গোটা উপন্যাসে ঠিক-ঠিক মাত্র একবারই লেখক কুসুমকে দেখাতে অন্তর্দৃষ্টির ব্যবহার করেছেন। চাঁদ উঠলে চাঁদের আভাস দেখলে সে শুনতে পায় পূর্ববঙ্গগীতিকার গান—'ভিনদেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন/লাজরক্ত হইলা কন্যার পরথম্ যৌবন।' সেইসঙ্গে তার মন বলে : 'কে সে কিশোরী ভিন্‌দেশী পুরুষ দেখিয়া যার লজ্জাতুর প্রেম জাগিত? সে কুসুম নয়, হে ভগবান, সে কুসুম নয়।' এইরকম ঘুরিয়ে বলা ভাষাতেই তার হৃদয়-উদ্‌ঘাটন, আর তা এই পর্যন্তই। মতিকে দেখাতে গিয়ে তো লেখক বহির্দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টির ব্যবহার সমানভাবেই করেছেন, তাহলে কুসুমের মনের কথা আর কেন শোনা গেল না? তার কি মন নেই নাকি সত্যি?

মন নেই? তাহলে কীসের জ্বালায় এমন ছটফট করে বেড়ায় কুসুম? শুধু শরীরের? কুসুম যেন রবীন্দ্রনাথের দামিনীর উত্তরসূরি—দামিনীর মতোই সংস্কারহীনা, দামিনীর মতোই রহস্যময়ী, দামিনীর মতোই শরীরসর্বস্বতার দায়ে অভিযুক্ত। এদের দুজনকেই দেখা হয়েছে প্রধানত বহির্দৃষ্টি দিয়ে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে একটিই দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত, শ্রীবিলাসের দৃষ্টিকোণ। শ্রীবিলাস শচীশ আর দামিনী—দুজনকেই দেখছে, তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শুধু বহির্দৃষ্টিতে নয়, ধরা পড়েছে তার অন্তর্দৃষ্টিতেও। কুসুমের আচরণগুলি দেখছে যে শশী, তার বোঝার বা না-বোঝার ধরন, প্রতিফলিত করছে তারই আত্মবঞ্চনার স্বরূপ। তাই, লেখকের কথা নয়, শশীরই কথা—'তোমার মন নাই কুসুম?' শশীর দেখা, শশীর জীবনের অন্বেষণ শশীরই।

গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্বের জটিলতা, যা বিশ শতকের মধ্যবিত্ত বাঙালির বিধিলিপি, শশীতে তারই প্রতিচ্ছবি। বাঙালির সেই মধ্যবিত্ততা—বিশ শতকের প্রথমে যা বস্তুত পল্লীমূল, অথচ চায় নগরের ব্যাপ্তি, গোষ্ঠীকেন্দ্রিক যাপনে যা অভ্যস্ত, অথচ খোঁজে ব্যক্তির স্বাধীন নিয়তি। আমাদের নগর আছে, কিন্তু সত্যিকারের নাগরিক মন নেই, আমাদের নগরমুখিতা শুধুই যেন আত্মকেন্দ্রিক স্বাচ্ছন্দ্য-

যাপনের অন্বেষণ। শশীর সেই মধ্যবিত্ততার সমালোচনা এই উপন্যাস। শশীর জীবনভাবনা, তার যাপন, তার সংকটবোধ নিয়ে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসের আখ্যান। তার আত্মবঞ্চনাকে প্রকট করে তোলে কুসুম। কুসুমের প্রয়োজন এইটুকুই।

২.

শশীর গল্পই উপস্থিত এ উপন্যাসে, অনুপস্থিত কুসুমের গল্প। অথচ তবু মনে হয়, কোথায় যেন কুসুম বড়ো হয়ে ওঠে শশীর থেকে। কুসুমের গল্প কিছুই জানতে না পারলেও প্রথম থেকে শেষ অবধি তার নির্বাচনের স্পষ্টতা বিষয়ে পাঠকের দ্বিধা থাকে না কিছু। শশী নির্বাচনকে অবহেলা করেছে, অবশেষে তার হয়ে নির্বাচন করে দিয়েছে অন্যে—তার অর্থ তো আত্মবিলুপ্তি। টিলায় উঠে সূর্যাস্ত দেখার মুহূর্তে একদিন শশী অসীম শূন্যতার সদর্থক ভয় অনুভব করেছিল, অস্তিত্ব-উপলব্ধির যা আরেক দিক। উপন্যাসের শেষে জানা যায়—টিলায় উঠে সূর্যাস্ত সে আর দেখবে না কোনদিন—তার নিজেকে হারিয়ে ফেলার ট্র্যাজেডি সেই প্রতীকেই প্রকাশিত। আর কুসুম? উপন্যাসের শেষে সেও অবশ্য জানায় যে, মরে গেছে সে। কিন্তু তবু তো তার নির্বাচনের ক্ষমতা থাকে—গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার, শশীকে ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সে নিজেই নেয়। 'দিবারাত্রির কাব্য'র আনন্দ যেমন দেহটা অগ্নি-আহুতি দেবার আগেই মরেছিল, কুসুমও তেমন মরার আগে মরেছে। দুর্বার অমলিন এক প্রাণশক্তির প্রকাশ যেমন আনন্দ, কুসুমও তেমনি তার আরেক প্রকাশ। এদের এই মানসমৃত্যুর মধ্যে দিয়েই কি মধ্যবিত্ত পুরুষের অমোঘ ট্র্যাজেডি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন লেখক? মধ্যবিত্ত মূল্যবোধকে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করেছে কুমুদ, তাই কি তার জীবনে ঘটেনি সেই ট্র্যাজেডি? মতি নামে নিতান্ত সাধারণ গ্রাম্য মেয়েটিকেই সে গড়ে নিতে পেরেছে সত্যিকার জীবনসঙ্গী করে?

শশীর গল্পই উপস্থিত এ উপন্যাসে, অনুপস্থিত কুসুমের গল্প। শশী কুসুমকে পাচ্ছে কখন কীভাবে—জানা যাচ্ছে সেইটুকু, কিন্তু কুসুম শশীকে কখন কীভাবে পাচ্ছে—সেকথা জানার সুযোগ ঘটছে অল্পই। একেবারেই যদি না জানা যেত, তাহলে বলা যেত লেখক কুসুমের প্রতি অবিচার করেছেন। সেটা ঠিক নয়। 'দশ বছর খেলা করেও সাধ মেটেনি?'—কুসুমের ঐ কথার 'কোন প্রতিবাদ নাই বলিয়া শশীর মুখে কথা ফোটে না।' খেলার পুরো চেহারাটা আমাদের কাছে ধরা দেয় না ঠিকই, কিন্তু খেলা করার অভিযোগ শুধু যে কুসুমই করে তা নয়, শশী নিজেও বোঝে সে খেলা করেছে : 'চিরকাল এমনভাবে চলিবে না সে জানিত, একদিন ছেলেখেলায় আর কুলাইবে না।...দীর্ঘকাল ধরিয়া কুসুমের প্রতি নিজের অন্যায় ব্যবহার মনে করিয়া শশীর লজ্জাবোধ হইল।' সেই লজ্জাবোধ থেকেই বোধহয় শশী কুসুমকে বোঝাতে যায় তার মনে-মুখে পৃথক হবার কারণ : "এক তো দ্যাখো পরাণ আমার বন্ধু, উপকার করতে গিয়ে চিরকাল ওর শুধু অপকারই করেছি। তবু, তাও আমি গ্রাহ্য করতাম না বৌ।...কিন্তু আমি গাঁয়েই থাকবো না বৌ। আজ বাদে কাল চলে যাব বিদেশে, আর কখনো ফিরব না।'—কেননা শশীর সংস্কার নয়, শশীর বিভ্রান্তিই যে দায়ী তাদের সম্পর্ক-জটিলতার জন্যে—তা খুব স্পষ্ট হয়ে যায় শশীর এই ব্যাখ্যানে। কিন্তু শশী নিজে তা বোঝে না, কোনো 'গভীর অন্তরঙ্গতায়' 'নিবিড় সহানুভূতি'তে যে তাদের বোঝাপড়া শেষ হলো না—তার কারণ ভেবে ভেবে শশীর মনে হয় 'গ্রাম্য মন কুসুমের, কিছু তার বুঝিবার ক্ষমতা নাই।' গ্রাম্যতার দায়ে একবার নয় অবশ্য, বারবারই কুসুমকে অভিযুক্ত করে শশী :

'সভ্য নই। কি গেঁয়ো অভদ্র কথা।'
'যে রমণী কথা বলিয়া চলিয়া গেল গায়ে তার ব্লাউজ নাই,
কেশে নাই সুগন্ধি তেল, তার জন্যে বিবর্ণ মুখে এত কষ্ট পাইতে নাই।
ওর আবেগ তো গেঁয়ো পুকুরের ঢেউ। জগতে সাগর তরঙ্গ আছে।'

শশীর বিভ্রান্ত মানসিকতায় প্রেয়সী নারীর এক 'মহামানবী' প্রতিমা আছে। কুসুমের মতো একজন সামান্য গ্রাম্য মেয়েকে শশী সেই 'মহামানবী'র আসনে বসাতে পারে না, অথচ কুসুমের টানে তাকে গ্রামে পড়ে থাকতে হয়। তাই শশী নিজেকেই ধিক্কার দিয়ে বলে—কুসুমের মতো গ্রাম্য মেয়ের জন্য 'বিবর্ণ মুখে এত কষ্ট পাইতে নাই।'

৩.

শশীর এই দেখার মধ্যেই নিহিত থেকে যায় শশীর সমালোচনা। কেননা কুসুমের স্রষ্টা যে কুসুমের মধ্যে একতিল গ্রাম্যতাও দেননি। গ্রামের পরিবেশে যে বড়ো হয়েছে, সে কুসুমের মতো গ্রাম্যতাহীন কীভাবে হতে পারে—এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্যই করেছেন মানিক। শশীর বিভ্রান্তি স্পষ্ট করে তোলার জন্যেই প্রয়োজন ছিল কুসুমের, যে গ্রাম্য নয়, অথচ যার মধ্যে ভুল নাগরিকতা তথা মধ্যবিত্ততার লেশমাত্র নেই। শশী যদি হয় যেমন-হয়ে-থাকে তেমনি পুরুষ, কুসুম তা হলে যেমন-হওয়া-উচিত তেমনি নারী, অন্তত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে। কুসুম স্বাস্থ্যবতী, গায়ে তার জোর আছে, স্বচ্ছন্দে জলচৌকি তুলে উঠানে পেতে দিতে পারে। শশীর চোখে গ্রামের মানুষ সাধারণত স্বাস্থ্যহীন : রোগে ভুগিয়া, অকারণে মরিয়া ওরা বড় আনন্দে থাকে।...স্বাস্থ্যের সঙ্গে, প্রচুর জীবনীশক্তির সঙ্গে, ওদের জীবনের একান্ত অসামঞ্জস্য।' ওদেরই একজন কুসুম, তার যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি প্রচুর জীবনীশক্তি। কুসুম 'ওদের' মতো 'রুগ্ন অনুভূতির আড়ত'ও নয়। হৃদয়ের কাতরতাকে সে ঢাকতে পারে কথার ঔজ্জ্বল্যে। মনের আবেগকে 'চোখের জলে' স্বীকার করে নিতে কুসুম রাজি নয়। কুসংস্কারহীন স্পষ্টবুদ্ধি তার। যাদবের ইচ্ছামৃত্যুর খবরে গোটা গ্রাম যখন অভিভূত, এমনকি শশীও অল্পবিস্তর, তখন কুসুম অনায়াসে বলতে পারে 'সত্তর বছরের একটা বুড়ো মরবে, তাই নিয়ে দশটা গাঁয়ের লোক হৈহৈ করছে। বেঁচে থাকলে আরও কত দেখব?'—কুসুমের এই স্বাভাবিক বুদ্ধির কথা খোলা হাওয়ার মতো এসে শশীর মনের গুমোট কাটিয়ে দিতে পেরেছে। ধারালো ঝকঝকে কথার সঙ্গে স্নিগ্ধ সরল হাসি নিয়ে কুসুম গ্রামের বুকচাপা মলিন খিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। চাষিঘরের বউ হয়েও কুসুম জানে, সে কারো চেয়ে ছোট নয়, শশীর বাবার পয়সার জোরে সে গ্রামের 'ছোটবাবু', কিন্তু সে পয়সা 'লোকের গলায় ছুরি দেওয়া পয়সা'। তার আত্মসম্মানবোধ প্রখর বলেই যাত্রা দেখতে ইচ্ছে থাকলেও বাবুর বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে বসে তাদের অবজ্ঞা সহ্য করে যাত্রা দেখতে সে রাজি নয়। কুমুদ তাকে 'তুমি' সম্বোধন করায় সঙ্গত ক্রোধ প্রকাশ করে কুসুম। সে যে আদৌ গ্রাম্য নয়, তা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তার সচেতনভাবে ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় পেতে চাওয়ায়। গ্রামের সমাজে বিবাহিতা মেয়েরা নামহীন, তারা হয় কারো বউ, নয় কারো মা। কিন্তু 'পরাণের বৌ' বলে ডাকলে কুসুমের রাগ হয়, শশীর কাছে উপন্যাসের সূচনাতেই এই নিয়ে সে নালিশ জানায়, আর উপন্যাসের শেষে শশীর মুখে 'কুসুম' ডাকটি শুনে তার ইচ্ছা চরিতার্থ হয়।

শশীর কাছে কুসুম ব্যক্তির মূল্য পেতে চেয়েছে—গ্রামীণ সমাজে যা বেখাপ। পরাণের কাছে কুসুম নারী-পুরুষের সমান অধিকার দাবি করেছে (যাত্রা দেখতে যাওয়ার সূত্রে)—গ্রামীণ সমাজে যা বেখাপ। পিতার অর্থগৌরবে কুসুম গরবিনী বলেই হয়তো-বা এত বেখাপ একটি বধূকে সেরকম কোনো পারিবারিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি। শশীর সঙ্গে কলহে না-কলহে কুসুমের যে ব্যক্তিত্ব, যে স্বাধীন সত্তা প্রকাশ পেয়েছে বারবার, তার তুলনীয় চরিত্র উপন্যাসটিতে আরো একটি আছে—সে হলো জয়া। জয়া শিক্ষিত শহুরে সমাজের মেয়ে, আর কুসুম অশিক্ষিত গ্রাম্যসমাজের মেয়ে—পরিবেশের এই পার্থক্যই শুধু তাদের পৃথক করে। দুজনের কারোর মধ্যেই ভাবপ্রবণতার বাষ্পটুকুও নেই। দুটি চরিত্রের মধ্যে যেন বা একটি সমান্তরালও আছে, জয়ার কথায় যা ব্যক্ত, কুসুমের নীরবতায় তারই অব্যক্ত বেদনা। তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসা যে মূলত তার নিজেরই আত্মবঞ্চনা—তা বুঝতে পেরেই জয়ার মন ভাঙে। আর কুসুম যে শশীকে ছেড়ে চলে যায়—সে কি আত্মবঞ্চনা উপলব্ধি করেই নয়?

৪.

কুসুম শশীকে যতটা বোঝে, শশী নিজে নিজেকে যেন ততটা বোঝে না। যেন-বা কুসুম শশীকে চেনাতেও চায় তার নিজেকে—শশীর সাধের গোলাপচারাটিকে নইলে কেনই-বা বারবার পায়ের তলায় মাড়িয়ে দাঁড়ায় কুসুম? সে কি তার রঙিন স্বপ্নবিলাস দলে দেবারই অভিপ্রায় নয়?—অন্তত সেরকমই তো তার প্রতীকী ব্যঞ্জনা। শশী কুসুমকে বলেছিল যে, সে গাঁয়েই থাকবে না, চলে যাবে অনেক দূরে। কিন্তু কুসুমের নিশ্চিত জানা ছিল—শশী গ্রাম ছেড়ে যেতে পারবে না কোনোদিন। এ কথাটা সরাসরি বলা নেই উপন্যাসে, বলা আছে পরোক্ষভাবে : 'আর এক বিষয়ে শশী বিস্মিত হয়। সেদিন সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার কথা বলিয়াছিল! সে সম্বন্ধে কুসুমের কি বলিবার কিছু নাই? কথাটা সে বিশ্বাস করে নাই নাকি?'

না, কুসুম সত্যিই বিশ্বাস করেনি। বিশ্বাস করলে সে নিজে গ্রাম ছাড়তো না। তার গ্রাম ছাড়ার জন্যে শশীই যে দায়ী, প্রকারান্তরে সে কথাই তো জানায় কুসুম তার বাবাকে। শশীর প্রতি কুসুমের মনোভঙ্গির পরিবর্তন হবার একটা বিশেষ বিন্দু আছে। 'সময়ের কাজ না করলে কাজ নষ্ট হয়, বসে গল্প করা পালায় না। তুমিও রইলে আমিও রইলাম—'। শশীর এ কথার উত্তরে কুসুম বলেছিল 'সে তো ন বছর ধরেই আছি। এক আধ দিন নয়।' এই কথা বলেই কুসুম অদৃশ্য হয়ে যায়। 'প্রতি মুহূর্তে কিছু ঘটিবার প্রত্যাশা' আর তার থাকে না। 'তুমিও রইলে আমিও রইলাম'—শশীর এই নিশ্চিন্তি যেন-বা কুসুমকে পুতুল ধরে নিয়েই। এখানেই কুসুমের প্রতিবাদ—'আপনি বুঝি ভেবেছিলেন যেদিন আপনার সুবিধে হবে ডাকবেন, আমি অমনি সুড়সুড় করে আপনার সঙ্গে চলে যাব? কেউ তা যায়?'

এ উপন্যাসে একা কুসুমই যে পুতুল হতে রাজি হয়নি, তা নয়। বিন্দু আর মতিকে নিয়েও তাদের স্বামীরা খেলাই শুরু করেছিল! কুমুদ-মতির সূত্রে 'খেলা' শব্দটির ব্যবহারও আছে—'খানিক অন্যমনস্ক চিন্তা, এক পরিচ্ছেদ বই, দশ মিনিট মতি—এ যেন পালা করা খেলা কুমুদের, বৈচিত্র্য সৃষ্টি।' 'নতুন জীবন নতুন জগৎ, পুতুলের মত কুমুদের হাতে নড়া-চড়া'—এ কল্পনাতেই বালিকা মতির 'ভাবিবার বুঝিবার শক্তি থাকিত না।' তারপর একদিন যে-গাওদিয়ার কথা ভুলে যাবার হুকুম দিয়েছিল কুমুদ, সেই গাওদিয়াতেই মতিকে সে পাঠাতে চায়। গাওদিয়া যাবার সব ব্যবস্থার পর আকস্মিক কৌশলে মতি গাওদিয়া যাওয়া বাতিল করে কুমুদের সঙ্গ নেয়। আর সে তখন

কুমুদের হাতের পুতুল নয়, নিজের নিয়তি সে নিজে নির্বাচন করে নিতে পারে। বিন্দুকে, বিবাহিতা স্ত্রীকে তার স্বামী রক্ষিতায় পরিণত করেছিল—জোর করে অভ্যস্ত করেছিল এক অস্বাভাবিক যাপনে। কিন্তু তারপরে সে ফেরাতেই চেয়েছে, ফেরেনি বিন্দু নিজে।

মেয়েরা পুতুল-খেলা করতে ভালোবাসে, বলা ভালো পুতুল-খেলাকে ভালোবাসতে তাদের শেখানো হয়। পুতুল-খেলা করে শ্রীনাথের মেয়ে, কিংবা সিন্ধু। সিন্ধুকে শশী জিজ্ঞাসা করে : 'খুকী, বড় হয়ে তুই কি করবি?' সিন্ধু উত্তর দেয় : 'পুতুল খেলব।' সেই 'একটিমাত্র জবাবে ক্ষণেকের জন্য শরীর মন 'হালকা হইয়া যায়' কেন? কেন ঠিক সেই সময়ই জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে দেখে কুসুমের মাড়িয়ে দেওয়া গোলাপচারা তার যত্নে মাথা তুলেছে আবার? মেয়েরা পুতুলের সংসারে খুশি থাকলেই কি শশীদের স্বপ্নবিশ্বের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে? কিন্তু খেলার পুতুল নিয়ে খেলার পুতুল হয়ে কতদিনই বা কাটিয়ে যেতে পারে মেয়েরা! পুতুল নাচের পুতুলগুলি এক-এক করে প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদ জানাবে—হয়তো-বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ইঙ্গিতই দিতে চেয়েছিলেন।

৫.

পদ্মানদীর মাঝিদের মতো নিম্নশ্রেণীর কঠোর শ্রমজীবী সমাজে কিন্তু মেয়েদের ছবি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে সমাজের মানুষদের রাগ দুঃখ বাসনা সবই খুব প্রত্যক্ষ, কোনো আত্মপ্রবঞ্চনার প্রয়োজন তাদের নেই। নারীর প্রতি তাদের মনোভঙ্গি কুবের মাঝির ভাষায় খুব নগ্নভাবেই প্রকাশ পায় : 'মাইয়ালোক চুপ মাইরা থাক। পোলা বিয়ানের লাইগা পিরথিমিতে আইছস, বিয়া পোলা যত পারস—রাও করস কেনে?' একথা শুনে রাগ করে, কিন্তু শুধু কুবেরের কথায় না, উপন্যাসের কথকের বর্ণনাতেও থাকে এই সত্যই : 'কচি ছেলে ছাড়া মায়ের কোল খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। নিষ্ঠুর ছাড়া স্বামীও বড়ো একটা হয় না।...নবজাত সন্তানকে তাহারা যেমন পাশবিক তীব্রতার সঙ্গে মমতা করে, বয়স্ক সন্তানের জন্য তাহাদের তেমনি আসে অসভ্য উদাসীনতা।' এই সমাজে কুবেরের স্ত্রী মালা স্বতন্ত্র। পঙ্গু মালার কঠিন শ্রমের ক্ষমতা নেই, তাই তার বহির্জীবন নেই, তাই সে স্নেহমমতা করতে পারে। মালার সেই স্নেহমমতার বর্ণনায় একটি বাক্য চলে আসে : 'আর হ, মালা রূপকথা বলে।' লিখিত ভাষার মধ্যে কথ্য ভাষার এই বিশেষ বাচনভঙ্গি মুক্ত-পরোক্ষ রীতিকে স্পষ্টতা দেয়, এই ধরনের প্রয়োগ উপন্যাসটিতে অল্প নয়।

মুক্তপরোক্ষ রীতির প্রয়োগ 'পুতুলনাচের ইতিকথা'তে পেয়েছি আমরা। সেখানে সে রীতি আয়রনির স্বরকে স্পষ্ট করেছে। কিন্তু 'পদ্মানদীর মাঝি'র কথনভঙ্গিতে আয়রনি অনুপস্থিত। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিষয়ে মানিকের দৃষ্টি কঠোর নির্মম ; সে দৃষ্টি কোমল সহানুভূতিময় হয়ে যায় নিম্নবিত্ত শ্রেণীর দিকে পড়ে যখন। সেখানেও তাঁর দেখা নৈর্ব্যক্তিক ঠিকই, কিন্তু নিরাসক্ত নয়। দৃষ্টির সেই উভবলিতা প্রকাশ পায় কথনের মধ্যে মুক্তপরোক্ষ রীতির ব্যবহারে। বিশেষত আঞ্চলিক ভাষার বিশিষ্ট বাগভঙ্গি 'হ' যুক্ত হয়ে কথনকে করে তোলে বড়ো বেশি আন্তরিক। উপন্যাসের একেবারে শেষ বাক্যটি যেমন : 'হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অতদূরে কুবের পাড়ি দিতে পারিবে না।' অনুচ্ছেদটিতে কুবেরের কণ্ঠস্বর যেমন স্পষ্ট, তেমনি স্পষ্ট কথকের সহানুভূতিও। নাহলে অনুচ্ছেদটি প্রত্যক্ষ উক্তিতেও থাকতে পারতো।

কুবের আর কপিলা একসঙ্গে ময়নাদ্বীপে পাড়ি দেয়। সেই মুহূর্তে কুবেরের উপায় ছিল না তার

পঙ্গু স্ত্রীর কথা ভাবার। হাত-পা বাঁধা তার। কিন্তু কপিলা ভাবতে পারতো তার দিদির কথা, তার স্বামীর কথা। কোনো কিছুই বিবেচনা করে না কপিলা। তার স্বামীর ঘরে সে যে কতদূর পরাধীন, পাঠক দেখেছে তার ছবি। তার পঙ্গু দিদি যে কুবেরের সবটুকু অভাব মেটাতে পারে না, পাঠক দেখেছে তার ছবি। তাই তার দ্বিধা নেই। দ্বিধা ছিল না কুসুমেরও। কুসুম আর কপিলার মিল অনেক। দুজনেই সন্তানহীনা, দুজনেই প্রাণশক্তিতে ভরপুর। তবে কপিলার উচ্ছ্বাস যতটা বল্গাহীন, কুসুমের তেমন নয় ; তার নিজের মতো করে প্রসাধন করে কপিলা, কুসুম প্রসাধন করতে সঙ্কোচ বোধ করে। কপিলা নিজে যতটা এগিয়ে যেতে পারে কুবেরের দিকে কুসুম ততটা পারে না শশীর দিকে এগোতে, কেননা শ্রেণীর ব্যবধান। কপিলা অনায়াসে বারেবারে ধিক্কার দেয় কুবেরকে, 'আরে পুরুষ'—এই পদবন্ধের অনুপম ভঙ্গিতে। কিন্তু কুসুম এমন প্রত্যক্ষ ধিক্কার দেয় না, শশীর প্রতি তার পরোক্ষ সমালোচনা মূর্তি পায় গোলাপচারা মাড়িয়ে দাঁড়াবার মতো ইঙ্গিতময় আচরণের মধ্যে। কুবের আর শশীর মধ্যেকার পার্থক্য অনুসারেই কপিলা আর কুসুম পৃথক হয়ে যায়।

শশী হলো মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোক ; আর কুবের শুধু যে ভদ্রলোক নয় তাই নয়, কুবেরের প্রতিতুলনাতেই ভদ্রলোকের সমালোচনা আরো তীব্রভাবে প্রকাশ করেন মানিক। কুবের মালাকে অকারণে কাঁদায় মেজবাবুর কথা তুলে তার সূত্রে লেখক মন্তব্য করেন : 'এমনি প্রকৃতি পদ্মানদীর মাঝির, ভদ্রলোকের মতো একটানা সংকীর্ণতা নয়, বিরাট বিস্তারিত সংমিশ্রণ।' মেজবাবুর মতো ভদ্রলোকের সঙ্গে এই মাঝিদের দুস্তর ব্যবধান—'দুর্নীতি, দারিদ্র্য, অন্তহীন সরলতার সঙ্গে নিচু স্তরের চালাকি, অবিশ্বাস ও সন্দেহের সঙ্গে একান্ত নির্ভর, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মকে অনায়াসে সহিয়া চলা—এসব যাদের জীবনে একাকার হইয়া আছে, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া যারা ভাবুক কবি, ডাঙায় যারা গরিব ছোটলোক, মেজবাবু কেন তাদের পাত্তা পাইবেন?' হোসেন মিয়া মেজবাবুর থেকে কম বড়লোক নয়, কিন্তু তাকে 'ভদ্রলোক' বলা যায় না, তার 'মাঝিত্ব খসিয়া যায় নাই,' সেই কুবেরের মতো মাঝিদের সঙ্গে সে আত্মীয়তা করতে পারে সহজে, মেজবাবু যা পারেন না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যে-কুবেরের চরিত্রে ভদ্রলোকত্বের বিন্দুবিসর্গ নেই, তার স্ত্রীর আচরণ নিখুঁত ভদ্রমহিলার মতোই মনে হয়, যখন সে রূপকথা বলে। জেলেপাড়ার অন্য মেয়েদের আচরণ সেরকম হোক বা না হোক, দুর্নীতি বা নিচু স্তরের চালাকি কোনো মেয়ের মধ্যেই দেখানো হয়নি। কুবের বলেছে বটে সন্তানের জন্ম দেওয়াটাই একমাত্র কাজ মেয়েদের, কিন্তু এমনকি যুগী বা উলুপীকে দেখেও এ কথা মেনে নেওয়া শক্ত। আর সর্বোপরি আছে কপিলা। কপিলা অবশ্য মাঝিপাড়ার কেউ না, তার বাবার তার স্বামীর চাষবাসই জীবিকা, মাছ ধরা নৌকা বাওয়া নয়। মাঝিপাড়ার যে ছবি লেখক এঁকেছেন, 'টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করিয়া হয়রান হওয়াই যেখানে মানুষের একমাত্র বিধিলিপি', সেখানে কপিলার লীলা কপিলার সেবার মতো উদ্বৃত্ত বস্তু নিছক বেমানান। 'জীবনের স্বাদ' যেখানে 'শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়' সেখানে কপিলা কুবেরকে যা দিতে চায় তা ক্ষুধা বা পিপাসা নিবারণ নয়, কাম বা মমতার থেকে তা জটিল, স্বার্থ বা সংকীর্ণতার নামগন্ধ তার মধ্যে নেই। লেখক অবশ্য খুব সচেতনভাবে দেখিয়েছেন কীভাবে কুবেরের অন্নসমস্যার সমাধান হবার পরই শুধু কপিলার জন্যে, একবার শুধু তার দেখা পাবার জন্যে, এমন আকুল হতে হয় তাকে। কিন্তু কপিলা? তার কোনো সংসার-চিন্তা নেই? তার প্রসাধনের জন্য বেগনি রঙের শাড়ি গায়ে-মাথার হলুদ চুলে-মাথার তেল কে তাকে জোগান দেয়, স্বামী-পরিত্যক্তা কপিলাকে? বাস্তববাদী লেখক এখানে বাস্তবের কঠোরতা কি মুহূর্তের জন্যে বিস্মৃত হয়েছেন, শুধু কি তিনি মনে রেখেছেন

মালার যা নেই, তাই থাকবে কপিলাতে? মালা হাসতে জানে না, তাই কপিলা এমন হাসি হাসে যে সন্ধ্যার অন্ধকারে ভয় পেয়ে যায় কুবের। মালা হাঁটতে জানে না, তাই কপিলা নদীতীর অবধি চলে আসে তামাক দেবার অছিলায়। মালা দাঁড়াতে জানে না, তাই কপিলা 'বাঁশের কঞ্চি'র মতো সোজা হয়ে দাঁড়ায়। মালার 'মাথায় উকুন, গায়ে মাটি, পরনে ছেঁড়া দুর্গন্ধ কাপড়, তাই বুঝি কপিলা 'খুব সাজিয়াছে! চুলে চপচপ করিয়া দিয়াছে নারিকেল তেল, হলুদ মাখিয়া করিয়াছে স্নান, পরিয়াছে তাহার বেগুনে রঙের শাড়িখানা।' তাহলে কুবের আর কী করবে, 'পরের পেট ভরাইতে ফতুর হইতে বসিয়াও গৃহে তাই কুবের আকর্ষণ বাড়ে।' মানুষ যে শ্রেণীতে জন্মাক না কেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণের অতিরিক্ত কিছু তবু থাকে তার মধ্যে, 'ঘুম আসিবার আগেই' তাই 'কপিলা তাহাকে স্বপ্নও আনিয়া দেয়।'

৬.

এই কথাটুকুই কি বলতে চেয়েছেন লেখক? তাই কপিলার প্রয়োজন? আমরা তো সারা উপন্যাসে কপিলার অন্তঃস্বর শুনি না একবারও, শুধু কুবেরেরই অন্তঃস্বর শুনি। কুবেরের চোখে ছাড়া, কুবেরের ভাবনায় ছাড়া কপিলা আর আছে কোথায়? তবে শুধুই কি কুবেরকে অতিরিক্তের ঐশ্বর্য দিতেই কপিলার সৃষ্টি? তা নয় বোধহয়। মনে হয় যুগ যুগ ধরে বাংলার লোককাহিনীতে লোকসংগীতে অবৈধ প্রেমের যে করুণ-মধুর ছবি ধরা পড়েছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ঐতিহ্যকে স্বীকার নিয়েছেন তাঁর লোকজীবনের এই কাহিনীতে। কুসুম-শশীর থেকে কতই না ভিন্ন কপিলা-কুবেরের প্রণয়োপাখ্যান। পুজোর সময় ঠাকুর দেখে ফেরার পথে, আমিনবাড়ির হোটেলে কিংবা দোলের দিন আবিরহীন চুন-হলুদ আর কাদা-মাখামাখিতে কখনোই অপূর্ণ থাকে না কপিলার ইচ্ছা—তাদের এইসব টুকরো ক্ষণিক মিলনদৃশ্যগুলি লেখকের কলমে কতই না অকথিত ইঙ্গিতময়, অনাবিল সৌন্দর্যময়! লোকগাথার আভাস সবচেয়ে প্রত্যক্ষ কপিলার করুণ আক্ষেপে, 'ক্যান মাঝি ক্যান? আমারে ভাব ক্যান? সোয়ামীর ঘরে না গেছি আমি? আমারে ভুইলো মাঝি—পুরুষের পরান পোড়ে কয়দিন? গাঙের জলে নাও ভাসাইয়া দূর দ্যাশে যাইও মাঝি, ভুইলো আমারে।' এই ভাষায়, এই দীর্ঘশ্বাসে কপিলা একাকার হয়ে যায় নদীমাতৃক বাংলার যুগ যুগান্তরের কত না মেয়ের সঙ্গে! কুবের-কপিলার কাহিনী একক নয়, বিচ্ছিন্ন নয়, কোনো বিশেষ গোষ্ঠীরও নয়।

কিন্তু কপিলার আক্ষেপ তো শেষ পর্যন্ত থাকে না। দূর দেশে যায় বটে কুবের, কিন্তু সে তো কপিলাকে নিয়েই। ময়নাদ্বীপের বাস্তবতা নিয়ে সমালোচকেরা সন্দেহ প্রকাশ করেন, হয়তো বা সে সন্দেহ অমূলক নয়। ময়নাদ্বীপ লেখকের ইচ্ছাপূরণ—এমন এক ভবিষ্যৎ মানব-সমাজ, যেখানে মন্দির-মসজিদ নেই, যেখানে শ্রমের কাঠিন্যের সঙ্গে আছে প্রেমের চরিতার্থতা। ইচ্ছাপূরণের সে কল্পজগৎ কুসুমের জন্যে নেই, কপিলার জন্যে আছে। কুসুম মরার আগে মরে, কপিলা স্বপ্নের মধ্যে বাঁচে।

১৯৯৩

ধূর্জটিপ্রসাদ কি নারীবিদ্বেষী ছিলেন?

'জলার্ক'র ধূর্জটিপ্রসাদ সংখ্যায় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একটি আলাপ ছাপা হয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদকে যে নারীবিদ্বেষী বলা হয়, সেটা জানতে পারলাম সেই আলাপে প্রশ্নকর্তার একটি প্রশ্ন দেখে। সেই প্রশ্নটিরই উত্তর খুঁজতে চেয়ে এই আলোচনা।

'অন্তঃশীলা' উপন্যাসটির একটি অসাধারণ সমালোচনা লিখেছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। বাংলা ভাষায় নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনার আদিতম লেখা সম্ভবত এইটিই। সমালোচনার আদালতী ফর্মাটটিও অসাধারণ, আপাতত তার বিবরণ দিচ্ছি না। তার 'বাহাজ' অংশ শুরু-ই হয়েছে এই বাক্য নিয়ে : 'লেখক আধুনিক বঙ্গ মহিলার পক্ষপাতী নন।' পরবর্তী মন্তব্য : 'লেখকের মতে মেয়েরা ভাবেন না, ভাবতে ভালোবাসেন না'। তারপর : 'একেলে মেয়েদের বিরুদ্ধে আর একটা গুরুতর অভিযোগ আছে। তারা নাকি ভালোবাসতে জানে না, শুধু ভালোবাসাতে জানে। তবু ভালো ; সেও তো একটা দুর্লভ ক্ষমতা। অবশ্য মাসিমার মুখে একথা বসিয়েছেন ; কিন্তু লেখক শতমুখ হলেও একমন।' এবং 'বাহাজ' অংশের সর্বশেষ মন্তব্য : 'লেখক যে মেয়ে জাতটাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না, তার একাধিক প্রমাণ উদ্ধার করতে পারতুম, কিন্তু পাড়াকুন্দুলী নাম কেনবার ভয়ে বিরত হলুম।'

ধূর্জটিপ্রসাদ এই সমালোচনার একটা উত্তর দিয়েছিলেন। 'বাহাজের জবাব দিলাম না' বলেও কিন্তু দিয়েছিলেন জবাব : বলেছিলেন, 'খগেনের মেয়েদের প্রতি মনোভাব কেবল সাবিত্রীর প্রতি এবং তার প্রতিক্রিয়াজনিত মনোভাবের নামান্তর। ছেলেরা যখন চটে যায় কারুর উপর তখন বহুবচন ব্যবহার করে। কী আশ্চর্য! অন্য একজন পাঠিকা খগেনবাবুর স্ত্রীজাতির প্রতি আন্তরিক দরদ পর্যন্ত লক্ষ করেছেন।'

অভিযোগ আর উত্তরের মধ্যে কিন্তু বড়ো একটা ফারাক ঘটে গেছে। অভিযোগে খগেনবাবুর নাম নেই, সমালোচক দেখাতে চেয়েছেন লেখকের মনোভঙ্গি! ইন্দিরাদেবী মনে করেন লেখক শতমুখ হলেও একজন। তাই মাসিমার মুখের কথাও তাঁর অভিযোগের অন্তর্গত। এভাবে উপন্যাস পড়া ঠিক কি ভুল সে প্রশ্ন আপাতত মুলতুবী রেখে আমরা দেখতে চাই নারী বিষয়ে লেখকের এবং খগেনবাবুর দুজনেরই মনোভঙ্গি, একই সঙ্গে।

ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন, খগেনবাবুর বিরূপ মনোভাব শুধু সাবিত্রীর প্রতি। সত্যিই কি তাই? সাবিত্রী কি এ উপন্যাসে নিছক একটি ব্যক্তি? ব্যক্তি হিসেবে তার যে পরিচয় উপন্যাসে প্রত্যাশিত, তা কি পাই আমরা? এছাড়া রমলাদেবী বিষয়েও কি বিরূপ কথা নেই? খগেনবাবু যখন বলেন 'রমলা রাতে কিছু খান না, মোটা হবার ভয়ে...বিলেতের মেয়েরা রোগা হচ্ছে, তাই এঁরাও হাড়সার হচ্ছেন'—তখন রমলাদেবীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় না। একথা ঠিক, রমলাদেবীকে তিনি নারীজাতির মধ্যে একটি ব্যতিক্রম ভাবতেন : 'মেয়েরা যেমন—আপনি নন—পরান্নভোজী হয়েও বলে, আমার গাড়ি, আমার বাড়ি...'। কিন্তু ব্যতিক্রম কোন দিক থেকে? খগেনবাবু 'অন্তঃশীলা'য় সাবিত্রীর সঙ্গে যখন রমলাদেবীর তুলনা করেছেন, তখন ঝোঁক দিয়েছেন

চিন্তা না-করা আর করার উপর : 'রমলাদেবীর কথাবার্তা শুনলে মনে হয় না যে তিনি চিন্তা করেন না। সাবিত্রী ভাবতই না, কাজ করতে পারত। কাজ ভালোই করত, অন্তত বাক্স গুছাত ভাল।' কিন্তু রমলাদেবীও তো কাজ করতে পারেন, সাবিত্রীর থেকে ভালোই পারেন। খগেনবাবু জানেন রমলাদেবী আরো ভালো করেই বাক্স গুছিয়েছেন। অর্থাৎ মেয়েরা যদি চিন্তা করতে পারে, তবে সে বুদ্ধিপূর্বক আরো মনোরঞ্জন করতে পারে পুরুষের—মেয়েদের চিন্তাশক্তির অন্য কোনো প্রয়োজন অন্য কোথাও আছে বলে ধূর্জটিপ্রসাদ মানতেন না সম্ভবত। 'অন্তঃশীলা'য় রমলাদেবীর চিন্তা করার পরিচয় আমরা তত পাই না, যত পাই খগেনবাবুকে পরিচর্চা করার কথা। তত সুন্দরভাবে পরিচর্যা সাবিত্রী করতে পারত না সম্ভবত।

অবশ্য সাবিত্রীর কোনো পরিচর্যারই বিশেষ খবর মেলেনি উপন্যাসে। তার স্বভাবটি বোঝানোর জন্যে ধূর্জটিপ্রসাদ তার ঘরের একটি বিবরণ দিয়েছেন—অবশ্যই খগেনবাবুর চোখ দেখছে ঘরখানি। তার ঘরে বই নেই এমন নয়, বই সে যত্ন করেই রাখে, তার ঘরে সাময়িকপত্রও আছে—সে বই হলো প্রভাতকুমারের গ্রন্থাবলী, সে সাময়িকপত্র হলো ভারতবর্ষ, বসুমতী। সবুজপত্রও আছে অবশ্য, আছে সবচেয়ে নীচের তাকে ; খগেনবাবু ভাবেন : 'কিছুতেই সে সবুজপত্র পড়ত না—বলত, ঘরে-বাইরে, বই ত রয়েছে। বুঝতে পারত না বোধহয়। জোহরা-বাই-এর গান শুনে সাবিত্রী হাসতো, তার চোখে জল আসত পান্নার কীর্তন শুনে।' কিন্তু, এইখানে খগেনবাবুর প্রশ্ন—'চোখের জল ফেলাই কি উপভোগের প্রকৃষ্ট পরিচয়?'

এই সঙ্গে, এ প্রশ্ন ধূর্জটিপ্রসাদেরও। এ বিষয়ে তাঁর অন্যত্র বক্তব্য পড়লেই বোঝা যায় সাবিত্রী কেন ব্যক্তিচরিত্র নয়। তাঁর 'চিন্তয়সি' গ্রন্থের 'যোগধর্মের মুক্তি' প্রবন্ধে তিনি বলেন : 'আমি অনুভূতিকে অতি সন্দেহের চোখে দেখি। এর কারণ এই যে, সকল স্ত্রীলোকেরই অনুভূতি আছে। অথচ সকল স্ত্রীলোকের বুদ্ধি থাকে না। তাঁদের নির্বুদ্ধিতার কারণ যদি শিক্ষা-দীক্ষার অভাব হয়, তাহলে তাঁদের না শিক্ষা দিয়ে আমরা ভালই করেছি বলতে হবে—কেননা তাঁদের যখন সহজ অনুভূতি আছে তখন আর কিছুর দরকার নেই—শিক্ষার ফলে বরঞ্চ অনুভূতির এনামেল উঠে যেতে পারে। স্ত্রীলোকের মধ্যে আবার যাঁরা বুদ্ধিমতী তাঁরা অনেকেই ব্যক্তির অসম্পৃক্ত কোনো কাজে বুদ্ধিকে নিয়োজিত করতে পারেন না।'

ধূর্জটিপ্রসাদ এখানে সাধারণভাবে যে মেয়ের কথা বললেন, যে অনুভূতি-সর্বস্ব, তার প্রতিভূ সাবিত্রী। আর বুদ্ধিমতীর দৃষ্টান্ত রমলাদেবী। কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়েটির সমস্ত কাজ, সমস্ত বুদ্ধি শুধু খগেনবাবুকে জড়িয়ে নেবার জন্যেই! ধূর্জটিপ্রসাদের এই মনোভঙ্গি খুব অচেনা নয়, এইটেই পুরুষের স্বাভাবিক মনোভঙ্গি। 'ঝিলিমিলি' নামে ডায়রিতে ধূর্জটিপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন : 'পুরুষ চেতন, পরম, নিরালম্ব, নিরাশ্রয়ী ; স্ত্রী সাম্বন্ধিক।' এই সূত্রে 'কিয়ের্কগার্দ'-এর উদ্ধৃতিও তুলেছেন তিনি : 'It is man's function to be absolute, to act in an absolute fashion or to give expression to the absolute. Women's sphere lies in her relativity.' এই সত্যই কি 'অন্তঃশীলা' 'আবর্ত' পেরিয়ে 'মোহানা'য় গিয়ে প্রমাণ হয় না? যেখানে খগেনবাবু মানুষের জন্যে কাজ করছেন আর রমলাদেবী সাজশয্যা করে অন্য পুরুষের সঙ্গে ফ্লার্ট করে বেড়াচ্ছেন?

খগেনবাবু আর রমলাদেবীর এই যে পরিণতি—এর থেকেই বোঝা যায় কেন ইন্দিরাদেবী ধূর্জটিপ্রসাদকে বলেছেন নারীবিদ্বেষী কিংবা রমলাদেবী খগেনবাবুকে। খগেনবাবু অবশ্য সাফাই গেয়েছেন নিজের : 'আমি স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা করি না, তাঁদের কাজে আমি বেশি প্রত্যাশা করি, পাই না তাই ক্ষোভ হয়। ক্ষোভে রাগ, রাগে ঘৃণা...।'

কীরকম সেই প্রত্যাশা? রমলাদেবী তো চিন্তা করতেন, সেইসঙ্গে সেবা করতেও জানতেন। তবু, 'আবর্তে' পৌঁছে, যখন তাঁরা অবিবাহিত স্বামী-স্ত্রী, তখন একদিন কেনই বা রমলাদেবীর বাহু দেখে খগেনের মনে হল হগ সাহেবের বাজারে ঝোলানো মাংস? কেন তাঁকে বলতে হয় 'পুরো হাতা জামা তোমার নেই?' তবে কি খগেনবাবু শুধু সাবিত্রীকে নয়, রমলাদেবীকেও মানুষ হিসেবে দেখেননি? রমলাই অভিযোগটা তুলেছিলেন : 'আপনি সাবিত্রীকে মানুষ হিসেবে দেখেননি, দেখেছেন আপনার সুখবৃদ্ধির উপায় হিসেবে।' রমলাই অভিযোগটা তোলেন, ধূর্জটিপ্রসাদেরই সৃষ্ট চরিত্র তোলেন অভিযোগ খগেনবাবুর বিরুদ্ধে, তাই এইখানে ধূর্জটিপ্রসাদ খগেনবাবুর থেকে আলাদা হয়ে যান, তাই দেখি খগেনবাবু কোনো যুক্তি না দেখিয়ে উত্তরে বলেন : 'ভীষণ গালাগালি দিচ্ছেন। অত পুরুষবিদ্বেষ আপনার মত স্নেহশীল মহিলার উপযুক্ত নয়।' ধূর্জটিপ্রসাদ জানেন খগেনবাবুর মতো ইনটেলেকচুয়ালের কাছে মেয়েরা শুধুই সুখবৃদ্ধির উপায়, শুধুই কল্পনাবিলাসের উপাদান, সে সাবিত্রী কিংবা রমলা কিংবা মাসিমা—যেই হোন না কেন। ইন্দিরাদেবী রাগ করে বলেছিলেন : 'খগেনবাবুর মতো পুরুষের উপরও মেয়েদের বিশেষ শ্রদ্ধা থাকে না—ভালোবাসা তো দূরের কথা।' ধূর্জটিপ্রসাদ মেনে নিয়েছিলেন, বলেছিলেন : 'খগেনবাবুকে খুব সহজেই ঘৃণা করা যায়। তাকে নিয়ে ঘর করা বোধহয় চলে না, অন্তত সাবিত্রীর চলেনি। রমলার চলবে কি? খগেন চরিত্র হিসেবে কেবল impossible নয়, futile।' তাঁর মতে খগেনের এই স্বভাবের জন্যে দায়ী 'বর্তমান কৃষ্টি।' এইটেই এ বইয়ের সমাজ-সমালোচনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচনা।

সেই 'বর্তমান কৃষ্টি'-তে কি ধূর্জটিপ্রসাদ নিজেও গড়ে ওঠেননি? ধূর্জটিপ্রসাদের এই সমাজ-সমালোচনা অনেকাংশে আত্মসমালোচনাও তাই। আর সেই কারণেই হয়তো ইন্দিরাদেবী খগেনবাবুর বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদকেই দেখেছিলেন। 'অন্তঃশীলা'র খগেনবাবুর মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ দেখাতে চেয়েছেন বুদ্ধিবাদীর ট্র্যাজেডি : 'একধারে নিজের বুদ্ধিগড়া আদর্শ অনুযায়ী স্ত্রীকে তৈরি করা—অন্যধারে সম্বন্ধ ছিন্ন করে আত্মরক্ষার প্রয়াস—অন্তঃশীলার এই হল দোটানা।' কিন্তু 'আবর্তে' এসে দেখতে পাচ্ছি সম্বন্ধ ছিন্ন করা গেল না, কেননা রমলাদেবী বন্ধনে জড়াতে বদ্ধপরিকর—রমণীর মোহতে তৈরি হলো আবর্ত—অর্থাৎ সেই অতি পুরাতন কথা—'নারী নরকের দ্বার'। যে বুদ্ধি, যে পরিচর্যা 'অন্তঃশীলা'-র রমলাতে ছিল, 'আবর্তে' তা আর থাকল না। এ রমলার সবটুকুই যেন নিছক নারীত্ব—তিনি বড় আরশি খোঁজেন মুখ দেখার জন্যে— দেখার জন্যে 'চোখের কোণে চামড়া এখনো মসৃণ রয়েছে কিনা। খগেনবাবুর আশঙ্কা ছিল 'নতুন স্তরে অন্যের সঙ্গে মিলনে রমলা কি বাধা দেবে? যেমন সাবিত্রী দিত?' খগেনবাবুর আশ্বাস ছিল : 'না, রমলা দেবে না, এ রমলা তখন থাকবে না, সে নিজেই অন্য হবে।' কিন্তু 'মোহানা'তে এসে দেখা গেল রমলা অন্য হলো না, অন্যের হয়ে গেল! সেখানে খগেনবাবুর আত্মমুক্তি হয়তো ঘটল, কিন্তু রমলার—অধঃপতনই শুধু পূর্ণ হলো। তিনখণ্ড উপন্যাস জুড়ে খগেনবাবুর দ্বন্দ্ব আর দ্বন্দ্বমুক্তির রূপায়ণ অসাধারণ, বোঝা যায় সেইখানেই রয়েছে উপন্যাসটির তাৎপর্যার্থ—বুদ্ধিবাদী পুরুষের আত্মানুসন্ধান—আর তারই প্রয়োজনে এসেছে সাবিত্রী, এসেছে রমলা, যখন যেরকমভাবে তাদের দেখানো প্রয়োজন, তখন সেরকম ভাবেই দেখানো হয়েছে। 'অন্তঃশীলা'য় সাবিত্রীর বৈপরীত্যে রমলা—অনুভূতির বৈপরীত্যে বুদ্ধি। কিন্তু 'আবর্তে' মাসিমার বৈপরীত্যে রমলা প্রাচীনা বনাম নবীনাই যেন, অশিক্ষিতা বনাম শিক্ষিতাও, যেখানে লেখকের সহানুভূতি প্রবীণা এবং অশিক্ষিতার দিকেই। ইন্দিরাদেবী কেবলমাত্র 'অন্তঃশীলা' পড়েই তো বুঝেছিলেন লেখক 'আধুনিক বঙ্গমহিলার পক্ষপাতী নন', সেকথা আরো বেশি স্পষ্ট হয়, তিনখণ্ডের শেষে পৌঁছে। রমলাকে উল বুনতে দেখে খগেনবাবুর বিরক্তি

আসে : 'অনর্থক এই বোনা আর বোনা, কেবল ফাঁক ভরা, তাও আবার যন্ত্রের মতন, মনের বালাই নেই, অন্যদিকে চেয়ে আঙুল চালাও, মাসীমার মালাজপের মতন, যখন ভ্রূ কুঁচকে ঘর গুনতে হয় তখনকার একাগ্রতা একেবারে যৌগিক।...জর্জেট পরে চোখে সুর্মা টেনে, অনাবশ্যক ফার কোট চাপিয়ে, উঁচু জুতো পরে, মোটর চড়ে সেলাই পার্টি, হঠাৎ-বড়লোক পাঞ্জাবি ভাটিয়া মেয়েরা চুলে সোনালি রূপালি গুঁড়া মাখিয়ে সমবেত হয়েছেন জনসেবায়, আর মেমসাহেবদের মুখ থেকে ডাকনাম শুনে কৃতার্থ হওয়া—সাম্যবোধ!...দিল্লীতে মহিলাদের আচরণ দেখলে রমলা বুঝবে বৈষম্য কারা চিরস্থায়ী করে রেখেছে।' হায়, মনের বালাই ছিল বলেই না রমলাদেবী একদিন খগেনবাবুকে আকর্ষণ করেছিলেন—'মোহানা'র এই বর্ণনার সঙ্গে সেই রমলাকে মেলানো কীভাবে সম্ভব! শুধু খগেনবাবুও নন রমলাকে উপলক্ষ করে নারীজাতিকে গাল দিচ্ছে পার্টি নেতা শফিকও : '...অচল এই মেয়েদের সংশ্রব! বুর্জোয়া মেয়েরা স্বামী ও আত্মীয়স্বজনদের শোষণ করতে পেলে আর কিছু চায় না। তাদের শোষণ পদ্ধতি নিতান্ত মানুষিক, অর্থাৎ দৈহিক, তাই আরো ভয়ঙ্কর। অথচ মুখে সব ফেমিনিস্ট। মিথ্যুক...জন্মগত দাসী মনোভাব, দৈহিক শক্তি, তার অভাবে ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের পূজা।' শফিকের এই অন্তঃসংলাপে 'ফেমিনিস্ট' গালাগালি এতই কানে বাজে! সেই তিরিশের দশকেও বুর্জোয়া মেয়েমাত্রেই ফেমিনিস্ট! সেও আবার কানপুরের মতন শহরে! বোঝাই যায়, এখানে লেখক নিজেই আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছেন। একথা বুঝতে অসুবিধে নেই বুদ্ধিবাদী পুরুষের চৈতন্যতলকেই ধরতে চেয়েছেন লেখক, নারী বিষয়ে তাঁর মাথাব্যথা যতটুকু, ততটুকুই নারীর উপস্থিতি, আর নারীর প্রতি এইসব গালমন্দ—সেও হয়তো বুদ্ধিবাদেরই অঙ্গ, হয়তো এরই মধ্যে জড়িয়ে আছে লেখকের আত্মতিরস্কার। তবু, ধূর্জটিপ্রসাদ আধুনিক বঙ্গমহিলার পক্ষপাতী নন—ইন্দিরাদেবীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে একথা আমাদেরও বলতে ইচ্ছে করে যেন।

কিন্তু, আধুনিক বঙ্গপুরুষেরও কি পক্ষপাতী তিনি? অন্তত তাঁর গল্পগুলি পড়লে এরকম ধারণা হওয়া শক্ত। যে বঙ্গপুরুষেরা রিয়ালিজম নিয়ে বড়াই করে জোর গলায়, তাদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ রয়েছে 'রিয়ালিস্ট' গল্পে : রুগ্না স্ত্রীর মৃত্যু যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার প্রয়াস করছে স্বামী, কেননা 'পুরুষে কিছু সাবিত্রীর স্বজাতি হতে পারে না, গোত্রপরিবর্তন মেয়েদেরই জন্যে।' এই স্বামীর মতে লেডি ম্যাকবেথই এ যুগের আদর্শ মহিলা—অর্থাৎ রিয়ালিস্টের যোগ্য স্ত্রী। লোকে যে কেন সীতা সাবিত্রীর নাম করে! সকলেই বোধহয় চায় প্যানপ্যানে মেয়ে!' এই স্বামীটি আরো বলেন : 'মেয়েরা খুবই চালাক, কিন্তু নিচুস্তরেই তাঁদের চালাকি খাটে, সারা জীবন ধরে এই চালাকি-মাখানো নীচতাকেই লোকে পাতিব্রত্য বলে।' এর মধ্যে কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের ব্যঙ্গবাণ নারীর প্রতি নয়, পুরুষের প্রতিই বর্ষিত হতে দেখি। উপন্যাসের তুলনায় তাঁর গল্পের নারীচরিত্রগুলির প্রতি লেখকের মমতাই বরং প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর 'প্রেমপত্র' গল্পের নায়িকাকে যেভাবে এঁকেছেন তিনি, তার সঙ্গে আবর্ত-মোহানার রমলাদেবীর ধরনটির কোনোই মিল নেই। তাকে গল্পের নায়ক বলে : 'চিরকাল দাসী হয়ে সেবা করবে? তুমি কোন যুগের? এটা বিংশ শতাব্দী, জানো? বিলেতে মেয়েরা সমগ্র স্ত্রীজাতির অধিকারের জন্য জেলে পর্যন্ত যাচ্ছেন জানো? কতবার না বলেছি জেলে পর্যন্ত যেতে হবে তোমাদের?' উত্তরে মেয়েটি বলে, 'দাসীও হব, জেলেও যাব।' মনে হয় এইটেই মেয়েদের কাছ থেকে ধূর্জটিপ্রসাদের প্রার্থিত উত্তর।

কিন্তু আধুনিক মেয়েরা সম্ভবত 'দাসী হব' বলতে রাজি নন, আর তাই 'আমরা ও তাঁহারা'তে 'আমি' বলেন : 'মেয়েরা আমাদের শুধু জীবন-সঙ্গিনী নন, তাঁরা আমাদের জীবন্ত সমস্যা—live problem।' আধুনিক বুদ্ধিজীবী পুরুষ চান স্ত্রী হবেন বুদ্ধিমতী, সেইসঙ্গে হবেন অনুগত, সেটা

তাঁদের মধ্যে পাচ্ছেন না বলেই 'আমি'র জবানিতে শুনি : 'আমি এমন কোনো বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতী পুরুষ ও স্ত্রী দেখিনি যারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সম্পূর্ণ সুখী হয়ে দিন গুজরান করছে।' লক্ষ করতে হবে 'আমরা ও তাঁহারা'র কোনো পক্ষেই কোনো মেয়ে নেই। মেয়েদের দিক থেকেও যে বলার কিছু আছে, ধূর্জটিপ্রসাদ তা ভাবেননি মোটে। আত্মসচেতন পুরুষ আর তার সংকটে নারীর ভূমিকা—এইটেই বুঝতে চেয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ, কিন্তু আত্মসচেতন নারী আর তার সংকটে পুরুষের ভূমিকার অস্তিত্বই তিনি স্বীকার করেননি। 'যোগাযোগ'-এর কুমুর কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, আর ধূর্জটিপ্রসাদ মনে রাখতে বলেছেন—মধুসূদনেরও কিছু বলবার আছে। 'আমরা ও তাঁহারা'র আমি বলেছেন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মোহ কাটাতে হবে, কিন্তু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর মোহও কি কাটাতে বলেন তিনি?—'তাঁহারা'র এ প্রশ্নের উত্তরে 'আমি'র জবাব—'তাঁদের কথা তাঁরা বলুন', কেননা তাঁরা ভিন্ন জাতি, বিবাহে তাঁদের যুদ্ধরীতি ভিন্ন, উদ্দেশ্য পৃথক।

এতটাই ভিন্ন জাতি বুঝি? অথচ 'আমরা ও তাঁহারা'তে এমন কথাও তো আছে : 'মানুষ হিসাবে দেখলে খানিকটা অশান্তি লোপ পায়, অন্তত পেতে পারে, কিন্তু মানুষ হিসাবে দেখবার জন্যে বিস্তর সাধনার প্রয়োজন ; সর্বভূতে নারায়ণ দেখবার সাধনার চেয়েও কষ্টকর।' একথা যিনি বলেন, তিনি কেন বিশ্ববিশ্রুত নারীবিদ্বেষী শোপেনহাওয়ারের মত সমর্থন করেন? 'ঝিলিমিলি'তে লিখছেন ধূর্জটিপ্রসাদ : 'বিশেষ কিছু রূঢ় মন্তব্য বলে তো মনে হয় না। শিশুসন্ততি লালনপালন করা অর্থাৎ জাতির ক্রিয়া তো তাঁদেরই কর্তব্য এবং মোটামুটি বলতে হয় যে, এঁদের বয়স হলেও কথাবার্তায় একটু ছেলেমানুষী। বয়স অনুপাতে যেন তাঁদের প্রবীণতা হয়নি। এক-এক বিষয়ে একজন ভারী পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিমতী। কিন্তু শেষবেশ গড়পড়তা তাঁরা যেন নাবালিকা অর্থাৎ পঞ্চাশ হলেও পঁচিশ।' বিশেষজ্ঞ মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কোন ছোট গণ্ডির মধ্যে ঘটেছে তা জানি না, শুধু এইটুকু বলতে পারি, মেয়েরা যদি ছেলেমানুষী করে, সেও পুরুষেরই চাহিদার জোগান।

কিন্তু সেইসঙ্গে সেই জার্নালে অন্য কথাও আছে : 'মরে গেলে আবার যদি জন্মাতেই হয়, তবে মেয়ে না হয়ে জন্মানোই ভালো। অত কষ্ট, অত অত্যাচার সহ্য হবে না।' নির্যাতিতা মেয়েদের সরাসরি না দেখালেও পরোক্ষভাবে তাঁর গল্পে-উপন্যাসে নির্যাতনের বিবরণ আছে। তাই ধূর্জটিপ্রসাদকে পুরোপুরি নারীবিদ্বেষী বিশ্লেষণ দেওয়া ঠিক নয়, শুধুমাত্র আধুনিকা শিক্ষিতা মেয়েদের প্রতিই ছিল তাঁর বিরাগ, বলা যায়, তারা তাঁর প্রত্যাশা পূরণ করেনি।

১৯৯০

পরশুরামের গল্পের মেয়েরা

একসময় হাস্যরস সৃষ্টির উৎস ছিল ব্যক্তিক বিকৃতি, ব্যক্তিক অসংগতি। আধুনিক যুগে হাস্যরসের প্রকৃতি বদলালো, ব্যক্তি নয়, সামাজিক অসংগতিগুলি নির্দেশিত হতে থাকল হাস্যরসের মাধ্যমে। উনিশ শতকে, সমাজে যখন নানান দিক থেকে পরিবর্তন ঘটছে, তখন সেইসব পরিবর্তন কারো কারো কাছে ছিল অসংগত, তাঁরা সেই অসংগতিকে ব্যঙ্গ করেছেন নানাভাবে। উনিশ শতকের সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে যেহেতু ছিল নারী, তাই অনেক সময়েই নারীই হয়েছে প্রধান লক্ষ্য। স্ত্রীশিক্ষা কিংবা স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে আন্দোলনগুলি কতভাবে যে হাস্যরসের উপকরণ জুগিয়েছে, ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসন পর্যন্ত তার নানান নিদর্শন ছড়িয়ে আছে।

বিশ শতকের বাঙালি সমাজে ক্রমে শিক্ষিত কিংবা অপর্দানশীন মেয়েরা ততটা আর অসংগত রইলেন না ; তাই তখন তাঁরা সেভাবে ব্যঙ্গের লক্ষ্যও নন আর। বলা যায়, সমাজপরিবর্তন-জাত ব্যঙ্গই কমে এলো ধীরে ধীরে বিশ শতকে। প্রাচীনপন্থী আর নবীনপন্থীদের কথা-কাটাকাটি বিরল হলো ক্রমশ। তাই বলে ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজ-সমালোচনার ধরন লুপ্ত হয়ে গেল না মোটেই, বিশেষ করে পরশুরামের মতো তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, কুশলী ব্যঙ্গরসিকের কলম থেকে। পরশুরাম সমাজের তাৎক্ষণিক কোনো অসংগতির দিকে সচরাচর দৃষ্টিপাত করেননি, ব্যতিক্রম যদিও আছে। কিন্তু তাঁর তর্জনী বিশেষভাবে নির্দেশ করতে চায় এমন সব সামাজিক বিচ্যুতি, যা কোনো ছোটো কালপরিধির ব্যাপার নয় নিছক, যা আজকের দিনেও সমান তাৎপর্যময়। সেই ধরনের আক্রমণাত্মক ব্যঙ্গের লক্ষ্য নারী কিন্তু কখনো নয় পরশুরামের রচনায়। এমনকি রবীন্দ্রনাথের লেখায় যে অল্পস্বল্প খোঁচা আছে মেয়েলি স্বভাব বিষয়ে---সেরকম মৃদু খোঁচাটুকুও পরশুরামে অনুপস্থিত। যদিও মেয়েলি স্বভাব বিষয়ে না হলেও, মেয়েলি সাজপোশাক নিয়ে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি তিনি---সেসব ব্যঙ্গ অবশ্য তীক্ষ্ণ নয়, প্রসন্ন।

তীক্ষ্ণ আর প্রসন্ন---কৌতুকরচনার এই দুই ধরন। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গমূলক রচনায় রচয়িতার তিরস্কার প্রকাশ পায়---কোনো ভুলের দিকে অন্যায়ের দিকে, অঙ্গুলিনির্দেশ করেন তিনি---সেখানে রচয়িতার দৃষ্টি কঠিন। অন্য ধরনের রচনায় রচয়িতা শুধু সংসারের কৌতুকোজ্জ্বল কিছু ছবি তুলে ধরতে চান---সেখানে তাঁর দৃষ্টি কোমল। পরশুরামের কলম এই দুই ধরনের রচনাতেই সমান পারদর্শী। প্রথম ধরনের রচনায় ততটা নয়, দ্বিতীয় ধরনের রচনায় যতটা মেয়েদের বৈচিত্র্যময় রূপ হাজির করেছেন পরশুরাম। লক্ষ করার বিষয়, কোনো বিশেষ বয়সের প্রতি তাঁর পক্ষপাত নেই, প্রাচীনা বা নবীনা---উভয় মূর্তিই সমান উজ্জ্বল তাঁর রচনায়, দাম্পত্যে আর পূর্বরাগে---দুইক্ষেত্রেই সমান আকর্ষক।

অবশ্য, কোনো পাঠক বলতে পারেন, প্রাচীনার প্রতি, গৃহিণীর প্রতি তাঁর পক্ষপাত স্পষ্ট---বংশলোচনবাবুর স্ত্রী মানিনী দেবীই তার বিশেষ নিদর্শন। ধনীঘরের গৃহিণী মানিনী দেবী স্বামীর যত্ন করেন, স্বামীর জন্য রান্না করেন এবং কারণে-অকারণে স্বামীর সঙ্গে কলহ করেন ; এছাড়া

আছে পুণ্য অর্জনের জন্যে গুরুভজনা। এই বংশলোচন-মানিনী জুড়ির আরো বয়স্ক রূপ দেখি 'বরনারীবরণ' গল্পে : শ্রেষ্ঠ নারী কে—তার বিচারের জন্যে এক বৃদ্ধের হাতে মালা তুলে দেওয়া হলে, সব বয়সের মেয়েদের দেখেশুনে এসে তিনি তাঁর বৃদ্ধা গৃহিণীর গলাতেই মালা পরিয়ে দেন। এই একটিমাত্র গল্প থেকেই কি স্পষ্ট হয় না—প্রাচীনাদের প্রতি লেখকের বিশেষ পক্ষপাত? কিন্তু এ গল্পের উপহাসের লক্ষ্য সম্ভবত অন্য কিছু : 'সজ্জন-সংগতি'র মতো বড়োলোকি এবং তথাকথিত মডার্ন ক্লাব আর তাদের শৌখিন সংস্কৃতিচর্চাকেই বিদ্রূপ করতে চেয়েছেন এ গল্পে লেখক, দেখাতে চেয়েছেন পশ্চিমী সমাজের অনুকরণ প্রয়াসে বরনারী বরণ আমাদের সমাজে কতটাই অসংগত, বৃদ্ধ বিচারক তাঁর বিবেচনা বুদ্ধি দিয়ে নিজের বৃদ্ধা পত্নীর গলায় মালা দিয়ে সেই অসংগতি দূর করতে চেয়েছেন—এইমাত্র। বিদ্রূপের লক্ষ্য যাই হোক, 'বরনারীবরণ' গল্পে একটি বৃদ্ধা যে মহিমা পেয়েছেন—এইটেই লক্ষ্য করার। সচরাচর সাহিত্যে যৌবন-উত্তীর্ণ নারীকে প্রাধান্য পেতে দেখা যায় না, পরশুরামের গল্প যার ব্যতিক্রম। 'যশোমতী' গল্পের নায়ক-নায়িকা দুজনের দেখা হয় কৈশোরের পর একেবারে বার্ধক্যে, তখন সেই নায়ক চিনে নিতে পারেন নায়িকার অন্য এক রূপ—যা দেহের নয়, আত্মার। 'তিরি চৌধুরী' গল্পেও তিরির ঠাকুমা আর 'মাইট-হ্যাড-বিন ঠাকুমা'—দুই বৃদ্ধাকে হাস্যকোমল পরিস্থিতিতে হাজির করেছেন, তাঁদের সম্মান দিয়েছেন পরশুরাম।

শুধু ঠাকুমারাই নন, তাঁদের নাতনিরাও—তিরি চৌধুরীর মতো সপ্রতিভ বুদ্ধিমতী কমবয়সী মেয়েরাও পরশুরামের গল্পে কম মূল্য পাননি। 'কচি-সংসদে'র পদ্মর কাছে কেষ্টর মতো স্টাইলিস্ট পুরুষ রীতিমতো নাস্তানাবুদ হয়, গল্পের কথক পদ্মর বিষয়ে মন্তব্য করে : 'এই সুশ্রী বুদ্ধিমতী সপ্রতিভ মেয়েটি কেন এই গর্দভের খেয়ালে রাজি হইল? স্ত্রীজাতি বাঁদরনাচ দেখিতে ভালবাসে। পদ্মর উদ্দেশ্য কি শুধু তাই? স্ত্রীচরিত্র বোঝা শক্ত।' 'রাতারাতি' গল্পের কার্তিকও নেড়ির রূপে-গুণে পলকে মুগ্ধ হয়ে যায়। এম. এসসি, পি.এইচ. ডি. সুকান্তকে বোকা বানিয়ে ছাড়ে তার ভাবী বধূ বি. এস.সি. ফেল সুনন্দা। 'জয়হরির জেব্রা' গল্পের বেতসী 'মেমের মতন ব্রীচেস পরে ঘোড়ায় চড়ে তার শ বিঘা ফার্ম পরিদর্শন করে, কর্মচারীদের উপর হুকুম চালায়, শাসনও করে।' এই মেয়েটির দর্প অবশ্য চূর্ণ হয় গল্পের নায়কের কাছে—সেদিক থেকে হার যে তার, কিন্তু সেই হেরে যাওয়া নিয়ে লেখক কোনো বিদ্রূপ করেন না। বিদ্রূপ করেন বরং অহংকারী পুরুষের হেরে-যাওয়া নিয়ে—'দাঁড়কাক' গল্পে। শম্পা আর তমিস্রা—একজন রূপবতী অন্যজন রূপহীনা—দুজনেই প্রত্যাখ্যান করে কাঞ্চনকে, পুরুষ হিসেবে নিজের মূল্য বিষয়ে যে বড়ো বেশি সচেতন। 'দাঁড়কাক' নামে অভিহিতা কালো মেয়ে তমিস্রা অনায়াসে তাকে পরামর্শ দিতে পারে সম্বন্ধ করে বিয়ে করতে, বলতে পারে : 'বেশি যাচাই করবেন না, তবে একটু বোকা-সোকা মেয়ে হলেই ভালো হয়, অন্তত আপনার চাইতে একটু বেশী বোকা, তবেই আপনাকে বরদাস্ত করা তার পক্ষে সহজ হবে।' এই 'তমিস্রা' চরিত্রটি পরশুরামের একটি অসাধারণ সৃষ্টি। এ মেয়ের রূপহীনতা নিয়ে চারপাশের মানুষ হাসাহাসি করে, তাকে 'দাঁড়কাক' কিংবা 'কৌয়াদিদি' নাম দেয়, কিন্তু লেখক এই মেয়েটিকে নিয়ে হাসেননি, রূপহীনতা তাঁর চোখে কোনো অসংগতি নয়। কালো আর শ্রীহীন এই মেয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলে না 'তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে, রূপ না দিলে যদি বিধি হে', বরং, পরশুরাম দেখান, রূপ না থাকলেও তার গুণ আছে আর গুণের অ্যাডমায়ারারও আছে, 'কিন্তু কেউ বেশিদূর এগুতে পারেনি। নিজের রূপ নেই বলে পুরুষ জাতটার ওপর ওর একটা আক্রোশ আছে, খোঁচা দিতে ভালোবাসে।' এই তমিস্রা বিষয়ে কাঞ্চন ডায়রিতে

লেখে : 'পুওর তমিস্রা নাগ, তোমার জন্য আমি রিয়ালি সরি। যেরকম সতৃষ্ণ নয়নে আমাকে দেখছিলে তাতে বুঝেছি তুমি শরাহত হয়েছ। কিন্তু আমার কাছে তোমার কোনও চান্সই নেই, এই সোজা কথাটা তোমার অবিলম্বে বোঝা দরকার, নয়তো বৃথা কষ্ট পাবে।' গল্পের শেষে এই 'হামবড়া' কাঞ্চনকেই তমিস্রার পাণিপ্রার্থী হতে হয়, আর প্রত্যাখ্যাতও হয়। নারীর রূপহীনতা নয়, পুরুষের আত্মশ্লাঘাই এ গল্পে হাস্যরসের জোগান দেয়। পুরুষেরা যে মনে করে, সমাজও মনে করে, পুরুষের চিত্তজয় করাই মেয়েদের একমাত্র কাজ—এই মনে-করাটাই কত অসংগত, এ গল্পে তাই যেন খুলে দেখাতে চান লেখক। তমিস্রা কত অনায়াস অবজ্ঞার স্বরে কাঞ্চনকে বুঝিয়ে দিতে পারে : 'আপনি হচ্ছেন রেসের গোল-পোস্ট, শম্পা আর আমি দুই ঘোড়া। কে আপনাকে দখল করে তাই নিয়ে বাজি চলছে। রাম সেবক বুক-মেকার হয়েছে। প্রথম ক'দিন আমারই দর বেশি ছিল, থ্রী-টু-ওয়ান কৌআদিদি। কিন্তু কাল থেকে শম্পা এগিয়ে চলছে, ফাইভ-টু-ওয়ান সেন-মিসিবাবা। আমার এখন কোনও দর নেই।'

শম্পা আর তমিস্রা দুজনেই চাকরি করে। তমিস্রা কাজ করে নারী-উদ্যোগশালায়, শম্পা মেয়ে-স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। অর্থনৈতিক-স্বাধীনতা আছে, এমন নারীচরিত্র খুব বেশি পাওয়া যাবে না পরশুরামের গল্পে ঠিকই, তাঁর কালসীমায় সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু স্বাধীন এবং একই সঙ্গে বুদ্ধিমতী আর শক্তিমতী যে-কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তিনি, বাংলা গল্পে তার তুলনা বিরল। 'কাশীনাথের জন্মান্তর' গল্পের গয়েশ্বরী চিরকুমারী, বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করেছে, তিনি নারীবস্ত্রশালা পরিচালনা করে রীতিমতো লাভ করেন ব্যবসায়, 'চিকিৎসা-সংকট' গল্পের ডাক্তার মিস বিপুলা মল্লিক গল্পের অন্যান্য পুরুষ চিকিৎসকদের তুলনায় ঢের বেশি বুদ্ধিমতী ডাক্তার। 'উৎকণ্ঠা স্তম্ভ' গল্পের ডক্টর মিস সত্যভামা ব্যানার্জি, পি.এইচ. ডি. চুন্দ্রিগড়ে ফিমেল জেলের সুপারিনটেনডেন্টের কাজ করেন। 'চমৎকুমারী' গল্পের বলবতী ললনা চমৎকুমারী খাপার্দে চাকরি করেন সার্কাসে—বক্রেশ্বর দাসের 'দুমনি-লাশ' তিনি স্বচ্ছন্দে পাঁজাকোলা করে তুলে নিতে পারেন। আহত স্ত্রীকে একজন অনাত্মীয় পুরুষ তুলে নিয়ে এসেছেন বলে রাগে জ্ঞানহারা হয়েছিলেন যে বক্রেশ্বর, তাঁকেই একজন নারীর কোলে চেপে বাড়ি ফিরতে হয়। চমৎকুমারীর মতো শারীরিক বলে নয়, মানসিক বলে বলীয়ান এক অসাধারণ চরিত্র 'গগন চটি' গল্পের আশি বছর পার-হওয়া ভুবনেশ্বরী। ঐ বয়সেও তিনি রীতিমতো সবলা, দ্বিতীয়বার কেদার বদরী ঘুরে এসেছেন, গীতগোবিন্দ, গীতা এবং গীতাঞ্জলি তাঁর কণ্ঠস্থ, তবু লোকে তাঁকে নাস্তিক ভাবে, কেননা হুজুগে তিনি মাতেন না। গগন-চটি নামে দুষ্টগ্রহ পৃথিবী ধ্বংস করতে আসছে বলে সকলেই যখন ভীষণ চিন্তিত, তখন একমাত্র এই বৃদ্ধারই কোনো চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেনি।

এসব চরিত্রের মধ্যে রাজশেখর বসুর মেয়েদের বিষয়ে এক শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভঙ্গি প্রকাশ পায়, একেই হয়তো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন—শিভ্যলরির মনোভঙ্গি। কিন্তু শুধুই শিভ্যলরি নয়। একটু বেশি বয়সে লিখতে শুরু করেছিলেন রাজশেখর—বয়সের প্রসন্নতা থেকেই হয়তো অনেক স্নেহসিক্ত চরিত্রও তিনি সৃষ্টি করেছেন। রাকা ('যশোমতী') কিংবা তিরি ('তিরি চৌধুরী') কিংবা সুনন্দার ('চিঠি বাজি') মতো বুদ্ধিমতী সপ্রতিভ উজ্জ্বল তরুণীদের লেখক বয়স্কের স্নেহদৃষ্টিতেই দেখেছেন! সবচেয়ে বেশি মমতা দিয়ে গড়া চরিত্রটির নাম 'কৃষ্ণকলি' ওরফে 'কেলিন্দী' ('কৃষ্ণকলি') এ মেয়েটি তরুণী নয়, বালিকা ; ধনীও নয়, দরিদ্র, খেটে-খাওয়া ঘরের মেয়ে। পরশুরামের সাহিত্যজগৎ প্রধানত ধনীদের জগৎ—সে জগতে কৃষ্ণকলি খাপছাড়া একটি ব্যতিক্রম। কৃষ্ণকলিও কালো, কালো বলেই 'কৃষ্ণকলি' নামটি অর্জন করেছে আট বছরের কালিন্দী, আট বছর বয়সেই

যে শাশুড়ির কাছ থেকে সতীলক্ষ্মী সার্টিফিকেট আদায় করেছে এবং 'এমন বর পেয়েছে যাকে নির্বিবাদে চিমটি কাটা চলে আর হিড়হিড় করে টেনে আনা যায়'! না, এর মধ্যে বাল্যবিবাহ বিষয়ে কোনো সমালোচনামূলক কটাক্ষ নেই লেখকের—আট বছর বয়সের স্বভাবধর্মের সঙ্গে বধূধর্মের অসংগতিটুকু হাস্যরসের উৎস হলেও।

বয়স কম নয় যে বধূদের, তারা অনেক সময়ই পরশুরামের গল্পে কৌতুরসের জোগানদার হয়েছে, কিন্তু সে কৌতুক স্নিগ্ধ, লেখকের মনোভঙ্গি সেখানে প্রীতিপূর্ণ। মানিনী দেবী এর ভালো দৃষ্টান্ত। আরেকটি দৃষ্টান্ত হলেন 'কচিসংসদ' গল্পের কথক-গৃহিণী। স্বামী ডালহাউসি পাহাড়ে বেড়াতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ইনি বলেন : 'হ্যাঁং, ডালহাউসি। দার্জিলিং চল। আমার ত্রিশ ছড়া পাথরের মালা না কিনলেই নয়, আর চার ডজন ঝাঁটা। আর অত দাম দিয়ে গলায় দেবার শুঁয়োপোকা কেনা হল—সেই যে বোআ নাকি বলে—আর হীরে-বসানো চরকা-ব্রোঞ্জ—তা তো এ পর্যন্ত পরতেই পেলুম না। তোমার সেই ডালকুত্তো পাহাড়ে সেসব দেখবে কে? দার্জিলিং-এ বরঞ্চ কত চেনাশোনা লোকের সঙ্গে দেখা হবে।' মধ্যবিত্ত গৃহবধূর স্বাভাবিক দুর্বলতাগুলিই এখানে হাস্যরসের উপাদান হয়ে উঠেছে। গৃহবধূর দুর্বলতা নয়, সবলতার উজ্জ্বল নজির 'জাবালি' গল্পের হিন্দ্রলিনী কিংবা 'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পের নৃত্যকালী কিংবা 'আনন্দীবাঈ' গল্পের আনন্দীবাঈ। এঁরা সকলেই রীতিমতো অস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত। মৌখিক গালাগালি এঁদের প্রথম অস্ত্র—হিন্দ্রলিনীর ঘৃতাচীর প্রতি সম্ভাষণ 'হলা দগ্ধাননে নির্লজ্জে পেঁচী' মোক্ষম গালাগাল. তবে বাংলায় নাকি তেমন গালাগালির ভাষা নেই যেমন আছে হিন্দিতে, আর তার সব নাকি ভদ্রজনের শ্রোতব্য নয়, ভদ্রনারীর উচ্চার্যও নয়, যেসব ভর্ৎসনা-বাক্য আনন্দীবাঈ প্রয়োগ করেন তাঁর স্বামীর উপর, তিনি আরো দুটি বিবাহ করেছেন জানতে পেরে। 'শড়ক বা কুত্তা', 'ডিরেন কা ছুছুন্দর'—এরকম একটি-দুটি দৃষ্টান্ত হিসেবে শুধু উল্লেখ করেছেন পরশুরাম। কিন্তু শুধু মুখের কথাই নয়, হাতেও এঁদের উঠে আসে প্রহরণ—হিন্দ্রলিনীর সম্মার্জনী ঘৃতাচীর পিঠে ক্ষত করে দেয়, নৃত্যকালীর ঝাঁটার আঘাতে তার স্বামী ক্রোধে ক্ষোভে রাগে ঘর ছাড়ে। আর আনন্দীবাঈ?—বাঘিনীর মতো লাফিয়ে গিয়ে শেঠজীর দুই গালে খামচে দিলেন, তারপর 'বাঁহাত থেকে দশগাছা মোটা মোটা চুড়ি খুলে নিয়ে স্বামীর মস্তক লক্ষ্য করে ঝনঝন শব্দে নিক্ষেপ করলেন।' শেঠজীর অন্য দুই স্ত্রী কিন্তু স্বামীর অন্য বিবাহের খবর শুনে আদৌ কুপিত হননি, কেবল আরো কিছু সম্পত্তি গুছিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। আনন্দীর মার খেয়ে সাতদিন বিছানায় থাকতে হলেও শেঠজীর বুঝতে ভুল হয়নি আনন্দী তাঁকেই চায়, আর তাঁর অন্য দুই স্ত্রী চায় তাঁর টাকা।

আনন্দীবাঈ-এর এই দুই সপত্নী—রাজহংসী আর বলাকার মতো আরো কয়েকটি মেয়ে রয়েছে পরশুরামের গল্পে, যারা প্রেম চায় না, চায় টাকা। 'পরশ পাথর' গল্পের হিন্দোলা প্রিয়তোষকে ত্যাগ করে ধনী গুঞ্জনের কাছ থেকে হীরের আংটি পেয়ে, 'স্বয়ম্বরা'র মেমসাহেব তার দুই পাণিপ্রার্থীর পরিচয় দেবার সময় দশ কোটি ডলারের পরিচয়ই জ্ঞাপন করে, 'রাজমহিষী' গল্পের চকোরী তার প্রেমের উমেদারকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় 'প্রেমে হাবুডুবু খাবার' মেয়ে সে নয়। সে জানে 'টাকাহীন প্রেম আর চাকাহীন গাড়ি দুই-ই অচল, কষ্টের সংসারে ভালবাসা শুকিয়ে যায়'। 'কাশীনাথের জন্মান্তর' গল্পের গয়েশ্বরী কাশীনাথের সঙ্গে বিবাহের কথাবার্তা হওয়ার পর প্রথম আলাপেই জানিয়ে দেয়—বিয়েটা চুকে গেলেই যেন কাশীনাথ তার পাঁচলাখ টাকা তার হাতে দিয়ে দেয়। এইসব বিষয়মনস্ক মেয়েদের খুব প্রীতির চোখে না দেখলেও এদের অর্থলোলুপতা নিয়ে ব্যঙ্গ করেননি পরশুরাম। কেননা এদের মধ্যে কোনো ভণ্ডামি নেই। কিন্তু যেখানে অর্থলোলুপতা মানুষকে ঠকাতে চায়, সেখানে পরশুরামের ব্যঙ্গ ঝলসে ওঠে। ভণ্ড অর্থপিশাচ বহু পুরুষচরিত্র তাঁর গল্পে রয়েছে,

নারীচরিত্র মাত্র একটি 'রাতারাতি' গল্পের জিগীষা দেবী। চাটুয্যে মশাই আর তাঁর দলবল জিগীষা দেবীর কাছে বাণী চাইলে বাণী দেন বটে তিনি, কিন্তু তার মধ্যে টাকার আর্জিটাও ভরে দেন : 'আপাতত এনে দাও আমাকে হাজার দশেক, তাতেই কাজ আরম্ভ হতে পারবে।'

তীব্র বিরূপতা নিয়ে পরশুরাম এই একটিমাত্র নারীচরিত্রই এঁকেছেন। শুধু অর্থলোলুপতা নয়, শুধু স্বামীর প্রতি অশালীন অবজ্ঞা নয়, পরশুরামের বিদ্রূপ এঁর সাজ নিয়েও : 'পাউডারের প্রলেপ ভেদ করিয়া সুগোল মুখের নিবিড় শ্যামকান্তি উঁকি মারিতেছে। কালিদাস যদি দেখিতেন তো লিখিতেন—'খড়িপড়া ছাঁচি কুমড়া ইব'।' ভণ্ডামির প্রয়োজনে যেখানে মেয়েরা প্রসাধন করে, সেখানেই পরশুরামের আঘাত। নিজস্ব গাত্রবর্ণকে কৃত্রিম উপায়ে ঢাকবার প্রয়াস যে মেয়েদের করতে হয়, পরশুরামের বিদ্রূপ তাদের প্রতিই। এই একটি ব্যাপারেই মেয়েদের তিনি কঠিন চোখে দেখেছেন। 'জাবালি' গল্পে ঘৃতাচি 'চিরযৌবনা' বলে আত্মপরিচয় দিলে জাবালি সহাস্যে তার উত্তর দেন : 'হে সুন্দরি, কিছু মনে করিও না। তুমিও নিতান্ত খুকীটি নহ। তোমার মুখের লোধ্ররেণু ভেদ করিয়া কিসের রেখা দেখা যাইতেছে? তোমার চোখের কোলে ও কিসের অন্ধকার? তোমার দন্তপংক্তিতে ও কিসের ফাঁক?' জাবালির এই হাসির মধ্যেই লুকিয়ে আছে পরশুরামের ভর্ৎসনা। 'ধুস্তরী মায়া' গল্পের স্পন্দদৃদাকে দেখে উদ্ধবের বুঝতে বাকি থাকে না তার চামড়ার এক কোটি আস্তরের ওপর তিন পোঁচ পেন্ট চড়ানো—'হবক্স জিঙ্ক, একটু পিউড়ি, আর একটু মেটে সিঁদুর।' 'সিদ্ধিনাথের প্রলাপ' গল্পে সিদ্ধিনাথের বকলমে পরশুরামই দেখিয়ে দেন মেয়েদের প্রসাধনের অসংগতির দিক—গাল তোবড়ানো বুড়ি কিংবা মোটা-কালো যুবতী ঠোঁটে যদি রগরগে লাল রং দেয়, তবে সুন্দর দেখায় না, দেখায় অদ্ভুত। মেয়েদেব গহনাপ্রীতি নিয়েও তির্যক মন্তব্য করেন সিদ্ধিনাথ, তাঁর মতে বর্বর যুগে মেয়েদের উপর যে নির্যাতন হয়েছে, তার চিহ্নই অলংকার হিসেবে মেয়েরা ধারণ করে : 'পূর্বে যা বউ বাঁধবার আংটা কড়া আর বেড়ি ছিল, পবে তা নথ মাকড়ি হার বালা গোট আর মলে পরিবর্তিত হলো।' সালাঙ্করা নমিতা সিদ্ধিনাথের এসব কথায় মোটেই কান দেন না। বোঝা যায়, গহনাপ্রীতি নিয়ে মেয়েদের বড়ো জোর একটু খোঁটা দিতে চান পরশুরাম, তার বেশি বিরূপতা তাঁর নেই। মেযেদের প্রসাধন নিয়েও নিছক ব্যঙ্গের বিরূপতা নয়, কিছু কিছু সরস মন্তব্যও করেছেন পরশুরাম : 'ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক', কিংবা 'হস্তে লীলাকদলি'-র মতো মন্তব্য আজও আমাদের মজলিশে মুখে মুখে ফেরে!

শুধু প্রসাধনের ভণ্ডামিই নয়, মেয়েদের রূপের অহঙ্কারকেও বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছেন পবশুরাম। 'হনুমানের স্বপ্ন'-র চিলিম্পা যদিও বানরী, তবু নারীস্বভাবেরই প্রকাশ তার ব্যবহারে। হনুমান তার পাণিপ্রার্থী হলে সে নিষ্ঠুর অপমানের ভাষায় প্রত্যাখ্যান করে তাকে, তার যথাযোগ্য শাস্তিও তাকে পেতে হয়। চিলিম্পার চুল ধরে হনুমান আকাশে ওঠে, আর সেখান থেকে তাকে নীচে নিক্ষেপ করে সুগ্রীবের কাঁধে। চিলিম্পার তুলনায় 'নির্মোক নৃত্য' গল্পের উর্বশীর শাস্তি অনেক সূক্ষ্ম-জটিল। উর্বশীর ধারণা ছিল সব পুরুষকেই জয় করা হয়ে গেছে তার। তার অহংকার চুরমার করে দিলেন কুতুক ঋষি। দিগম্বর বেশে তিনি উর্বশীর নৃত্যসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন, নির্মোক-নৃত্যের মাধ্যমে উর্বশীকে দিগম্বরী দেখে তাঁর কোনো চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেনি। উর্বশীর শরীর নয়, উর্বশীর নগ্ন নারীসত্তাকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, দেখতে না পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন . 'এই উর্বশী একটা অন্তঃসারশূন্য জন্তু, ছাগদেহের সঙ্গে ওর দেহের প্রভেদ কি?' এই অবমাননার পর উর্বশী মাথা মুড়িয়ে, তুলসীমালা পরে, তিলক পরে হরিভক্ত হয়ে গেলেন! গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতার পংক্তি ব্যবহার করে ব্যঙ্গকে আরো তীব্র করে তুলেছেন।

২.

সব মিলিয়ে তবু বলা চলে, নারীকে প্রসন্ন দৃষ্টিতেই দেখেছেন পরশুরাম। কিন্তু নারীবাদকে? মেয়েদের মুক্তির আন্দোলন কি তাঁর অসংগত বলেই মনে হয়নি? অন্তত 'উলট পুরাণ' গল্পটি পড়লে তো সেরকমই মনে হয়। এ গল্পে হাস্যরসের নির্ভর ব্যক্তিচরিত্র নয়, পরিস্থিতি। ভারতে ইংরেজ রাজত্বের পরিস্থিতিকে উল্টে দিয়ে রচনা করেছেন ইংল্যান্ডে ভারতের রাজত্বের এক কাল্পনিক ছবি। সে ছবিতে ইংরেজের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি যেভাবে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটিয়েছে বারবার, তার অনুকরণে বিপরীত পরিস্থিতিতে ভারতও দাঙ্গা লাগাতে চাইছে ইংল্যান্ডে। কিন্তু সেখানে তো হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নেই, তাই পরশুরাম সেখানে সৃষ্টি করেছেন নারী-পুরুষ কলহজনিত দাঙ্গা, মেয়েদের নারীবাদী আন্দোলন যার মূল। সে আন্দোলনের সভায় মেয়েরা যেভাবে বক্তৃতা দেয়, তা নারীবাদীদের ভালো ক্যারিকেচার : '...আমরা ডিভাইডেড স্কার্ট পরি, ঘাড় ছাঁটি, সিগারেট খাই, ককটেল টানি। এর পর দরকার হয় তো মুখে কবিরাজি কেশতৈল মাখিয়া গোঁফ-দাড়ি গজাইব।...আমরা হি-গড মানিব না। আইসিস, ডায়না, কালী অথবা শূর্পণখা—এঁদের দ্বারাই আমাদের কাজ চলিবে।' উলট-পুরাণ পড়লে পরশুরামকে নারীবাদের চূড়ান্ত পরিপন্থীই মনে হয়।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? পশ্চিমের নারীবাদ বিষয়ে তাঁর মনোভাব বিরূপ যদি-বা হয়, প্রত্যক্ষত হয়তো সেটাই সত্যি, কিন্তু পরোক্ষভাবে তাঁকে কি নারীবাদের একজন প্রধান প্রবক্তাই বলতে পারি না? বিজ্ঞাননিষ্ঠ বাস্তবতার বোধ দিয়ে সমাজের অসংগতিগুলি ধরতে চাইছেন যিনি, তাঁর চোখে তো নারী-পুরুষের অবস্থানগত অসংগতিগুলি ধরা পড়বারই কথা। ধরা পড়েছেও। কোনো কোনো গল্পে কেবলমাত্র মন্তব্যের মাধ্যমে এই অসংগতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, একটি-দুটি গল্পে আখ্যানের ভিতর দিয়েই তীব্র শ্লেষ প্রকাশিত। 'যশোমতী' গল্পের পুরন্দর নারী-পুরুষ বিষয়ে সমাজদৃষ্টির একটি অসংগতি নির্দেশ করেন :'মেয়েদের বলা হয় সীতা সাবিত্রী হৈমবতীর মতন সতী হও, কিন্তু পুরুষদের কেউ বলে না—রামচন্দ্রের মতন একনিষ্ঠ হও।' এ গল্পে শুধু এই মন্তব্যটুকুই মেলে, কিন্তু 'গুলবুলিস্তান'-এর মতো গল্প দাঁড়িয়েই রয়েছে এরকম একটি অসংগতির উপর। এ গল্পে বলা হয়েছে আরব্য উপন্যাসের কোনো কল্পিত পুঁথির গল্প এটি, গল্পের শুরুতে আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর চুম্বকটুকু বলে নিয়েছেন লেখক—পারস্য দেশের রাজা শাহরিয়ার আর তাঁর ভাই শাহজামান একদিন আবিষ্কার করেন তাঁদের বেগম সহ অন্তঃপুরের সব নারীই ভ্রষ্টা। তাই সকলের মাথা কেটে ফেলেন তাঁরা। অসতী-সংসর্গ থেকে বাঁচবার জন্যে প্রতিদিন তাঁরা বিবাহ করতেন এবং রাত্রিশেষে তাদের গর্দান নিতেন। প্রাণে বাঁচবার জন্য একটি মেয়ে বিবাহরাত্রে গল্প বলতে শুরু করেন, ফলে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, এইভাবে রাতের পর রাত গল্প বলে চলেন সেই কন্যা, তারই সমষ্টি আরব্য উপন্যাস। সেই কন্যা এবং তার বোনকে দুই ভাই বিবাহ করেন। এরপরই পরশুরামের গল্প। সে গল্পে এই কন্যারা তাদের স্বামীদের গুলবুলিস্তানে প্রেরণ করেন, সেখানকার সুন্দরী দুই শাহজাদীর লোভ দেখিয়ে। এই শাহজাদীরা ভীষণ সুন্দরী এবং ভীষণ সতী। স্ত্রীদের পরামর্শে শাহরিয়াররা দুই ভাই গুলবুলিস্তানে গিয়ে সেই দুই শাহজাদীকে বিবাহ করেন। কিন্তু তার আগে তাঁদের পত্নীদের তালাক দিতে হয়, কেননা গুলবুলিস্তানের নীতিশাস্ত্র অনুসারে পুরুষের এককালে একাধিক স্ত্রী আর স্ত্রীর একাধিক স্বামী নিষিদ্ধ। পরশুরাম এই কল্পরাজ্যের বিধানের মধ্যে দিয়েই যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চান—আমাদের তথাকথিত নীতিশাস্ত্রের অসংগতি কোথায়! কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। সে দেশের সব মেয়েই অসাধারণ সুন্দরী, তাই সখীদেরও দখল করতে চাইলেন শাহরিয়াররা, আর তখনই শুনতে পেলেন : 'আমাদের সখী

বাঁদী ঝাড়ুদারনী বা অন্য কোনও স্ত্রীলোকের দিকে যদি কুদৃষ্টি দাও তো তোমার গর্দান যাবে।' সভয়ে এঁরা দেখলেন 'গর্দান-মহলে' ঝুলন্ত সারি সারি পুরুষ-মুণ্ড! আশ্চর্য এই যে, এঁরা তখন দয়ামায়ার দোহাই দিলেন, তাঁদের মনেও পড়ল না শত শত নারীকে বিনা দোষে হত্যা করেছেন তাঁরা। 'তোমরা যেমন কুলটা স্ত্রীকে দণ্ড দাও, আমরা তেমনি লম্পট স্বামীকে দিই'—গুলবুলিস্তানের এই নিয়মই তো সংগত, নারী-পুরুষ তো মানুষেরই লিঙ্গভেদমাত্র, নীতিনিয়ম তো দুয়ের ক্ষেত্রে একরকমই হবার কথা—কিন্তু একরকম যে হয় না, পরশুরাম গুলবুলিস্তানের কল্পনা করে সেই অসংগতির দিকে তর্জনী তুলেছেন। 'উলট পুরাণ'-এর মতো এ গল্পেও পরিস্থিতি উল্টে দিয়ে অসংগতিকে প্রত্যক্ষ করে তোলা হয়েছে।

'কর্দমমেখলা' গল্পে পুরাণ-কাহিনীর রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে আরেকরকম বিপরীত পরিস্থিতি রচনা করেছেন পরশুরাম। লম্পট পুরুষের দায় বহন করতে হয় মেয়েদের, পুরুষ থাকে মুক্ত। আর তাই সহজেই পুরুষ পারে মেয়েদের ইচ্ছামত গ্রহণ করতে, আব সাধ মিটে গেলে ত্যাগ করতে। কিন্তু যদি পুরুষকেও দায় বহন করতে হয়, তবে কি পুরুষ বুঝবে তার কৃতকর্মের স্বরূপ কী? নারীর প্রতি পুরুষের অপব্যবহারকে এরকম কল্পকাহিনী রচনা করেই তিরস্কার করতে চেয়েছেন পরশুবাম। কর্দমমেখলার কাহিনী বিশ্বামিত্র আর মেনকার গল্প। মেনকাকে দেখেই সংযম হারিয়ে তপস্যায় জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন বিশ্বামিত্র। মেনকা অপ্সরার কর্তব্য পালন করেছিলেন মাত্র, বিশ্বামিত্রের কুৎসিত জটাশ্মশ্রু আর লোমশ বক্ষের স্পর্শ, উৎকট শার্দূলগন্ধ সবকিছুই তাঁকে ঘৃণা দমন করে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু ছমাস পরেই বিশ্বামিত্রর মোহ অপগত হল, মেনকাকে চলে যেতে বললেন তিনি। মেনকার গর্ভস্থ সন্তানের কোনো দায়িত্ব নিতেও তিনি অস্বীকার করলেন। এ কাহিনী তো নিছক বিশ্বামিত্র-মেনকার নয়, সংসারে হাজার নারী এইভাবে গর্ভস্থ সন্তান সহ পরিত্যক্ত হয়েছে, পুরুষের ক্ষণিক মোহ ফুরিয়ে গেছে বলে। সেই সমস্ত পরিত্যক্ত জননীদের হয়ে পরশুরামের কল্পনার মেনকা অভিশাপ দিলেন বিশ্বামিত্রকে—ভার তিনি একাই কেন বহন করবেন, বিশ্বামিত্রও করুন, তাই কাদার তাল লম্বা করে বিশ্বামিত্রের প্রতি নিক্ষেপ করলেন মেনকা, আর বিশ্বামিত্রের কটিদেশে মেখলার মতো জড়িয়ে গেল সেটা, শত প্রয়াসেও বিশ্বামিত্র তার থেকে মুক্ত হতে পারলেন না। কর্দমমেখলার ভার নিয়ে বিশ্বামিত্র তপস্যাতেও মন বসাতে পারলেন না। সাড়ে পাঁচবছর পর কন্যা শকুন্তলাকে কোলে নিলে তবে সেই কর্দমমেখলার দায় থেকে মুক্ত হলেন তিনি। পুরুষপেষণকে তীব্রভাবে তিরস্কার করেছেন তিনি আরো একটি গল্পে। 'ষষ্ঠীর কৃপা' নামে গল্পটিতে 'দক্ষিণ রায়' গল্পর মতো মানুষকে শাস্তি দিয়েছে মনুষ্যেতর প্রাণী। এ গল্পের গোকুলবাবুর প্রথমা পত্নীর তিনটি ছেলে, তাদের ত্যাগ করে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন সুকুমারীকে ; ছ'বছরে সে সাতবার গর্ভবতী হয়, যদিও শেষটি ছাড়া আর একটিও বাঁচেনি। তার শরীর ভেঙে যাওয়ায় সুকুমারী স্বামীর কাছে জন্মনিয়ন্ত্রণের নিয়ম জানতে চায়, উত্তরে স্বামী জানান : 'গর্ভধারণ হচ্ছে স্ত্রীজাতির বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্য। ভগবানের এই বিধানের ওপর হাত চালাতে চাও?' অসুস্থ স্ত্রীকে ফেলে স্বামী দেশভ্রমণে গেলে সুকুমারীর মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। তার সন্তানের ভার নিতে আসে নারীবেশে ষষ্ঠী ঠাকুরুণের মেনি বেড়াল। গোকুলবাবু বাড়ি ফিরে স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদে একটু কেঁদে মেনকারূপী মেনিকে তৎক্ষণাৎ বিয়ে করতে চান। বিয়েও হয়। কিন্তু মেনি রাত্রে নিজমূর্তিতে নিজের শাবকদের দুধ খাওয়াতে যেত। স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করে গোকুলবাবু মেনির পিছু নিয়ে দেখেন সব ব্যাপার, দেখার সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠীঠাকরুণের ব্যবস্থা অনুসারে তিনি নিজেও হয়ে যান হুলো বেড়াল! মনুষ্য সমাজে পুরুষের যতই হম্বিতম্বি হোক, বিড়াল সমাজে হুলোর কোনো প্রতিপত্তি

নেই ; মেনি হরেকরকম পতির ঔরসে হরেকরকম অপত্য লাভ করেছে। গোকুলবাবুর গর্জনতর্জন সে নস্যাৎ করে দেয় এই বলে : 'আমাদের হল মাতৃতন্ত্র সমাজ, যাকে বলে ম্যাট্রিয়ার্কি। আমাদের সংসারে মদ্দাদের সর্দারি চলে না, তারা একেবারে উটকো, শুধু ক্ষণেকের সাথী।' মেনির নানান ধরনের ছেলেপিলেরা এসে হুলোবেশি গোকুলবাবুকে প্রবল মার দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু যতই হোক, মেনি মেয়েমানুষ, পুরুষের মতো দয়ামায়াহীন নয়। তাই সে যখন গোকুলবাবুর প্রথমা স্ত্রীর হাতে সংসার দিয়ে চলে যায়, তখন তাকে অনুরোধ করে যায় বুড়ো হুলো বেড়ালকে যেন কিছু খেতে দেওয়া হয় রোজ।

এতটা তীব্র এবং তিক্ত ব্যঙ্গ নয়, কিছুটা হালকা পরিহাসের স্বরে পরশুরাম নারী-পুরুষ বৈষম্যজনিত অসংগতির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কোনো কোনো গল্পে। 'দ্বান্দ্বিক কবিতা' গল্পের ধূর্জটি বিখ্যাত কবি, তার বিবাহিতা প্রিয়া সন্তান আর সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আর সে চুটিয়ে কবিতা লেখে কাল্পনিক মানসপ্রিয়ার উদ্দেশে। শঙ্করী, তার স্ত্রী, শোধ নেবার জন্যে মনগড়া পুরুষের উদ্দেশে গরম গরম কবিতা লিখতে শুরু করে। শঙ্করীর খুব নাম হতে থাকে। ধূর্জটি তার কবিতা পড়ে হুকুম দেয় কবিতা লেখা চলবে না। 'তুমি লিখলে দোষ হয় না, আমার বেলা দোষ।'—স্ত্রীর একথার উত্তরে স্বামী স্পষ্ট ভাষায় জানায় : 'আমার সঙ্গে তোমার তুলনা! কাল্পনিক রমণীর ওপর কবিতা লিখলে পুরুষের দোষ হয় না, কিন্তু মেয়েদের সেরকম লেখা অতি গর্হিত।' 'রামধনের বৈরাগ্য' গল্পের নায়ক রামধন সাহিত্যিক। একদা তাঁর ইচ্ছা হল অভিনব কিছু করতে। ঠিক করলেন স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য কাকে বলে দেখিয়ে দেবেন। রামধনের নতুন গল্পে একজন নারী তিনজনের সঙ্গে একইসঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে চায়। তার প্রণয়ীদের তাতে ঘোর আপত্তি। একজন বলে : 'স্ত্রীলোক সপত্নীর ঘর করতে পারে, কিন্তু পুরুষ সপতি বরদাস্ত করবে না, খুনোখুনি হবে।' কিন্তু সে গল্প তাঁর লেখা হয়নি। তাঁর চরিত্রগুলিই তাঁকে এমন মার দেয় যে, তিনি লেখাই ছেড়ে দেন। এ গল্পের সবটাই বিশুদ্ধ পরিহাস। তবু মনে হয়, বহুবিবাহের বিরোধিতা করার এ এক অভিনব পন্থা পরশুরামের।

ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে পরশুরামের তুলনা করে প্রমথনাথ বিশী লিখেছিলেন : 'ত্রৈলোক্যনাথ আছেন প্রচ্ছন্ন অশ্রুর দিকে ঘেঁষে, আর পরশুরাম আছেন প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের দিকে ঘেঁষে।' তাঁর সে তিরস্কারের কিছু অংশ যে মেয়েদের হয়ে পুরুষকে তিরস্কার, তার জন্যে আজও মেয়েদের কাছে পরশুরাম কৃতজ্ঞতার দাবি রাখতে পারেন।

১৯৯৫

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'-র গল্পর একটি মেয়েলি পাঠ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র গল্পসমগ্রের একটি সুন্দর ভূমিকা লিখেছেন হায়াৎ মামুদ। তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য খুব ঠিক ঠিক ভাবেই লিখেছেন তিনি : 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র মনের প্রবণতা ছিল, আমার ধারণায়, দার্শনিকের।' এও তো তিনি উল্লেখ করতে ভোলেননি যে, তাঁর চরিত্রগুলির মনে 'যে-প্রশ্নাবলি উত্থিত হয়,...সে-সব জীবনজিজ্ঞাসা এত নান্দনিক, সাত্ত্বিক ও মেধাবী যে, নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত মানুষের তা বোধশক্তির বাইরে রয়ে যাওয়ার কথা ; ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীর ভিতরে গোপন সম্পর্কসূত্র বস্তুতপক্ষে তাঁরা খোঁজেন না, খোঁজেন শিল্পী নিজে।' আরেকভাবে বলা চলে, তাঁর গল্পগুলিতে বহু বিচিত্র চরিত্র রয়েছে, কিন্তু বহু বিচিত্র স্বর নেই। না থাকুক, যদি একটিই স্বর থাকে আর সে স্বর স্বয়ং লেখকের হয়, তার সঙ্গে পাঠক নিজেকে একাত্ম করে নিতে পারেন, সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সেও কম নয়। কিন্তু পুরুষ লেখকের স্বরের সঙ্গে পাঠিকাও কি পারেন সবসময় নিজেকে একাত্ম করতে? পাঠকের অন্তর্লোক-বহির্লোক আর পাঠিকার অন্তর্লোক-বহির্লোক কি অনেকটাই আলাদা নয়? একজন লেখক তাঁর রচনায় মেয়েদের কীভাবে দেখছেন, পাঠিকার পাঠে তা যেভাবে ধরা পড়ে, পাঠকের পাঠে সেভাবে ধরা পড়ে না তাই। পাঠিকার পাঠকে নাম দিতে চাই মেয়েলি পাঠ। সেইরকম এক মেয়েলি পাঠ এই আলোচনা, এর মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গল্পের মেয়েদের বুঝতে চেয়েছি একজন পাঠিকার অভিজ্ঞতার নিরিখে।

তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারা'র অধিকাংশ গল্প মূলত পুরুষের জগতের গল্প। ক্ষুধা, লোভ কিংবা বাসনায় বিক্ষুব্ধ পুরুষ চরিত্রগুলি—অন্ধকারের মধ্যে যারা বাস করে, কিন্তু তারা অন্ধকার থেকে পরিত্রাণ পায়। এই লেখকের কলমে এমন কোনো কালিমা আঁকা হয় না, যা মানবতাকে চূড়ান্তভাবে লিপ্ত করতে পারে। পরিত্রাণ মেলেই, আর সে পরিত্রাণের অবলম্বন হয় কোনো-না-কোনো নারী-প্রতিমা, সে প্রতিমা কোথাও বা জায়ার, কোথাও বা জননীর। তাই বলে নারীকে যে কোনো ভাবময়তায় ঝাপসা করে দেওয়া হয়েছে—এমনও তো নয় ; না, কোনো 'মধ্যবিত্তিক ভাবপ্রবণতা' আবেগের ঝোঁকে ঘাড়ে চেপে বসেনি এসব গল্পের নিপীড়িত শ্রেণী-জীবনের উপরে। হায়াৎ মামুদ উদ্ধৃত করেছেন কোনো সমালোচকের এমন এক আশঙ্কার কথা, 'নয়নচারা'র সেই সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল 'পরিচয়' পত্রিকায়।

সেই শ্রেণী-স্বাভাবিকতা থেকেই কোথাও বা পুরুষ দেখছে নারীকে যৌন সর্বস্বতাতেও : 'আকাশে হয়তো গুচ্ছ-গুচ্ছ আঙ্গুর ফল ঝুলছে, তার প্রত্যেকটি মহব্বতের রসে ভরা। কেন এত আঙ্গুর, কেনই বা ঝুলছে?—ঝুলছে শুধু নারীর দেহে ঝরঝর করে ঝরে পড়বার জন্যে। জয় হোক নারীর দেহের আর গুচ্ছ-গুচ্ছ আঙ্গুর ফলের...।' 'খণ্ড চাঁদের বক্রতায়' নামে যে গল্প থেকে এই উদ্ধৃতি, সে গল্পে, 'নয়নচারা' গ্রন্থের মধ্যে মাত্র সেই গল্পেই, মেয়েলি দুনিয়াও আছে একঝলক। সেই মেয়েলি দুনিয়াতেও মনোজগতের অন্ধকার দিক আর তার থেকে পরিত্রাণের ছবিই এঁকেছেন লেখক। এ গল্পে সে-অন্ধকার ঈর্ষাজনিত। চতুর্থ বিবির আগমন ঘটছে শেখ জব্বারের ঘরে, বাইরে

তার উৎসব, আর ভিতরে—নতুন বিবির প্রতি পুরোনো তিন বিবির ঈর্ষা—'বাইরে আনন্দের আগুন জ্বলছে, এখানে জ্বলছে হিংসার আগুন। হিংসা বিদ্বেষ এদের ধর্ম, এবং এরই উত্তাপে তারা বেঁচে থাকে : তাদের দেহে তো সূর্যের আলো পৌঁছয় না।' অবরোধের অন্ধকার মুসলমান মেয়েদের অন্তরজগতেও কতটা কলুষ ছড়ায়, তার ইঙ্গিত দিতেও তো লেখক ভোলেননি এখানে। তিন বিবির ঈর্ষার আগুন থেকে চতুর্থ বিবির ভিতরে জাগে ক্রোধের আগুন, সে তৃতীয় বিবির হাতে কামড়ে দেয়, আর তারপর—'সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল বস্ত্রসার ক্ষুদ্র মেয়েটির দেহের ওপর, তারপর চুল টানাটানি হাতাহাতি এবং তার সঙ্গে কুৎসিত অশ্রাব্য গালাগাল অবিরাম চলতে থাকল : তাদের দাঁত ও চোখ বাঘিনীর মতো ধারালো ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।' ওয়ালীউল্লাহর সমসাময়িক অনেক লেখক এইখানেই হয়তো ছবিটির ইতি টানতেন, 'এরা জিঞ্জির চায়, মুক্তি চায় না'—এই মন্তব্যে মনেও হয় যেন ওয়ালীউল্লাহও বুঝি ইতিই টেনেছেন। কিন্তু মনের অন্ধকার দিক কখনো তো তাঁর কাছে শেষ কথা নয়। তাই, তারপরেও পুরুষের দুনিয়ার বীভৎস আমোদের আরো কিছুটা বর্ণনা দেবার পরেও, শেখ জব্বারের চোখে 'চেঙ্গিস খাঁর দুর্বার লোলুপতা'র ছবির পরেও, আকস্মিকভাবে আবার আসে অন্দরমহলের বর্ণনা—নয়াবিবির বিধ্বস্ত হতচেতন দেহ দেখে ডুকরে ওঠে পয়লা বিবি—'এয়া খোদা, মেরি বেটি কী ক্যা হাল হুয়া'—অনেকদিন আগের মরে-যাওয়া মেয়ের সঙ্গে মিলে যায় তার নতুন সতীন—'পয়লা বিবির অন্তর ঝিরঝির করে' ওঠে—অসার্থক ও অপূর্ণ মাতৃত্বের বেদনা ও স্মৃতির ভারে।' ঈর্ষা থেকে, ক্রোধ থেকে এইভাবে মানবতা ত্রাণ পায়।

'সতীন' নামে একটি অগ্রন্থিত গল্পেও রয়েছে এমনই একটি ত্রাণের ছবি। গল্পটিতে মূলত একটি মেয়েরই দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত, করিমন নাম সেই মেয়ের, যার স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করেছে। সতীন বিষয়ে করিমনের মনের বিবিধ প্রতিক্রিয়াই এ গল্পের বিষয়। স্বামী আবার একটা বিয়ে করেছে বলে কোনো প্রতিবাদ করে না করিমন, প্রতিবাদের প্রশ্নই ওঠে না, কেন না উঠতেই পারে না। তাই করিমন কাঁদে আর ভাবে—'দুঃখের কী আছে! সতীনকেও সে সহ্য করতে পারবে!' আর, সহনশীলতায় আরো সে শান্ত-স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। তবু, সেইসঙ্গে ভিতরে ভিতরে চলতে থাকে প্রতিতুলনা, নিজের সঙ্গে নিজের দাম্পত্যের সঙ্গে প্রতিতুলনা, যার মূলে অকথিত অব্যক্ত বঞ্চনার যন্ত্রণা থেকে যায়। সহিষ্ণু নির্বিরোধী একটি মেয়ের অন্তর্লোককে কী অসাধারণ দক্ষতাতেই না রূপ দিয়েছেন লেখক! শেষ পর্যন্ত করিমন ঈর্ষার জ্বালাও যে বোধ করে না তা তো নয়, তা হলে সে হতো অস্বাভাবিক। 'বোন, অ বোন। ওঠ গো বোন!'—এমন আদরভরা ভাষায় ডাকলেও নতুন বৌকে ছুঁতে পারে না করিমন, আর সেই ডাক শুনে নতুন বৌ রেজিয়ার মনে পড়ে যায় তার প্রয়াত দিদিকে। তারপরে একটা মুহূর্ত আসে, যখন ঈর্ষা হার মানে, 'স্নেহ ও বেদনার সংঘর্ষ' চলে করিমনের মধ্যে, ক্রন্দনরতা রোজিয়াকে সে নিঃশব্দে বুকে টেনে নেয়! মানবতা ত্রাণ পায়।

ওয়ালীউল্লাহ-র পূর্বসূরী লেখক জগদীশ গুপ্তর একটি গল্প আছে সতীন-সমস্যা নিয়ে। 'চন্দ্র-সূর্য যতদিন' নামে সেই গল্পে সতীনের আগমনে প্রথম স্ত্রীর মনে স্বামী বিষয়ে যে জটিল প্রতিক্রিয়া চিত্রিত করেছেন লেখক, ওয়ালীউল্লাহর লেখায় তার সঙ্গে তুলনীয় কোনো মানসিকতার উন্মোচন নেই, সতীন বিষয়ে দুটি গল্পেই মেয়েরা যে তাদের স্বামীর প্রতি কোনো রাগ-বিরাগ প্রকাশ করছে, এমন নয়। জগদীশ গুপ্তর লেখায় বিবাহ-প্রথারই যেন তিক্ত সমালোচনা থেকে যায় ; তেমন কোনো সমালোচনায় আগ্রহী নন ওয়ালীউল্লাহ, তিনি অন্তর্লোকের অন্ধকারের থেকে উত্তরণের পথনির্দেশ দেন, সে অন্ধকারের বিশ্লেষণ ততটা চান না। বহুবিবাহ প্রথা মেয়েদের ইমানে কোনখানে আঘাত দেয়, সে বিষয়ে তাঁর লেখনী নীরব।

কিন্তু বহু সন্তানবতী জননীর স্বামীর প্রতি অভিযোগ—সংসারে মেয়েদের পরিস্থিতির করুণ আলেখ্য, এই পুরুষ লেখক তুলে ধরতে পেরেছেন। 'মৃত্যু' নামে একটি গল্পে 'ডিপুটি মুনসেফ' খান সাহেবের স্ত্রী আমেনা খাতুন প্রতি বৎসর সন্তান জন্মলাভ করার ফলে হাঁফ ছাড়বার ফুরসত পাননি বহুদিন। কিন্তু একদিন, 'এলোপাথাড়ি দিশেহারা দিনগুলো কাটিয়ে এক শান্ত অপরাহ্ণে পৌঁছে হঠাৎ তিনি যেন দুনিয়া আবিষ্কার করলেন, তিনি নিজেকে খুঁজে পেলেন, বাঁচার প্রয়োজন ও জীবনের অর্থও যেন তাঁর কাছে প্রতিভাত হল মামুলি ধরনে।' আর তারই পরিণামে একদিন তিনি স্বামীর কোর্টে বেরোবার সময় 'তাঁর মাথায় এক পাতিল ডাল ফেলে দিয়েছিলেন'। তাঁর স্বামী অবশ্যই এ বেয়াদপি মেনে নেননি। 'শেষে একদিন তিনি আমেনা খাতুনকে, যিনি তখন অধিক সংখ্যায় খোদার বান্দা পয়দায়েশ করে, নিজের বুকের রক্ত দিয়ে তাদের লালনপালন করে স্বয়ং নিজে মালখালাস ফতুর হয়ে আছেন, তাঁকে মোটর-টায়ারের অংশ দিয়ে তৈরি খড়ম দিয়ে বারকয়েক আঘাত করলেন।' আমেনা খাতুন স্বামীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে থাকেন তাঁর সন্তানদের কাছে, বলেন 'তোর বাপ হইল জোঁক, রক্ত শুষে-শুষে নেয়।' আর তারপর একদিন অসুখে পড়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যান, আর মৃত্যুর পর তাঁর স্বামী 'স্ত্রীর মৃতদেহের জন্য অর্থ ব্যয় করলেন' নিঃসংকোচে, 'ফকিরও খাওয়ালেন অনেক।'

জোঁকের উপমা আরো একটি গল্পে আছে, সেখানেও বহু সন্তানবতী জননীর নিঃস্বতা দেখানো হয়েছে, কিন্তু সে নিঃস্বতা দেখছে তারই যৌবনবতী মেয়ে! এ গল্প আগেরটির মতো প্রতিবাদের গল্প নয়, সুন্দরের স্বপ্ন আর বাস্তবের কদর্যতা, যৌবনবতী মেয়ে আর যৌবনরিক্তা মা প্রতিন্যস্ত হয়েছে এ গল্পে সমান্তরালভাবে। যৌবনবতী মেয়েটি, যার নাম সেলিমা, তারই অন্তর্লোক এ গল্পের বিষয়, তার প্রেমের স্বপ্ন, সৌন্দর্যের বোধ বাস্তবের আঘাতে প্রতিমুহূর্তে ভেঙে যায়, তিক্ততায় ভরে ওঠে অন্তর। তারই দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত গল্পে, সে দেখছে তার মাকে—বহু সন্তানবতী দুর্বলতম অসহায়া মাকে, তারই দেখায় তার মায়ের কোলের শিশুটির বুকের দুধ খাওয়া হয়ে ওঠে : 'ক্ষুধার্ত বিষাক্ত জোঁক যেন আম্মার বুক থেকে রক্ত চুষে নিচ্ছে!' প্রতিবাদ নয়, এ গল্পটির শেষে থাকে বরং একটি উত্তরণ : সুন্দরের স্বপ্নদেখা মেয়েটি তার অসুন্দর জীবন-রিক্তা আম্মার পা-দুটি আবছা অন্ধকারে খুঁজে নিল ; 'তারপর তাতে মাথা রাখতেই তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল এবং রাতের মতোই নীরব থেকে সে কাঁদতে থাকল অঝোরে।' যে সেলিমার মনের 'নৃত্যোচ্ছল আনন্দ' স্থায়ী হতে পারত না তীব্র ঘৃণার বোধে, তার ঘরের প্রতি ঘৃণার বোধে, আম্মাকে দেখেও যার ঘৃণা হতো, তার এই অঝোর কান্নাতে কান্নার ভিতর দিয়ে তার শান্তি পাওয়াতেই গল্পটি শেষ হয়।

মেয়েলি অন্তর্লোকের এই ছবি, তার দ্বন্দ্বময়তা এতটুকু বিশ্বাসযোগ্যতা হারায় না কোথাও। এখানেই গল্পকারের শক্তির পরিচয়। অন্তর্লোকের উপরই এই লেখকের ঝোঁক, কিন্তু বহির্লোকের ছবি যে একেবারে নেই তাঁর গল্পে এমন নয়। মেয়েলি জগতে বালিকা বধূর পরিস্থিতি তাঁর গল্পের বিষয় হয়েছে, গল্পটির নাম 'বংশের জের'। 'রামধনু' দেখে বাড়ির আর পাঁচটি ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে আনিসাও উল্লাস প্রকাশ করে ফেলেছিল, তার জন্যে তাকে শাস্তি পেতে হয় ; খিলখিল করে হেসে ওঠার জন্যেও ধমক খেতে হয় তাকে, ঘোমটা কপাল থেকে একটু ওপরে উঠে গেলে তার জন্যেও তাকে কড়া কথা শোনানো হয়। পাগল স্বামীর পাগলামো সহ্য করতে না পেরে দিদিশাশুড়ির কাছে আশ্রয় নিতে আসে আনিসা, কিন্তু সেখানেও তাকে ধমক খেতে হয়। আনিসার দৃষ্টিকোণ থেকেই এ গল্পে ধরা পড়েছে সংসারে মেয়েদের নিঃসহায় পরিস্থিতি। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন 'ঘরের কাছে ঘরের মানুষের বলি', সে সম্বন্ধে কতটাই সচেতন ছিলেন এই লেখক, গল্পটি তারই দৃষ্টান্ত।

'স্বপ্নের অধ্যায়' নামে একটি গল্পে মেয়েলি দৃষ্টিকোণ তো ব্যবহৃত হয়েছেই, কিন্তু শুধু

তাই-ই নয়, এ গল্পের প্রধান চরিত্র মালেকা সেইসঙ্গে যেন হয়ে উঠেছে প্রটাগনিষ্টও। ওয়ালীউল্লাহর অনেক গল্পে যেমন বাইরের ঘটনার কোনো গুরুত্বই থাকে না, সময়ের একটা ছোট বৃত্তে ভাবনা তার গভীরতার অনুলম্ব বিস্তার দেয়, এ গল্পটি সে জাতের নয় ঠিক। এ গল্পের বিস্তার স্থানকালের কিছুটা বড় পরিধিতে, সেইসঙ্গে ভাবনার বিস্তারও কম গভীর নয়। আর কী আশ্চর্য—সে ভাবনা একজন মেয়ের! কোনো পুরুষ লেখকের কলমে এমন গল্প কমই পড়া যায়, যেখানে কোনো মেয়ের ভাবনাজগৎ উপস্থিত করা হয় পুরুষ-নিরপেক্ষ ভাবে, সেখানে সাংসারিক পরিস্থিতির বাইরেও মেয়ের অন্তরজগৎ চিত্রিত হতে পারে, চিত্রিত হতে পারে তার শূন্যতার বোধ, তার স্বপ্ন, তার জীবনের ব্রতর কথা! মালেকা নামে সেই মেয়েটি, যাকে তার বাবা-মা 'নির্দিষ্ট' করেননি, তাকে তার মধ্যে 'নিঃসঙ্গ করে ছেড়ে দিয়েছেন'—তার মতো মেয়ের কথা ক'জন পুরুষ লেখক জানেন? পুরুষ লেখক মেয়েদের প্রিয়া, জননী, জায়া-কন্যার ভূমিকাতেই দেখতে চায়, তাই তাদের কলমে মেয়েদের অন্তর্লোক পুরুষকে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত হয়। কিন্তু ওয়ালীউল্লাহর এই মানসকন্যা মালেকা কেবল একটুখানি সময় মাজুভাই-এর কথা ভাবে, সেটুকু ব্যতিক্রম মাত্র। মালেকা সেইখানেই মালেকা, যেখানে—'মালেকা কিছু ভাবল না, কেবল তার মনে হঠাৎ একটা শূন্যতা নিঃশব্দে ছড়িয়ে উঠল,...কাপড়-জামা বদলে পরল, খাতা-বই টেবিলে সাজিয়ে রাখল, তারপর দেখল আর কিছু করবার নেই। এবং সেই বলে আরো শূন্যতায় তার মন কেমন হয়ে উঠল'। মাজুভাই তাকে বেশ কিছুটা বিচলিত করে ঠিকই, কিন্তু যখন সে শোনে মাজুভাই চলে গেছে, তখন সে, কথায় তার ব্যথাও হয় না বিস্ময়ও হয় না, 'সারা মন কেবল আশ্চর্য শূন্যতায় শান্ত' হয়ে থাকে।

শূন্যতার বোধ যার আছে, স্বভাবতই তার থাকবে নিঃসঙ্গতার চেতনা : 'মালেকা তাকিয়ে রইল, দিগন্তের ছায়া পড়ে চোখে যে-অস্পষ্টতা জন্মায়, তেমনি সুদূর অস্পষ্টতা, তার চোখে। অথবা হয়তো অন্তরের নিঃসঙ্গতার ছায়া তাতে।'

কিন্তু এই নিঃসঙ্গতাকে সে চূড়ান্ত বলেও মনে করে না, সে জানে সে একদিন আর একাকী থাকবে না, 'একদিন একদল লোক আসবে।' একজন লোক নয়, একদল লোক। এই তা হলে তার স্বপ্ন—কোনো ঘর-সংসারের, কোনো প্রেমিক/স্বামীর স্বপ্ন নেই এই যুবতী মেয়েটির চোখে! কিন্তু কেন একদল 'লোক'? তার মধ্যে কোনো মেয়ে আছে কি নেই? কারা তারা? তারা কি সাচ্চা মুসলমান? আত্মশক্তিতে বলীয়ান মুসলমান? পরিষ্কার করে উচ্চারিত না হলেও কথাটা তাই-ই। কেননা ইসলামের জাগরণ নিয়েই তো তার স্বপ্ন! তার বন্ধু নাজমাকে মালেকা এক দীর্ঘ সংলাপে তার স্বপ্নের কথা বলে, তার জাগরণের স্বপ্ন—'...এসব যেন একটা জাতির স্বপ্ন, যে-জাতি নতুন জন্মেছে। মানুষের পুনর্জন্ম হয় না, কিন্তু জাতির হয়। আমরা মরে গিয়েছিলাম ভারতে, মিশরে, আরবে, আলবেনিয়াতে, পৃথিবীর সর্বত্র। আমরা হয়তো আবার নতুনভাবে জন্মলাভ করেছি, কিন্তু কেউ হয়তো সে-কথা জানে না...বিরাট বিশ্বজনীনতা যে রয়েছে আসল ইসলামের এ-শক্তিতে, যে-শক্তি আজ ধ্বংস হয়ে গেছে...! কিন্তু এটা সত্য।...এবং সে-সত্যের শক্তি নয় বটে তবে তার স্বপ্ন আমার মধ্যে।'—কিন্তু মালেকার এ স্বপ্নের মধ্যে কোথাও থাকে না মেয়েদের কথা—ইসলামের সেই শক্তি মেয়েদের কীভাবে মুক্তি দেবে—তার কথা। তাই সন্দেহ হয় মালেকার জবানীতে এ তার পুরুষ স্রষ্টারই স্বর! দীনহীন মুসলমান সমাজ মালেকাকে পীড়িত করে, সংবেদনশীল মনকে তা তো করবেই। কিন্তু সেইসঙ্গে মালেকা এও তো দেখে—বাইরের আলোর জন্য যাদের প্রাণ আকুল হয়ে থাকে, 'এবং সে-আলো দেখবার সুযোগ পায় না বলে এবং স্বাধীনতার কামনাকে দমিয়ে রাখা হয়েছে বলে' যাদের চোখে এমন বীভৎস দৈন্য, সেই রহিমা হোসনাকেও তো দেখে,

তাদের দেখেও তো মালেকার চোখ আহত হয়। তাদের কাঙালপনা দেখেও মালেকার মন কালো হয়ে ওঠে—বেদনায় লজ্জায়। মালেকা আরো দেখে বাবার যত শাসন মেয়েদের উপরেই, ভাই-এর সাতখুন মাপ। কলেজের হোস্টেলে গিয়ে মালেকা দেখে—কলেজের বাসের জানলায় কালো পর্দা ঝোলানো। যেন সে বাস বন্দীদের নিয়ে আসে 'এক কয়েদখানা থেকে আরেক কয়েদখানায়।' মালেকা ভাবে—'এ-সব মেয়েদের বুদ্ধিমত্তায় কোনো দোষ নেই, কিন্তু একথা তাদের মাথায় খেলবে না যে, এমনি ভূতের মতো কালো পর্দায় লুকিয়ে আসাটা কী অমানুষিক আর কী হাস্যকর।'

এমন যে মালেকা, এত যার বুদ্ধি, সে কি জানে না যে, মেয়েরা সাধ করে 'ভূতের মতো কালো পর্দায়' লুকিয়ে আসে না, তারা শুধু সমাজের হুকুম মানে? তারো চেয়ে আশ্চর্য এই যে, যার প্রত্যক্ষণে মেয়েদের দুর্দশা ধরা পড়ে, তার স্বপ্নে কেন মেয়েদের কথা আর থাকে না? সেখানে থাকে শুধুই মুসলমান জাতির কথা। মালেকা যে নিজে নারীজাতি কিংবা ভারতীয় জাতি কিংবা বাঙালি জাতিরও, যার প্রত্যেকটির নিজস্ব হীনাবস্থা রয়েছে, মালেকা সেসব নিয়ে কখনও ভাবে না কেন?

পুরুষ লেখকের হাতে তৈরি মালেকার বৈপরীত্যে মনে পড়ে যায় মালেকার মতোই ক্ষুরধার চৈতন্যবান বাস্তব নারী বেগম রোকেয়ার কথা। রোকেয়া কখনো তো ভোলেননি যে তিনি মুসলমান, ইসলামধর্মে নিষ্ঠাও তাঁর কম ছিল না, অথচ তাঁর ভাবনায় স্থান পেয়েছে শুধু মুসলমানের দুরবস্থা নয়, ভারতের দুরবস্থা, বাঙালির দুরবস্থা এবং সর্বোপরি জাতিধর্ম-নির্বিশেষে মেয়েদের দুরবস্থার কথা!

ইসলামের জাগরণের স্বপ্ন ওয়ালীউল্লাহ'র আরো দুটি গল্পেও যথেষ্ট জায়গা জুড়েছে। পাকিস্তানের সরকারি জন্ম হওয়ার আগেই সেসব গল্প লেখা, অথচ, মালেকার মতোই এ দুটি গল্পের দুটি বিশিষ্ট পুরুষচরিত্র নিজেদের বাঙালি বলে ভারতীয় বলে ভাবেন না, তাঁরা শুধু ঐকাত্ম্য অনুভব করেন সারা পৃথিবীর ইসলামের সঙ্গে। দুটি গল্পেই পুরুষচরিত্র ইসলামের জাগরণের স্বপ্নের কথা বলেন, দুটি গল্পেই নারীচরিত্র তার নীরব শ্রোতা! 'চৈত্রদিনের এক দ্বিপ্রহরে' গল্পে আনোয়ার বলে, ছালেহা 'চোখ নত করে' শোনে। আনোয়ার বলে—'কী জান, একটা জাতির মধ্যে সাড়া ও জাগরণ আনতে হলে তার একটা গৌরবময় ইতিহাস চাই। জান, বাংলার এই যে শত-শত অর্ধদগ্ধ কুৎসিত চাষার দল...তারা নাকি মুসলমান, আমাদের ভাই,...মনে হয়, ওদেরকে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করি, ওরে, আমার ভাইরা, এমন অবস্থা তোদের কে করলে? তোরা যে মুসলমান—শুধু এ কথাটি তো জানিস?'—আনোয়ারের রাগ দুঃখের আবেগভরা কথা শুনে ছালেহার 'অশ্রুসজল চোখ বেয়ে পানি' ঝরে পড়ে, একান্তই অভিভূত সে, এবং নীরবও। ছালেহার মনে প্রশ্ন উঠলেও পারত—'বাংলার কুৎসিত চাষার দল'—প্রত্যেকেই কি মুসলমান? কিন্তু না, সে শুধু অভিভূত প্রেমিকা, তার মনে কোনো প্রশ্ন নেই, আনোয়ারের প্রতিটি কথা তাকে শুধু মুগ্ধই করে। এমনকি ছালেহা এ প্রশ্নও করে না—আনোয়ার কেন শুধু মুসলমান ভাইদেরই কথা বলছে, মুসলমান বোনেরা গেল কোথায়? বোনেদের দুর্দশা কি ভাইদের থেকে আরো অনেক বেশি নয়? খুব অবাক লাগে ভাবতে, ছালেহার মনে কেন প্রশ্ন জাগে না—বহুবিবাহ আর তালাকপ্রথায় মুসলমান বোনেদের চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতা কি সত্যিই ঘুচে যাবে ইসলামের জাগরণ ঘটলে? আনোয়ার ছালেহাকে বলে—'কী জান, আমাদের আজ যে এতটা আপজাত্য ঘটেছে, তার মূল কারণ হচ্ছে ধর্ম-সম্বন্ধে অজ্ঞতা। শুধু ইসলাম ধর্ম-সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞান থাকলেই যে-কেউ একজন অসাধারণ ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে।' ছালেহা সব কথাই নীরবে শোনে, কোনো সামান্য মন্তব্য বা সংযোজনও করে না। মেয়েদের এই নীরব মুগ্ধতাই কি পুরুষের জন্যে ভালো? যদি তাদের মধ্যে কোনো ক্ষমতা সম্পর্ক না থাকে, যদি তারা প্রেমিক-প্রেমিকা হয়, তাহলেও?

'নকল' গল্পে অবশ্য ক্ষমতা সম্পর্কই রয়েছে, যে পুরুষ বলছে তার যে মেয়ে নীরবে শুনছে, তাদের মধ্যে। পুরুষটি প্রবল প্রতাপী পিতা, আর মেয়েটি তার কন্যা। 'তিনি যখন বলেন তখন আফিয়া শোনে, নীরবে, চুড়িতে পর্যন্ত সামান্য আওয়াজ হয় না। কথা যখন শেষ করেন তখনো আফিয়া নীরব থাকে, হয়তো তাঁর গভীর চোখের পানে চেয়ে, অথবা মেঝের পানে তাকিয়ে। তারপর ঘরে নীরবতা জমাট হয়ে ওঠে, এত নীরবতা যে আফিয়া তলিয়ে যায়...তারপর এক সময় তিনি আস্তে বলেন, যাও। শুনে সে আস্তে উঠে দাঁড়ায়, নীরবে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।' আফিসার মনে কিন্তু প্রতিবাদ জাগে, এই নীরবতার সংস্কৃতি সে ভেঙে ফেলতে চায়, নিজের মনের মধ্যে তার প্রশ্ন জাগে—'সে যে আব্বার কথা মন দিয়ে শুনেছে, শুনে তার কেমন ভালো লেগেছে, এ কথা জানাবার তার অধিকার নেই?' আফিয়ার আব্বাও বলেন ইসলামের কথা : 'মুসলমানদের আজ চরিত্র নেই, মেরুদণ্ড নেই, আলজিয়ার্স থেকে জাভা-সুমাত্রা-চীন পর্যন্ত কোথাও নেই। হয়তো এখানে-সেখানে ব্যতিক্রম হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আছে, কিন্তু জাতি হিসেবে নেই। তবে আবার হবে, হবে ধীরে ধীরে।'—এসব কথা আফিয়া নীরবেই শোনে, শুনতে সম্ভবত ভালোও লাগে তার। আবারও মনে পড়ে বেগম রোকেয়ার কথা, যিনি লিখেছিলেন ধর্মগ্রন্থগুলিই মেয়েদের পরাধীনতার মূলে। লিখেছিলেন—মুনি-ঋষিরা পুরুষ ছিলেন বলে মেয়েদের জন্যে অধীনতামূলক বিধান রচনা করেছেন, কোনো স্ত্রী-মুনি বিধান দিলে হয়েতো অন্যরকম শোনা যেত। অবশ্য পুরুষ-লেখকের কলম যে ছালেহা বা আফিয়াকে রচনা করবে, তার মধ্যে রোকেয়ার তুলনা খোঁজা উচিত নয়, মেয়েদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার চাপ—যেখান থেকে প্রতিবাদ উঠে আসে—সেই চাপ সেই প্রতিবাদ পুরুষ-লেখকের ভাবনায় যদি না আসে, তার জন্যে তার রচনার মূল্য কিছু কমে যায় না। সংসারে যা সচরাচর ঘটে থাকে, পুরুষ-লেখক তাই-ই দেখাতে চান, কেন ঘটে—তার উত্তর তিনি না-ই খুঁজতে পারেন।

ওয়ালীউল্লাহ'-র অধিকাংশ গল্পেই অনুভবজগতে বিষাদময়তা রয়েছে, ভাবনাজগতে রয়েছে গাম্ভীর্য। খুব ব্যতিক্রম 'সাত বোন পারুল' নামে দুই পর্যায়ের দুটি গল্প। দুটি গল্পই সংলাপধর্মী, সাতটি নানা বয়সের মেয়ে এবং একটি পুরুষের সংলাপ। লেখক 'দ্বিতীয় দফা'র ভূমিকা করে জানিয়েছেন এই মেয়েগুলিকে তিনি 'এখানে-সেখানে' দেখেছেন এবং 'এদের চপলতা ও স্বচ্ছ প্রাণময়তা'য় বারেবারে মুগ্ধ হয়েছেন। গল্পটির মধ্যে এ দুটি গুণ ছাড়া মেয়েগুলির অন্য একটি গুণও প্রকাশ পেয়েছে—কথায় এবং কাজে তাদের ক্ষুরধার বুদ্ধি। যে কারণে পুরুষচরিত্রটিকে স্বীকার করতে হয়েছে—'আমাকে তোমরা সাত হাটে সাতবার বেচতে পার।' মেয়েলি লীলাচাপল্যে গল্পটি সরস এবং হাস্যোজ্জ্বল। সে চাপল্য নিন্দার অর্থে যাকে 'মেয়েলিপনা' বলা হয়, তার খুব বিপরীত। এরা জায়া, কন্যা বা জননীর মতো কোনো নির্দিষ্ট ভূমিকাতেও বৃত নয়। এরা শুধু মেয়ে।

ওয়ালীউল্লাহ'র অনেক গল্পে মেয়েদের ভূমিকা পালন, তার বদ্ধতা, তার বেদনাকাতরতা দেখেছি, আবার বেশকিছু গল্পে ভূমিকাপালনের বাইরে মেয়েকে শুধু মেয়ের পরিচয়ে পেয়েছি। এই দ্বিতীয় ধরনের গল্পের মধ্যে প্রতীক-ব্যঞ্জনাধর্মী গল্পগুলি পড়ে। যেসব গল্পে স্বপ্ন ও বাস্তব মিলেমিশে রয়েছে। এই যে মেয়েদের তিনি ভূমিকার ভিতর থেকে আর তার বাইরে থেকেও দেখতে পেরেছেন, যেভাবে খুব কম লেখকই দেখে থাকেন, এর জন্যেই আমার এই মেয়েলি পাঠে ওয়ালীউল্লাহ বিশেষভাবে মান পেয়ে যান।

১৯৯৮

পুরুষের কলমে নারী : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

আদিকাল থেকেই আদিরসকে কাব্যশাস্ত্র প্রধান রসের মান দিয়েছে। সেই আদিরস-সৃষ্টির বিভাব হিসেবে পুরুষ কবির কলমে বর্ণিত হয়েছে নারী। কেমন সেই নারী? যেমন পুরুষ চায়। কীভাবে চায় পুরুষ নারীকে? চায় দুভাবে। নারীর সেই দুই পুরাণ-প্রতিমাব নাম লক্ষ্মী আর উর্বশী—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়। লক্ষ্মী হলেন 'কল্যাণী,/বিশ্বের জননী' আর উর্বশী—'বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রাণী'। এইসব কাব্য-পংক্তি বড়ো সুন্দর, যেন কতই মহিমা দেয় তারা নারীকে! কিন্তু ঐ সুন্দরের পিছনে যে সত্য আছে, কী ভয়ানক সেই সত্য। সে সত্য তো এই যে, পুরুষের কাছে নারী তার প্রয়োজন মেটানোর সামগ্রী শুধু! প্রয়োজন দুরকম, তাই নারীকে পুরুষ পেতে চায় দুভাবে। এক—তার গৃহসীমায় নারী থাকবে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে, তার, তারই সন্তানের জননী হয়ে, সংসারের পাচিকা কিংবা পরিচারিকা হয়ে। এই নারীরই আদর্শায়িত মূর্তি হলেন লক্ষ্মী। কিন্তু পুরুষের আর-এক প্রয়োজনও আছে, যে প্রয়োজন গৃহসীমার মধ্যে মেটে না, তাই আর-এক নারীকে তার প্রয়োজন, যে কোনো একজন পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সে সকল পুরুষের সম্পত্তি, একজনকে নিয়ে ঘর বাঁধবার অধিকার তার নেই, প্রয়োজন-অনুসারে একজন পুরুষ অন্য একজন পুরুষকে ঘায়েল করবার টোপ হিসেবে তাকে ব্যবহার করবে, যেমন করতেন ইন্দ্র, স্বর্গনটীরা তাঁরই নির্দেশে মুনিদের তপোভঙ্গ করতেন, মুনিরা ধ্যান ভেঙে তাদের পায়ে দিত তপস্যার ফল! এই নারীরই আদর্শায়িত মূর্তি হলেন উর্বশী।

বাংলাভাষায় পুরুষরচিত কবিতায় নারীর এই দুই রূপকে কেবলমাত্র না হলেও প্রধানত পেয়ে এসেছি আমরা; কিন্তু এর মূলে আছে ব্যক্তি-পুরুষের চাহিদা, ব্যক্তিগত ইচ্ছা-পূরণের তাগিদ থেকে এ পুরাণ-নির্মাণ। কিন্তু কবিতায় যিনি ব্যক্তিবাদকে প্রশ্রয় দেন না, কবিতায় 'আমি'র বদলে যাঁর কবিতায় থাকে 'আমরা'র কথা, তাঁর কবিতা যে লক্ষ্মী-উর্বশীর পরম্পরা ভেঙে দেবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতা-বই 'পদাতিকে' বরং ব্যক্তিপ্রেমের বিরুদ্ধেই কবির জেহাদ। প্রেম নেই, তাই নারীও অনুপস্থিত ঐ কাব্যে।

কিন্তু প্রেমের কবিতার বাইরে, নারীকে নারী হিসেবে দেখে তার নিজস্ব বেদনা-জগতের উন্মোচন যে পুরুষ কবি কখনো করেন না, তা তো নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য-জীবনের গোড়ার দিকেই লিখেছিলেন নারীর বয়ানে 'বধূ'র মতো কবিতা, সংসারে নারীর ট্র্যাজিক পরিস্থিতি যে কবিতায় নারীর সহজ ভাষাভঙ্গিতে উঠে এসেছিল তার সবটুকু সত্যতা নিয়ে। 'পদাতিক'-এও আছে 'বধূ' নামে একটি কবিতা, রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতার কিছু কিছু বাক্যাংশও ব্যবহৃত হয়েছে সে কবিতায়। সে কবিতায়, বুদ্ধদেব বসুর মতে, রবীন্দ্রনাথের 'বধূ'কে 'বিশ-শতকী জীবন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে।' তাই কি? তাহলে তো 'পদাতিক' প্রেম-বর্জিত কাব্য হলেও নারী-বর্জিত কাব্য নয়! কিন্তু এমন তো নয় যে, রবীন্দ্রনাথের উনিশ শতকের বধূর প্রতিতুলনায় সুভাষ বিশ শতকের বধূকে রাখছেন? তাঁর কবিতায় তো 'বধূ' উপলক্ষ্যমাত্র, বধূর বকলমে কবিই ব্যঙ্গবান ছুঁড়ছেন গ্রামকাতরতা

আর প্রেমকাতরতার প্রতি। রবীন্দ্রনাথের 'বধূ'র সংলাপ সখীর সঙ্গে, আর সুভাষের 'বধূ'র সংলাপ সখার সঙ্গে। এইখানেই কবিতাদুটির সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সেখানে 'ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি/পরখ করে সবে, করে না স্নেহ'র মতো পংক্তিতে নারীর হাহাকার বেজে উঠেছে, সুভাষের কবিতায় সেখানে গ্রামে পুকুরে জল আনতে যাওয়ার বৈপরীত্যে শহরে রাস্তার কলে জল আনতে যাওয়ার ছবিটুকু আছে মেয়েদের—শুধু ছবিটুকু। তাই, 'বধূ' সত্ত্বেও বলতে পারি 'পদাতিক'-এর কবিতায় নারী নেই। অবশ্য পুরুষও নেই সেভাবে। আছে মানুষ, ব্যক্তিমানুষ নয়, রাষ্ট্রগত মানুষ। আছে রাষ্ট্রের ক্ষমতাচাপ আর তার বিরুদ্ধে সমষ্টিমানুষের প্রতিবাদ। এ কবিতায় নারী নেই—এ তাই কোনো বলার মতো কথাও নয়।

কিন্তু সমষ্টি কি ব্যক্তি দিয়েই রচিত নয়? 'আমরা'-র মধ্যেও কি নেই আমি কিংবা তুমি, নেই পুরুষ কিংবা নারী? আছে যে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই তার নজির দিলেন—'অগ্নিকোণ'-এর 'মিছিলের মুখ' কবিতায়। সমষ্টিগত আন্দোলনের প্রতীক মিছিল, সেই মিছিলে হাঁটতে হাঁটতেই কোনো পুরুষ দেখতে পায় 'আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত' কোনো নারীর 'মুষ্ঠিবদ্ধ একটি শাণিত হাত', দেখতে পায় 'নিষ্কাষিত তরবারির মত' অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক মুখ, দুর্মূল্য প্রসাধনে না সাজলেও যে মুখ দৃপ্ত ফসফরাসের মতো জ্বলে। যে নারীকে দেখেছি এতদিন কবিতায়, হাত তার লতানো, মুখ তার কোমল, সৌন্দর্য তার প্রসাধনে। এর সম্পূর্ণ বিপরীত এই 'মিছিলের মুখ'-এর নারী। পুরুষ চায় তাকে ডাক দিতে 'জরাজীর্ণ ইমারতের ভিৎ ধসিয়ে' দেবার কাজে, পুরুষ চায় 'মিছিলের মুখ' দেহ পাক মিছিলেই। এই এক অন্যরকম চাওয়া পুরুষের। এই এক নতুনরকম প্রেমের কবিতা, যে কবিতায় নারীকে বিষয় হিসেবে নয়, দেখা হচ্ছে বিষয়ী হিসেবে—বিষয়ী পুরুষ দেখতে চাইছে বিষয়ী নারীকে—কাজের মধ্যে, সংগ্রামের মধ্যে, অনেকের মধ্যে।

সেই 'মিছিলের মুখ'কে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় আরো দেখা গেল, 'অগ্নিকোণ'-এর পরেও। স্বপ্নে যখন সেই 'মিছিলের মুখ' ডাক দেয় পুরুষকে, তখন 'দিগন্ত থেকে দিগন্ত জুড়ে' বাড়িয়ে দিতে হয় হাত। সেই 'মিছিলের মুখ' হারিয়ে গেলে পুরুষের তারস্বর ধ্বনিত হয়—'জয়মণি, স্থির হও'। (কী তার মানে? তার মানে জেনেছি 'কাল মধুমাস' নামে আত্মজৈবনিক কবিতা থেকে—কবির মা বিপর্যয় দেখা দিলে বলতেন : 'জয়মণি, স্থির হও'।) কিন্তু কেনই বা সে মুখ 'ছলনাময়ী'? কেন সে মুখ বিদ্রূপ করে হারিয়ে যায়? কেন মনে হয় সে মুখ স্বপ্ন, না কি মায়া, না কি মতিভ্রম? সে কি এইজন্যে যে, নারী-পুরুষের যে প্রেম দুই বিষয়ীর প্রেম, তার বর্ণমালা তখনও জানা নেই পুরুষের, জানা নেই নারীর?

'জয়মণি, স্থির হও' কবিতাটিতেই শুধু নয়, 'তুমি স্বপ্ন? না মায়া?'—এ প্রশ্ন তো রয়েছে 'লাল টুকটুকে দিন' কবিতাতেও। এসব পংক্তি মনে পড়াবে রবীন্দ্রনাথ, কবির অভিপ্রায়ই সেটা, তবে এ ভাষা কি রাবীন্দ্রিক পেলবতার বিপ্রতীপতাকে স্পষ্ট করতেই চায়? কেননা এ তো রবীন্দ্রনাথের প্রমদা নারী নয়, এর কাছে পুরুষের প্রার্থনা—'আমাকে কঠিন বাহু দিয়ে বাঁধো তুমি—', এতদিন এ প্রার্থনা জানাতো নারী তার পুরুষের কাছে। বোঝা যায় ঘরে এলেও এ নারীর এতকালের সমাজনির্দিষ্ট নারীভূমিকা নেই, কেননা পুরুষ তাকে ঘরে পেয়েও তো নিজের অধিকারকেই ফলিয়ে তোলে না, সে বলে : 'দাও তুমি ভালোবাসাকে জন্মভূমি।' এ নারী সবচেয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে কখন, তার পুরুষের চোখে?—সে তো তার নিজস্ব একাকী দেহভঙ্গিমায় নয়, সে সুন্দর হয়—'উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গ' যখন তাকে ঢেকে দেয়, সে সুন্দর হয়—মানুষের সমুদ্রের মধ্যে যখন একাকার হয়ে যায় সে, যখন তাকে পৃথক করে আর চেনা যায় না।

এ কথা ঠিক, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আরো পরবর্তীকালের কবিতায় মিছিলের চলমানতায় নয়, প্রেমকে দেখতে পাব ঘরের স্থিতিতেই, কিন্তু সে ঘর আরেকরকম ঘর। সে ঘর বাঁধা এই জেনে যে 'শূন্যতা কেবলমাত্র শূন্য নয়'। 'শূন্য নয়' নামে সে কবিতায় পুরুষ নারীকে বলে : 'লাবণ্য, একবার তুমি তাকাও আকাশে।' সে ঘরের মধ্যে পুরুষ যখন নারীকে দেখে, তখনও সেখানে ঝিলিক দেয় আকাশের বিদ্যুৎ—'কাল/তোমার জন্মদিন গেল...থেকে থেকে ঝিলিক দেওয়া বিদ্যুতে/আমি দেখতে পাচ্ছিলাম তোমার মুখ' ('তোমাকে বলিনি')।

'শূন্যতা কেবলমাত্র শূন্য নয়'-ও মনে পড়াতে পারে রবীন্দ্রনাথের পংক্তি—'তবু শূন্য শূন্য নয়'। এ মিলও কি ইচ্ছাকৃত? রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বিচ্ছেদের যে অপার দূরত্বে স্থাপন করা হয়েছে নারীকে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় তা একান্তই অনুপস্থিত বলেই এমন মনে হয়। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সেই বিচ্ছেদ-দাহর বৈপরীত্যে সুভাষ বলতে চেয়েছেন নারীকে—'নীড় বাঁধো'। প্রণয় বিলাসের প্রসাধন-কলাতেও নয়, বিরহের ভাবগম্ভীরতাতেও নয়, তাঁর প্রেমের কবিতায় নারীকে দেখা যাবে সাদাসিধে প্রাত্যহিক বাতাবরণে : 'পরনে ছিল না চেলি / গলায় দোলেনি হার ;/মাটিতে রঙিন আশা/পেতেছিল সংসার' ('সংসার', 'যত দূরেই যাই') কিংবা 'আর দেখ/তোমাকে বলাই হয়নি/এবার রথের মেলায় কী কী কিনব/মেয়ের জন্যে তালপাতার ভেঁপু/তোমার জন্যে ফলফুলের চারা/আর বাড়ির জন্যে /সুন্দর পেতলের খাঁচায়/দুটো বদরিকা পাখি।' ('তোমাকে বলিনি' 'কাল মধুমাস') কিংবা 'শুধু জ্বলন্ত একটি জোনাক/আমাদের এই বাবুইপাখির বাসায়' ('পয়লা'/আষাঢ় ; / ('যা'রে কাগজের নৌকো')।

অ্যান্টি-রোমান্টিক কবির কবিতায় এমনটাই প্রত্যাশিত। তবু, নারীর সৌন্দর্যের সঙ্গে অপস্রিয়মানতাকে যুক্ত করতে হয়েছে তাঁকেও। এই অ্যান্টি-রোমান্টিক কবিও লিখেছেন কখনো বা রোমান্টিক কবিতাও, 'কাছে-দূরে' নামে সেই কবিতায় একটি মেয়ের রূপ বর্ণিত হয়েছে, 'নেমে গেল এক্ষুণি'-র পুনরাবৃত্ত প্রয়োগের মাধ্যমে। উপস্থিতি নয়, অনুপস্থিতিই সুন্দরকে সুন্দরতর করে—এই রোমান্টিক দেখা যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাতেও একটু-আধটু রয়ে গেছে—এর জন্যে কবিকে আরো বেশি ভালোই লাগে যেন—অন্তত আমার মতো কোনো কোনো পাঠকের।

আমার মতো পাঠক অনেকেই নন। অনেকেই 'ব্যক্তিগত কবিতা'র উপর খড়্গহস্ত। 'মুখখানি যেন ভোরের শেফালি/নেমে গেল এক্ষুণি/দু-অধরে চেপে চাঁদ একফালি/নেমে গেল এক্ষুণি'—এসব পংক্তি তাঁদের হয়তো ভালো লাগবে না, তাঁরা এ কবিতায় ব্যক্তিগতত্ব গন্ধ পাবেন। কিন্তু আমার যে কবিদের ভালো লাগে, সে কবিদের ব্যক্তিগত কবিতাও আমার নৈর্ব্যক্তিক মনে হয়, আবার নৈর্ব্যক্তিক কবিতাও মনে হয় যেন ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত ভালোবাসার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে যিনি বিশ্বকে ভালোবাসার কথা বলেন, তাঁর কবিতা খুব ভালো কবিতা হতে পারে, কিন্তু তাতে কিছুটা শ্লোগানের গলা যেন থেকে যায়। নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে যিনি মানুষকে দেখছেন, সেই দেখা আমার ভালো লাগে তখনই, যখন তিনি নির্বিশেষকে নয়, দেখছেন বিশেষকে, দেখছেন ব্যক্তিগত উত্তাপ নিয়ে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় মানুষকে এইভাবে দেখার পরিচয় 'ফুল ফুটুক'-এর কবিতাগুচ্ছ থেকেই ছড়িয়ে আছে। 'ফুল ফুটুক'-এর ঠিক আগে তিনি অনুবাদ করেছেন নাজিম হিকমতের কবিতা। ব্যক্তিগত-নৈর্ব্যক্তিকে অবাধ আসা-যাওয়া আছে নাজিম হিকমতের কবিতায় ; সেই প্রভাবেই কি বদলে গেলেন সুভাষ, না কি এ তাঁর কবিদৃষ্টি, তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টির স্বাভাবিক পরিণতি? যে কারণেই হোক, 'ফুল-ফুটুক' থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় জনগণের বদলে দেখা দিল বিশেষ ব্যক্তিমানুষ—তার সুখ-দুঃখের কথা। দেখা দিল নানা রূপে নারী—মা, বোন, মেয়ে, বউ—

নৈর্ব্যক্তিকভাবেই কবি তাদেব দেখছেন, কিন্তু নির্লিপ্তভাবে নয়। মিছিলে পথ চলতে চলতে যখন কবি দেখতে পেয়েছিলেন 'মিছিলের মুখ', সে দেখা তখন ছিল ব্যক্তিগত, কিন্তু তিনি যে বাবরালির মেয়ে সালেমনকে দেখতে পেলেন মিছিলের মধ্যে, ('সালেমনের মা'), সে দেখা নৈর্ব্যক্তিক, সে দেখায় হৃদয়ের তাপ কিছু কম নয়। আর তাই, সালেমনের সঙ্গে সঙ্গে কবিও যেন খুঁজে চলেন তার মাকে, পাগল বাবরালির মেয়ে আর তার মায়ের অকথিত জীবনকাহিনী ব্যঞ্জনায় থেকে যায়— থেকে যায় আকালের দিনে অনেক মেয়ে আর মায়ের ইতিহাস। আকালের ছবি আর কীভাবে বা রূপ পেতে পারে মা-মেয়ের কান্না ছাড়া? 'মা, তোমার কোলে মরা ছেলে/তুমি কাঁদো'—'তুমি কাঁদো' বাক্যাংশটি ঘুরে ঘুরে আসে 'মা তুমি কাঁদো' কবিতায়. মায়ের এই কান্নাই যেন প্রতিবাদের ভাষার ভাষাহীন অনুবাদ।

রাজনৈতিক আন্দোলন খুব প্রকট হয় মিছিলে, প্রতিবাদের ভাষায়। কিন্তু তার একটা উল্টো পিঠ আছে। সেইদিকে আছে 'লড়াকু সংসার'। সেই সংসারেরও ছবি তুলে আনেন এখন সুভাষ তাঁর কবিতায়, সে ছবিতেও স্বাভাবিকভাবে মেয়েদেরই প্রাধান্য। সংসারকে টিকিয়ে রাখে মেয়েরাই—সব বয়সের মেয়েদেরই কিছু-না-কিছু করতে হয় সংসারের জন্যে—'একটি লড়াকু সংসার' কবিতায় আছে লড়াই-এর দুই দিকই—পুরুষ শামিল রাজনৈতিক আন্দোলনে, আর বাড়ির মেয়েরা লড়াই করছে অভাবের সঙ্গে—নাতনিকে নিয়ে ঠাকুমা সারাদিন লাইনে কয়লা কুড়োয়, আসন্নসম্ভবা বউ 'কোনো রকমে কোমর বেঁকিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ছাগলটাকে খাওয়ায়'। 'বাসি-মুখে' কবিতাব গল্পটা একটু অন্যরকম, সে এমন এক জোলা পরিবারের গল্প, যার পুরুষ কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে নয়, নেশা করে রাতভর, আর তার বৌ রাত্রে ল্যাম্প জ্বেলে পুকুরপাড়ে সুতো আছড়ায়— 'অন্ধকারকে আছড়াতে আছড়াতে/ছোট্ট বউটা ভাবে—তাহলে কালও উনুনে আঁচ পড়বে না?'

মেয়েদের দিনানুদিনের লড়াই-এর ইতিহাসের কথা সুভাষ তাঁর কবিতায় লিখে রাখেন এইভাবে। আন্দোলনে লড়াই করছে যে মেয়ে, তার কথা তো আছেই. সকলেরই জানা আছে কমরেড ইলা মিত্রকে নিয়ে তাঁর 'পারুল বোন' কবিতার কথা। কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের কাহিনীর থেকে অপ্রত্যক্ষ লড়াইয়ের কাহিনী আছে যে-সব কবিতায়, আমার ভালো লাগে সে-সব কবিতাই। 'পারুল বোন' কবিতায় ভাই-বোন সকলেই আছে লড়াই-এ, আর 'ফোঁটা' কবিতায় বোনের কথনে আছে সেই অপ্রত্যক্ষ লড়াই-এর কথা : 'কাঠ কুড়োচ্ছি বনে, ভাই রয়েছে রণে'। 'পারুল বোন' কবিতায় পারুল বোনের জন্যে ভাইদের অসীম ভালোবাসা, আর 'ফোঁটা' কবিতায়—'ভাই আমাকে নাই বা দেখুক/মারুক লাথি ঝাঁটা—ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা / যমের দুয়ারে কাঁটা।'—এ কবিতায় রাজনৈতিক উদ্দীপনার থেকে বড়ো হয়ে উঠেছে মেয়েদের সেই অপ্রত্যক্ষ লড়াইয়ের পরিস্থিতিগত বাস্তবতা।

সংসারে মেয়েদের পরিস্থিতির কত দিকই না দেখেছেন এই কবি! 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' কবিতায় পাই এক 'কালোকুচ্ছিত মেয়ে'র কথা, 'কালোকুচ্ছিত' বলেই হয়তো তার বিয়ে হয় না! 'কালোকুচ্ছিত' মেয়ের যদি বিয়েও হয়, তবুও কি তার সুখ থাকে, তাকে শুনতে কি হয় না শাশুড়ির গঞ্জনা? শুনতে হয় না : 'বাংলাদেশে ফরসা মেয়ে ছিল না?' ('মেজাজ', 'যত দূরেই যাই') সংসারে সেই কালো বউরা সে গঞ্জনার প্রতিবাদ করে না হয়তো অনেকেই, অনেকেরই সে সাহস নেই। কিন্তু এ কবিতার মেয়েটির আছে প্রতিবাদ, আছে তার রাজনৈতিক মাত্রা, সন্তানসম্ভবা হলে সে খুশির সঙ্গেই স্বামীকে বলে, 'দেখো, ঠিক আমার মত কালো হবে।' আর বলে : 'কী নাম দেবে জানো? আফ্রিকা। কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই না করছে সেখানে।' লক্ষ্মী-উর্বশীর পুরাণ-মহিমা

নস্যাৎ করে এই কবি দেখেছেন তারও মধ্যে মেয়েদের জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি, যে পরিস্থিতিতে লক্ষ্মী 'সংসারের ভাব দ্বন্দ্ব ভাল মন্দ ইত্যাকার/নানান বিষয়ে/ভাবনায় নিগূঢ় হয়ে নখ খুঁটছে', আর উর্বশী 'সারা অঙ্গে পাউডারের খড়ি মেখে', যদিও 'খালি পেটে', গেঁথে নিচ্ছে 'রাত্রির শিকার'।

এই পংক্তিগুলি যে কবিতার, তার নাম 'আলো থেকে অন্ধকারে'। আলো আর অন্ধকার—এই দুই চিত্রকল্প একেকজন কবির কবিতায় এক-এক তাৎপর্য নিয়ে আসে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাকেও আলো-অন্ধকারের বৈপরীত্য নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, 'আলো থেকে অন্ধকারে' তারই দৃষ্টান্ত। মেয়েদের বেঁচে থাকাকে আলো-অন্ধকারের বিপরীত ছবি দিয়ে সাজানোর আরেকটি দৃষ্টান্ত : 'জলায় এবার ভাল ধান হবে—/বলতে বলতে পুকুরে গা ধুয়ে/এ বাড়ির বউ এল আলো হাতে/সারাটা উঠোন জুড়ে/অন্ধকার নাচাতে নাচাতে।' তবে এই কবির সবচেয়ে প্রিয় চিত্রকল্প মনে হয় আকাশ, আর সেই আকাশের চিত্রকল্প দিয়েই মেয়েদের জীবনের ট্র্যাজেডি ব্যক্ত হয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি কবিতায়, কবিতার নাম 'পুপে'। ছোট্ট মেয়ে পুপে তার ছোট্ট হাতে 'প্রকাণ্ড নীল আকাশটা চায়/না দিলে নেয় লুফে'। কিন্তু সেই পুপে যখন বড় হয়ে সংসার পাতে, তখন দেখে তার মুঠো থেকে সেই আকাশ 'কখন গেছে উপে'!

আমরা জানি, সুভাষ মুখোপাধ্যায় একজন দায়বদ্ধ কবি। তাঁর কবিজীবনের শুরুতে তিনি হয়তো বিশেষ দলের বিশেষ মতের কাছেও দায়বদ্ধ ছিলেন, তবু দায়বদ্ধতা তখনও ছিল মানুষেরই কাছে। তারপর একদিন দলমত গৌণ হয়ে গেছে, মুখ্য থেকে গেছে শুধু মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা। আজকের দিনে শহুরে মানুষের মধ্যে নারী-পুরুষের ভাষার পার্থক্য না থাকলেও গ্রামীণ জীবনের মেয়েলি ভাষাভঙ্গি আজও পুরুষের থেকে স্বতন্ত্র। সেই মেয়েলি ভাষা সুভাষ যে এত স্বাভাবিকভাবে তুলে আনেন তাঁর কবিতায়, মেয়েদের জীবন-জগৎ সম্বন্ধে তিনি সচেতন বলেই। এ তাঁর দায়বদ্ধতারই এক পরিচয়। কবিতার কথনে তিনি মুক্ত-পরোক্ষ রীতিতে ফুটিয়ে তুলতে পারেন দ্বিস্বর—

> 'ঠিক সেই সময়
> চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
> আ মরণ! পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি!'

('ফুল ফুটুক না ফুটুক', 'ফুল ফুটুক')

শেষ পংক্তিটি কবিতার কথকের কথা, আবার সেই 'কালোকুচ্ছিৎ আইবুড়ো' মেয়েটারও কথা, যার গায়ে প্রজাপতি বসেছিল। প্রজাপতি গায়ে এসে বসা যে সম্ভাব্য বিবাহের ইঙ্গিত—এই মেয়েলি সংস্কারটুকুও জানা আছে কবির, তাই প্রজাপতিকে গাল-দেওয়া ভাষার মধ্যে দিয়ে তিনি মূর্ত করতে পেরেছেন একটি 'কালোকুচ্ছিৎ' মেয়ের ট্র্যাজেডি। কথনে দ্বিস্বর ব্যবহার কবির সহানুভূতি যেমন প্রকাশ করতে পারে, তেমনি ব্যঙ্গও প্রকাশ করে কখনো, যার দৃষ্টান্ত আছে 'মেজাজ' কবিতাটিতে : 'মিনসের আক্কেলও বলিহারি'। মেয়েলি ভাষাভঙ্গির আরো কিছু দৃষ্টান্ত :

> 'মুখপুড়িটা তাকাচ্ছে কত
> বলছে, আ মর মিনসে—'

('হিংসে')

> 'এ কি আমাদের সেই মুখপোড়া, হ্যাঁ লো।'

('পালানো', 'বাঘ ডেকেছিল')

'লক্ষ্মীর পা মাড়ায় কেটা
হ্যাদে, মোড়ল-পো না?'

('যারে', 'কাগজের নৌকা')

আমাদের লোকসাহিত্যের অনেকটা অংশ---ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা তো মেয়েদেরই রচনা—তার মধ্যে ধরা আছে মেয়েলি ভাষার নিদর্শন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যভাষার অন্যতম উৎস সেই ছড়া-রূপকথা-ব্রতকথাই। তাঁর তীব্র রাজনৈতিক বক্তব্য কত সহজে সে ভাষাভঙ্গিতে পেশ করতে পারেন তিনি! জনজীবনের সঙ্গে, সেখানকার মেয়েমহলের সঙ্গে কবির অন্তরঙ্গতার পরিচয় রয়েছে মেয়েদের জবানিতে বলা সেসব ভাষার ব্যবহারে :

'সুয়োরানী লো সুয়োরানী তোর
রাজ্যে দিল হানা
পাথরচাপা কপাল যার সেই
ঘুঁটে কুড়নির ছানা
ঘেন্নায় মরি, ছি!'

('ঠাকুরমার ঝুলি', 'একটু না বানিয়ে')

'থুৎকুড়ি দাও ছেলের বুকে
নজর না দেয় হিংসুটেরা।'

'হ্যান করব ত্যান করব
সতীন কেটে আলতা পরব...
যত সব চ্যাটাং চ্যাটাং কথা।
ঝাঁটা মারো ওদের মুখে।'

('লাফ দেওয়ার গল্প', 'ধর্মের কল')

মেয়েলি জগতের সঙ্গে এই কবির আত্মীয়তার আরো একটি দিক—মেয়েদের নানান আচার-অনুষ্ঠানের উল্লেখ। ভাইফোঁটা, আটকৌড়ে, সাধ, গায়ে হলুদ—এইসব মেয়েলি অনুষ্ঠান নানান তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর কবিতায়। প্রধান তাৎপর্য—মেয়েদের প্রতি ভালোবাসা। 'ভাইফোঁটা' কবিতায় তিনি ভাইয়ের জন্যে বোনের ত্যাগ, শ্রম, দুঃখবরণের কথা বলেছেন, 'সাধ' কবিতায় গৌরব দিয়েছেন কুমারীর মাতৃত্বকে।

জনসাধারণের প্রধান অংশ নারী, আর সংসারে দুঃখবহনের দায়িত্ব তাদের ঘাড়েই বেশি—জনসাধারণের প্রতি দায়বদ্ধ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কলমে তারই পরিচয় আছে, নেই—কবিতা সিংহ যাকে বিদ্রূপ করে বলেছেন 'কবিতায় রমণী ব্যবসা'।

১৯৯৮

পরিশিষ্ট

রামমোহন এবং আজকের নারীভাবনা

সতীদাহ-নিবারণ নিয়ে রামমোহনের প্রয়াসের কথা সকলেই জানি আমরা, কিন্তু কমজনেরই জানা আছে তাঁর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাজানো রামমোহনের যুক্তিক্রমের কথা, কমজনেরই পড়া আছে সতীদাহ বিষয়ে তাঁর বিতর্কমূলক নিবন্ধ কিংবা চিঠিপত্রাদি। সতীদাহ-প্রথাকে কেন্দ্র করে সে-সব বাদ-প্রতিবাদ, তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নারী-পুরুষ সম্বন্ধে তৎকালীন ভারতীয় সভ্যতার মনোভঙ্গি আর তার পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহনের বৈপ্লবিক নারীভাবনা। সে ভাবনায় আজকের দিনের নারীমুক্তি-আন্দোলনের সূত্রগুলিও খুঁজে নেওয়া যায়।

সতীদাহ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের 'দ্বিতীয় সম্বাদ'টির মূল বিতর্ক ছিল সতীদাহ হত্যা না আত্মহত্যা—এই বিষয়টি নিয়ে। রামমোহনের প্রতিপক্ষ বলতে চান মেয়েরা স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় আরোহণ করেন। তাঁরা রামায়ণ-মহাভারত থেকে কতগুলি সহমরণের দৃষ্টান্ত দেন। রামমোহন দেখান সেই প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তে নারী স্বয়ং জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করেছেন, তাঁদের অন্য কেউ বেঁধে-ছেঁদে চিতায় তুলে দেয়নি। অর্থাৎ সে দৃষ্টান্তগুলি প্রকৃতই আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত, স্ত্রীবধের দৃষ্টান্ত নয়। পক্ষান্তরে, রামমোহন দাখিল করেন কী পদ্ধতিতে এ যুগের মেয়েদের চিতায় তোলা হচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ। মেয়েদের প্রথমে স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে তারপর চিতায় স্থাপন করা হয়, তার উপরে চাপানো হয় মন মন কাঠ—এ পদ্ধতিকে স্ত্রীহত্যা বলাই সমুচিত। রামমোহন ব্রহ্মহত্যা, পিতৃহত্যা ইত্যাদি অপরাধের সঙ্গে এই স্ত্রীহত্যাকে একই মাত্রার অপরাধ বলে গণ্য করেন। সতীদাহকে হত্যা বলে প্রতিপন্ন করার সঙ্গে-সঙ্গেই রামমোহন যেন বুঝিয়ে দেন সমাজে 'পুরুষ-প্রাবল্যে'র স্বরূপ, বুঝিয়ে দেন—নারী-পুরুষ সম্পর্ক ক্ষমতার সম্পর্ক, তাই ক্ষমতাবান পুরুষ পারে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নারীর প্রতি এতবড়ো প্রঘাত (Violence) হানতে। উনিশ শতকের একেবারে গোড়ায়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে রামমোহন এই পৌরুষ-ক্ষমতার দাঁত-নখ বুঝে নিয়েছিলেন, বুঝে নিয়েছিলেন ক্ষমতাটাই আসল কথা, ধর্ম তার একটা বহিরাবরণমাত্র। লর্ড বেন্টিঙ্ককে লেখা চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন সে কথা : '...with a view to prevent every possibility of the widows forming subsequent attachments, they availed themselves of their arbitrary power and under the cloak of religion, introduced the practice of burning widows alive under the first impressions of sorrow or despair, immediately after the demise of their husbands.'

ধর্মের নাম করে পুরুষতন্ত্রের এই জঘন্য লোকাচারের বিরুদ্ধে রামমোহনের জেহাদ তাঁর ধর্মসংস্কারেরই এক দিক—এমন ভাবা যায়। কিন্তু পুরুষ-প্রাবল্য শুধু সমাজপতিদের মধ্যেই দেখেননি রামমোহন, দেখেছেন 'রাজদ্বারে'ও—স্বামীর দ্বারা অত্যাচারিতা স্ত্রী যদি স্বামীর সঙ্গে পৃথক হবার জন্যে গৃহত্যাগ করে, তবে 'রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহাদিগকে সেই সেই পতিহস্তে আসিতে হয়, পতিও সেই পূর্বজাত ক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখনো-বা ছলে প্রাণ বধ করে।' তাহলে স্বামীর মৃত্যুর পরে মেয়েদের হত্যা করা হয় শুধু নয়,

পুরুষের সেই সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় ক্ষমতা রয়েছে, যাতে স্বামীর ক্রোধ হলে সে ছলে প্রাণ বধ করতে পারে স্ত্রীর! নারী-পুরুষ সম্পর্কের মধ্যেকার লিঙ্গরাজনীতিকে যেভাবে চিনে নিয়েছিলেন রামমোহন, সেভাবে তাঁর সময়ের ধারে-কাছে আর কোনো সংস্কারক—দেবেন্দ্রনাথ অথবা বিদ্যাসাগরকে বলতে শুনি না। সমাজে মেয়েদের নিপীড়ন নিয়ে অনেক ভেবেছেন বিদ্যাসাগর, তার মূলে তিনি দেখেছেন নিপীড়নকারী সামাজিক প্রথাগুলিকে,—বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবার অ-বিবাহ এবং সুকঠিন জীবনচর্যা—এইসব প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু রামমোহন যেভাবে 'পুরুষ-প্রাবল্য'কে দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনযাত্রায় চিহ্নিত করেছেন, সেভাবে বিদ্যাসাগর ভাবেননি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সাম্য' প্রবন্ধে ১২৮২ সালে বলতে পেরেছিলেন সেই লিঙ্গরাজনীতির কথা, বলতে পেরেছিলেন—'যদি স্ত্রী দাসী পুরুষ প্রভু ইহাই বিচারসংগত হয়, তবে বাঙালি দাস, ইংরেজ প্রভু, এটিও বিচারসংগত হবে।' নারী-পুরুষ সম্পর্ক যে ক্ষমতা সম্পর্ক একথা বুঝেছিলেন তরুণ রবীন্দ্রনাথও। ইংরেজ-প্রভুত্বের মূলে যেমন আছে বাঙালির দুর্বলতা, পুরুষ-প্রভুত্বের মূলে তেমনি আছে নারীর প্রাকৃতিক দুর্বলতা—তার জন্যে পুরুষকে দায়ী করা ঠিক নয়—কৃষ্ণভাবিনী দাসের লেখার সমালোচনা-সূত্রে এরকম বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

নারী যে পুরুষের থেকে শারীরিক ক্ষমতায় দুর্বল, একথা মেনেছেন রামমোহনও। কিন্তু দুর্বল বলেই সবল তার উপর প্রভুত্ব ফলাতে পারে এমন যুক্তি রবীন্দ্রনাথ দিলেও রামমোহন দেননি। বরং নারী স্বাভাবিকভাবে সমাজে যে স্থান পাবার অধিকারী ছিল, তাকে দুর্বল জেনেই পুরুষ তার থেকে তাকে বঞ্চিত করে এসেছে চিরকাল, আর তারপর বলেছে নারী সে-পদের যোগ্য নয়—এর জন্যে পুরুষের সবলতাকে নিন্দাই করেছেন রামমোহন।

সতীদাহ বিষয়ে প্রথম বাংলা পুস্তিকাটিতে রামমোহন এক কাল্পনিক প্রতিপক্ষ খাড়া করেছিলেন, কিন্তু বাস্তব-প্রতিপক্ষকে জেনেবুঝেই তার মতামত তিনি কাল্পনিক প্রতিপক্ষের মুখে বসিয়েছেন। তাঁর সেই বাস্তব-প্রতিপক্ষ তো আমাদের এই এতকালের প্রাচীন সমাজ, যে সমাজের বিধানদাতাদের মেয়েদের বিষয়ে কতগুলি স্থির ধারণা আছে, তার একটি হলো—মেয়েদের সংরাগ খুব প্রবল, স্বামীর শাসনে তারা সংযত থাকে, স্বামীর মৃত্যু হলে তারা ব্যভিচার করবেই! রামমোহন এর উত্তরে বলতে পেরেছিলেন—একা নারীই যে কামনার বশবর্তী হয় তা নয়, 'কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই জানি যে কি পুরুষ কি স্ত্রী স্বভাবসিদ্ধ কামক্রোধ লোভেতে জড়িত হয়েন।' নারী-পুরুষের এই সমতার কথা যে রামমোহন বলতে পেরেছিলেন, সে যুগের পক্ষে এ রীতিমতো বৈপ্লবিক। শুধু প্রবৃত্তিগত দিকেই নয়, নিবৃত্তিগত দিকেও সমতার কথা বলেছিলেন রামমোহন। বলেছিলেন স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা জাগতে পারে, উভয়ের জন্যেই 'পরমেশ্বরের স্মরণ মনন' করার শাস্ত্রবিধি আছে। যে যুগে জ্ঞানচর্চায় মেয়েদের কোনো অধিকার ছিল না, এমনকি বিদ্যাশিক্ষার ইচ্ছে করাটাও অপরাধ বলে গণ্য হতো, সেই যুগেই রামমোহন বলেছিলেন নারীর মননযোগ্যতা পুরুষের সমানই, জ্ঞান ও ধর্মে নারী-পুরুষের সমান অধিকার আছে।

রামমোহন যে বীজ উপ্ত করলেন, তার বিকাশ ঘটতে লাগল সমাজে, রামমোহনের এই লেখার পঞ্চাশ বছর পরে একজন লেখিকাও এই সম-অধিকারের কথা লিখতে পারলেন, মধুমতী গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জ্ঞান ও ধর্মে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার' নামে সেই লেখা, যেখানে লেখিকা বলতে পারলেন '...সর্বমঙ্গলকরের ইহা কখনই অভিপ্রায় নহে যে পুরুষেরাই জ্ঞান-জনিত বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করিবেন আর আমরা যাবজ্জীবন অজ্ঞানতা নিবন্ধন অতি কষ্ট সহ্য করিব।'

অথচ মেয়েদের যে ধর্মভয় নেই, স্বামীর মৃত্যুর পরে তারা অধর্মের পথে চলবেই, তাই

তাদের পুড়িয়ে মারাই উচিত—এই তো ছিল সনাতন হিন্দু সমাজের অভিমত! রামমোহন মেয়েদের ধর্মবোধে আস্থা রেখে সহমরণের পরিবর্তে রাখতে চেয়েছেন বৈধব্যের ব্রহ্মচর্যের কঠোর সাধনকে। কারো মনে হতে পারে, এইখানেই সমাজ-সংস্কারের থেকে ধর্ম-প্রচারক বড় হয়ে উঠেছেন; হিন্দুশাস্ত্রকে, মনুর বিধানকে রামমোহন বড় বেশি মান দিয়েছেন। বৈধব্যের ব্রহ্মচর্য পালনকে রামমোহনের এত মহিমা দেওয়ার ফলে বিধবা-বিবাহ প্রচার করার প্রয়াসে বিদ্যাসাগরকে হয়তো কিছুটা অসুবিধেতেই পড়তে হয়েছিল—এমন অনুমান করেছেন সুমিত সরকার। উনিশ শতকের মেয়েদের লেখায় দেখি বৈধব্যের নিষ্ঠুর বিধি-বিধান, বিশেষত একাদশীর নির্জলা-উপবাসের প্রাণান্তকর পরিণাম নিয়ে হাহাকার, কেউ কেউ এমনও বলেছেন সহমরণ-প্রথা কেনই-বা তুলে দেওয়া হল, বৈধব্য যন্ত্রণায় তিল তিল করে মরার থেকে একেবারে সরাসরি মৃত্যুই বরং ভালো। রামমোহন সেই বৈধব্যের কৃচ্ছ্রসাধনকে ধর্ম-পালনের দিক থেকে দেখেছেন, সমাজের বাস্তবতার দিক থেকে দেখেননি—তাঁর 'প্রবর্তক-নিবর্তক সংবাদ' পড়ে এরকমই মনে হতে পারে কারো। কিন্তু কথাটা কি এই নয় যে সহমরণরূপ অমানুষিক প্রথার মূলোচ্ছেদ করতে চেয়ে বৈধব্যের কঠোর বিধির গুণগান করা অপরিহার্য ছিল রামমোহনের পক্ষে? মনুস্মৃতি বৈধব্যের ব্রহ্মচর্যের বিধান দিয়েছেন কাজেই মনু সহমরণ বিধি দেননি—পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কের খাতিরে এভাবেই যুক্তি সাজাতে হয়েছে রামমোহনকে। কিন্তু অন্যত্র, যেখানে তিনি আবেদন করেছেন ইংরেজ রাজপুরুষের কাছে, সেখানে বিধবাদের যে-তিনটি গতির কথা উল্লেখ করছেন, তার মধ্যে বিধবার ব্রহ্মচর্য পালনের মহান গতি আদৌ কোথাও নেই। রামমোহন উল্লিখিত সেই তিনটি গতি হলো : ১. আত্মীয়স্বজনের ক্রীতদাসী হয়ে কায়ক্লেশে বেঁচে থাকা, আরেক স্বামীর আশ্রয় পাবার কোনো আশা-ভরসা না রেখেই (বিধবা-বিবাহের ঔচিত্যই কি ইঙ্গিতে বলতে চাইছেন না এখানে রামমোহন?) ; ২. ভরণপোষণের জন্য কুলের বাইরে গিয়ে অবৈধ জীবনযাপন করে স্বাধীনতা অর্জন করা ; ৩. স্বামীর চিতায় প্রাণ-বিসর্জন দেওয়া। একথাগুলি যে নিবন্ধে রয়েছে, তার নাম : 'Modern Encroachments on the ancient Rights of Females, according to Hindu law of inheritance'. সে-সময়ে শাস্ত্র-প্রদত্ত অর্থনৈতিক অধিকার থেকে কীভাবে বঞ্চনা করা হয়েছিল মেয়েদের, তারই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এখানে রামমোহন। যে জননী সংসারের কর্ত্রী ছিলেন আজ, স্বামীর মৃত্যুর পর কালই তিনি হয়ে যান সর্বরিক্ত, পুত্রবধূর গঞ্জনা সহ্য করে কোনোমতে বাঁচতে হয় তাঁকে, কেননা স্বামীর সম্পত্তিতে তাঁর অধিকার নেই। আবার মেয়েরাও তো ছিল পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। ধনী ঘরের মেয়ে, বিয়ে হয়েছে এমন মানুষের সঙ্গে যার একাধিক স্ত্রী আছে অথচ সংসার প্রতিপালনের সামর্থ্য নেই,—টাকার তার একান্ত প্রয়োজন থাকলেও বাবার রেখে-যাওয়া অগাধ সম্পত্তিতে কোনো অধিকার নেই তার—যদি একজন ভাইও বেঁচে থাকে! পিতৃতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক বঞ্চনার ফলে মেয়েদের দুর্গতির এসব বিবরণ সেযুগে রামমোহনই আলোচনার যোগ্য বলে বিবেচনা করেছিলেন, আর কেউ করেননি।

অর্থনৈতিক বঞ্চনা শুধু নয়, অর্থনৈতিক শোষণের দিকটিও নির্দেশ করেছিলেন রামমোহন প্রবর্তক-নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদে। বিবাহের সময় স্বামী স্ত্রীকে অর্ধেক অঙ্গ বলে স্বীকার করেন, অথচ ব্যবহারের বেলায় প্রকট হয় শাসক-শাসিত সম্পর্ক, যে সম্পর্কে শোষণ থাকবেই। স্বামীগৃহে স্ত্রীরা যে বিনা-বেতনে দাসীবৃত্তি করে, রামমোহন তাদের কাজের তালিকা ধরে ধরে তা দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই সঙ্গে 'সূপকারের কর্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে'—সেও তো বলতে ভোলেননি। 'বিনা বেতনে' পদবন্ধের প্রয়োগ থেকে বুঝতে পারি রামমোহনের ভাবনায় গৃহশ্রমের

মূল্য ছিল, এখন পশ্চিমে নারীবাদীরা যা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। গৃহে নিছক শ্রম দিয়েও অবশ্য বধূ রেহাই পায় না, কাজের ত্রুটি ধরে স্বামী আর তার আত্মীয়-স্বজনরা কঠোরভাবে তর্জন করে তাকে, সকলের খাওয়া শেষ হলে তবে বাড়ির বউ খেতে বসে, অনেক সময় খাদ্যবস্তু উদর-পূরণের যোগ্যও থাকে না। ঘরের কাছে ঘরের মানুষের এই বলি রামমোহন আবেগভরা ভাষায় বর্ণনা করেছেন। উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে আর কোনো পুরুষ এভাবে বলেননি, মেয়েরা যখন ছাপার জগতে স্থান পেলেন তখন তাঁরা বললেন। সংসার আর উপর্যুপরি সন্তান-জন্মের ঝক্কি সামলে কীভাবে মেয়েদের দিনের পর দিন অনাহারে কেটে যায়, আর তার খবরও রাখে না কেউ—তার বিবরণ দিয়েছেন রাসসুন্দরী দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে। বাংলায় যে মহিলা প্রথম মননমূলক গদ্য লিখেছেন, সেই বামাসুন্দরী 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত একটি পত্রে লিখেছেন : 'যাহার নিকট বিলাপ করিতেছ তিনি এই হতভাগ্য দেশের পুরুষ জাতি! তিনি তোমার দুঃখে দুঃখিত হইবেন, তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলে? স্ত্রীজাতির দুঃখে যদি তাঁহারা দুঃখিত হইতেন, তবে হতভাগিনীদের এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। তাঁহারা দুঃখিত হইবেন কেন? তাঁহাদের চাকরাণীর কাজ, রসুয়ের কাজ অনায়াসে চলিয়া যাইতেছে। তাঁহারা আমাদের দুঃখমোচনের চেষ্টা কেন করিবেন?' রামমোহনের লেখা থেকেই সম্ভবত ভাষা পেয়েছিলেন বামাসুন্দরী।

রামমোহনের সমসময়ে না হলেও উনিশ শতকের শেষের ভাগে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন বটে : 'পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী : স্ত্রী জল তুলে, রন্ধন করে, বাটনা বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতনভোগিনী দাসীর কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বনিতা দুহিতার সংসারে তাহাও ছিল না।' কিন্তু এই বঙ্কিমচন্দ্রই যখন দেখছেন শহরে নব্য মেয়েরা লেখাপড়া করছে, সেলাই করছে আর সংসারের কাজ করছে পরিচারিকা, তখন সেটা তাঁর আদৌ পছন্দ হচ্ছে না। তিনি লিখছেন, 'প্রাচীনারা নিতান্ত ধনী না হইলে জল তুলিতেন, বাসন মাজিতেন, উঠান ঝাঁট দিতেন ; রন্ধন তাঁহাদের জীবনের প্রধান কার্য ছিল। এ কিছু বাড়াবাড়ি, নবীনদিগের এতদূর করিতে আমরা অনুরোধ করি না ; যাহার যেমন অবস্থা, সে তদনুসারে কার্য করিলেই যথেষ্ট ;' বঙ্কিমচন্দ্র যখন আজকের মেয়েদের 'আলস্যে'র অপবাদ দেন, যেহেতু তারা কার্পেটে ফুল তোলে এবং 'সীতার বনবাস' পড়ে, তখন বোধহয় বাঙালি শহুরে পুরুষের মধ্যদেশ-স্ফীত তৈলঢালা স্নিগ্ধ তনুর কথা তাঁর মনে থাকে না, কেননা তাঁরা যে অফিস যান মস্ত কাজ করেন। মেয়েরা লেখনী ধরলে তবেই পুরুষের আলস্যের পরিচয় প্রকাশ্য যে হতে পারে, তার প্রমাণ বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন'। এই লেখায় লেখিকা এক বিপরীত জীবন-ছবি কল্পনা করেছেন, এক আজব রাজ্যের বর্ণনা দিয়েছেন, যে রাজ্যে পুরুষেরা থাকে চার দেয়ালে বন্দি হয়ে, ঘর সংসারের কাজকর্ম করে, আর মেয়েরা অফিসের কাজ করে, কিন্তু সে-কাজ সারতে তাদের দু-ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না, সে-কাজ শেষ করে তারা সেলাই-বোনাও করতে পারে। রোকেয়া এইভাবে কৌশলে বুঝিয়ে দিলেন বাস্তব দুনিয়ায় পুরুষদের কাজের কত বহর! বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'প্রাচীনা ও নবীনা' রচনাটিতে যে স্ত্রী 'আপনার ভিন্ন কাহারও সুখ বৃদ্ধি করিলেন না ;' তাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু অন্য কোনো লেখায় একই কারণে পুরুষদের গলায় দড়ি দিতে বলেননি কোথাও।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীনা ও নবীনাদের মধ্যে এভাবে পার্থক্য করেছেন—প্রাচীনাদের পাতিব্রত্যের মূলে ছিল ধর্মভয়, আর নবীনাদের পাতিব্রত্যের মূলে আছে লোকভয়। অথচ রামমোহন দেখিয়েছেন মেয়েদের এই ধর্মভয়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে কত মানসিক নির্যাতন। স্বামী যদি গরিব হয় তবে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে আর সেইসঙ্গে তিরস্কার সহ্য করে মেয়েরা সেই ধর্মভয়ে, আর স্বামী

যদি বড়লোক হয় তবে স্ত্রীর জ্ঞাতসারে তার চোখের সামনেই স্বামী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, স্ত্রী সহ্য করে—ধর্মভয়ে। যে স্বামী দু-তিনটি বিবাহ করে তার স্ত্রীরা সকলেই মনস্তাপে দিন কাটায়। তদুপরি স্বামী কখনো এক স্ত্রীর হয়ে অন্য স্ত্রীকে তিরস্কার করে—এ সবকিছুই বিনা প্রতিবাদে মেয়েরা সহ্য করে—ধর্মভয়ে। মেয়েরা যদি কখনো এসব নির্যাতনের প্রতিবাদ করে, তাহলেই প্রমাণ হয়ে যায় তারা অসতী, তাদের ধর্মভয় নেই!

মেয়েদের ধর্মভয় নেই—সহমরণের পক্ষের সমাজপতিদের এই মন্তব্যের সূত্রেই রামমোহন এত বিস্তারিতভাবে ধর্মভয়ে মেয়েদের চরম সহিষ্ণুতার বিবরণ দিয়েছেন। সমাজপতিদের আরো একটি অভিযোগ নাকি ছিল,—মেয়েরা বিশ্বাসঘাতক! এ তো অবশ্য শেক্স্পিয়রের মতো মহাকবিও তাঁর নাটকের পাত্রের মুখে বলেছেন—'Frailty, thy name is woman'. রামমোহন জানাচ্ছেন আসল সত্য কী—প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে রামমোহন যথার্থভাবেই হিসেব করেছেন প্রতারিত পুরুষ অপেক্ষা প্রতারিত নারীর সংখ্যা দশগুণ বেশি। কিন্তু পুরুষ লেখাপড়া জানে বলে মেয়েদের প্রতারণার কথাই জাহির হয়। মেয়েরা কলম না ধরলে পুরুষদের বেইমানির কথা আর জানা যাবে কোথা থেকে! তাই রোকেয়া মেরী করেলির লেখা ডেলিসিয়া হত্যাকাহিনী বাংলায় রূপান্তরিত করলেন। তাঁর 'পদ্মরাগ' উপন্যাসটিও তো পুরুষ-প্রতারণার হাজার দৃষ্টান্তে ভরা! পুরুষ-প্রতারণা যে যে-কোনো দেশের যে-কোনো সমাজেই প্রবল তা বোঝা যায় রামমোহনের পর্যবেক্ষণ বিষয়ে কলেট-এর মন্তব্য থেকে—'I..must first call attention to one golden sentence concerning the relative trustworthiness of the two sexes which is, alas! not applicable to India alone.' বোঝা যায় কেন রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা'য় রামমোহনের সেই 'প্রবর্তক ও নিবর্তক' বিষয়ে দ্বিতীয় অংশের শেষ অংশ পুরোটা উদ্ধৃত করে বলেছিলেন—'রামমোহন রায় স্ত্রীজাতির যেরূপ উকিল ছিলেন এমন বোধহয় সুবিখ্যাত মিল সাহেবও নহেন।'

বস্তুতই, উনিশ শতকের বাংলায় যাঁরা মেয়েদের বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রামমোহন শুধু যে প্রথম, তাই নন, রামমোহন পৃথকও। উনিশ শতকের শেষদিকে জাতীয়তাবাদী নেতাদের ভাবনায় মেয়েদের সমস্যা-বিষয়ে প্রশ্নগুলি বাদ পড়ে যায়। তার কারণ ছিল দুটি। প্রথমত, তাঁরা চাইছিলেন মেয়েরা ঘরের মধ্যে থেকে তাঁদের প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে অটুটভাবে ধরে রাখুক, যখন বাইরে তাঁদের প্রতিদিন সইতে হচ্ছে বিদেশী প্রভুর হাতে অধীনতার অপমান। দ্বিতীয়ত, সে সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কেউ কেউ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলেন এদেশের শিক্ষিত মেয়েদের ভাবনাজগতে পশ্চিমী নারীবাদের প্রভাব পড়তে দেখে। সেই সময় খুব অল্প কয়েকজন মেয়ে নিজেরাই নিজেদের বিষয়ে লিখতে শুরু করলেন। মেয়েদের অবস্থার উন্নতির জন্য পুরুষদের ওকালতির আর প্রয়োজন থাকল না। নানা কারণে মেয়েদের অবস্থাও একটু একটু করে পাল্টে যেতে লাগল। স্বাধীনতা-আন্দোলনে নানাভাবে মেয়েরা সামিল হলেন, রাষ্ট্রশক্তির মোকাবিলা করলেন, দু-দুটো মহাযুদ্ধ গেল, দেশ স্বাধীন হলো, তার সঙ্গে টুকরোও হলো, মেয়েদের ঘর ছেড়ে বাইরের বেঁচে থাকার লড়াইতেও যোগ দিতে হলো, পরিবারের অর্থনৈতিক দায় বহন করে। সমাজে বদল এল অনেক, কিন্তু সে নিছক বাইরের দিকে থেকে। উপনিবেশ-উত্তর ভারতে আজ মেয়েদের আইনগত সুযোগ-সুবিধে অনেক। পুরুষের এক-বিবাহ আইন, বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন, পণ-প্রথা নিবারক আইন, সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন—সবকিছুই তো মেয়েদের অধিকারকে মান দেয়। কিন্তু সমস্যাটা এই যে, অল্প কজন মেয়েই এইসব আইনগত অধিকার ঠিক-ঠিক অর্জন করতে

পারে। মেয়েদের বাইরের জীবনছবি বদলালো ঢের, কিন্তু দেশের অনেকটা বড়ো অংশেই পুরুষতন্ত্রের মূল্যবোধ তো আজও অবিচল, অনড়। আজও খবরের কাগজে 'পাত্রী চাই' স্তম্ভের বিজ্ঞাপনের ভাষা বুঝিয়ে দেয় বিবাহের মাধ্যমে পাত্র তার মনের দোসর চাইছে না, চাইছে গৃহকর্ম-নিপুণা এক পরিচারিকা, তবে সেইসঙ্গে তাকে আবার সুন্দরীও হতে হবে, অন্দরে যে পরিচারিকা, সদরে তাকেই আবার পাত্রের ইজ্জত বাড়ানোর প্রয়োজনেও ব্যবহার করা হবে! বিজ্ঞাপনে যেটা লেখা থাকে না, কিন্তু বিবাহের প্রধান যা শর্ত, পাত্রপক্ষ সেই প'ণ উশুল করতে কখনোই ভোলে না। (না যদি পারে তবে তো বধূটিকে পুড়িয়ে মারলেই হয়, তারপর আবার বিবাহের আয়োজন, এমনভাবে দেখেশুনে, যাতে হাতে-হাতে পণ আদায় হয়!) একজন রূপ কানোয়ারকে স্বামীর চিতায় পোড়ানো হয়েছে, কিন্তু স্বামীর হাতে পুড়ছে এখানে-সেখানে কত সতীসাধ্বী! আবার পুরুষপ্রবল সমাজ ডাইনি অপবাদ দিয়েও পুড়িয়ে মারছে কত মেয়েকে!

বিশ শতক শেষ হতে চলল, আসছে নতুন শতাব্দী, উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠছি আমরা, অনেকদিন থেকে অনেক মেয়েই বেঁচে থাকার উন্নততর পরিস্থিতি পেয়েছে বইকী আজ! রামমোহন যে নারী-পুরুষের মানসক্ষমতার সমত্বর উপর আস্থাজ্ঞাপন করেছিলেন, আজ তা প্রমাণিত, অনেক পরীক্ষাতেই মেয়েরা ছেলেদের সমান ভালো ফল দেখাতে পারছে। কিন্তু সব সত্ত্বেও রামমোহনের অনেক পর্যবেক্ষণ আজকের পরিপ্রেক্ষিতেও সত্যি। বিশেষ করে মেয়েদের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের ভয়াবহতা আজও তো যথেষ্ট। তফাত ঘটেছে একটা জায়গায়—আজ আর কোনো রামমোহনের প্রয়োজন নেই, মেয়েরা নিজেরাই লড়ছে তাদের নিজেদের লড়াই। যে শাস্ত্রবাক্য রামমোহনের প্রধান অস্ত্র ছিল, মেয়েরা আজ ফিরিয়ে দিতে চায় পুরুষরচিত সেই স্মৃতিশাস্ত্র, কেননা তারা জানে, যেমন রোকেয়া লিখেছেন, কোনো স্ত্রী-মুনি থাকলে তাদের বিধান হতো অন্যরকম। মেয়েরাও যে ব্রহ্মলাভ করতে পারে, তার সমর্থনে রামমোহন গীতা উদ্ধৃত করেছিলেন, যেখানে বলা হয়েছে—বৈশ্য, শূদ্র এবং নারীর মতো পাপযোনিও সাধনা করলে পরমপুরুষকে লাভ করতে পারে। আজ শূদ্র বা নারী কেউ আর নিজেদের পাপযোনি বলে মানতে রাজি নয়। তারা তাদের পৌরাণিক ঐতিহ্যগত পরিচয়কে প্রত্যাখ্যান করে আজ। রামমোহন যখন মেয়েদের গৃহশ্রমের ফিরিস্তি দিচ্ছিলেন, তখন ধরে নিয়েছিলেন ঐ শ্রম কোনো নিম্নশ্রেণীর বেতনভোগী পরিচারকের হওয়া উচিত। কিন্তু আজকের মেয়েরা গৃহশ্রম ভাগ করে নিতে চায় গৃহের পুরুষ সদস্যের সঙ্গেই—যা রামমোহন সম্ভবত ভাবতে পারতেন না। তাই বলি, আজ কোনো পুরুষের কাছ থেকে নয়, মেয়েরা আজ নিজেরাই অর্জন করে নিতে চায় নিজেদের সত্য, কোনো পুরুষের স্বর নয়, মেয়েরা আজ খুঁজে বেড়াচ্ছে নিজের স্বর।

১৯৯৮

উনিশ শতকের নারী-আলোচনা
এবং
স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত 'ভারতী'

উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকায় নারী-প্রসঙ্গ একটু বেশিমাত্রাতেই গুরুত্ব পাচ্ছিল, কেননা সমাজ-আলোচনার কেন্দ্রে তখন ছিল নারী। সতীদাহ, বিধবার কঠোর ব্রহ্মচর্য-পালন, বাল্যবিবাহ আর বহুবিবাহ, অবরোধের কঠোরতা—এইসব সামাজিক প্রথার বলি ছিল নারীই। এসব প্রথার সংস্কার-প্রচেষ্টার পক্ষে ছিলেন কেউ কেউ, বিপক্ষে ছিলেন অনেকেই। দুই পক্ষের বাদ-প্রতিবাদ চলতেই থাকত পত্র-পত্রিকায়। নারীশিক্ষা ছিল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বিষয়। নারীর শিক্ষালাভ আদৌ উচিত না অনুচিত, শিক্ষা যদি-বা দেওয়া হয় তবে কোথায় দেওয়া হবে, অবরোধের বাইরে গৃহললনাদের চলাফেলা উচিত না অনুচিত, নারীশিক্ষার সীমা থাকবে কোন্‌খানে—এই সবকিছুই আলোচ্য বিষয় ছিল পত্র-পত্রিকায়।

কিন্তু 'ভারতী'-তে নারী-আলোচনার সূত্রপাত হলো একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। সে দৃষ্টিকোণ তরুণ রবীন্দ্রনাথের। ইয়োরোপের সমাজে মেয়েদের সর্বত্র উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করে তিনি অনুভব করেছিলেন মেয়েদের অনুপস্থিতি আমাদের সমাজ এবং পরিবার জীবনে কতটা ক্ষতিকর। তরুণ ভ্রাতার মতামতের উপর সম্পাদকের কাঁচি চালাননি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিন্তু সম্পাদকীয় মন্তব্যে সে-সব মতামতের বিরোধিতা করতেও ছাড়েননি। দুই ভাইয়ের মত-বিরোধিতা থেকে আরেক জাতের নারী-আলোচনার সূত্রপাত হলো, যার ভর নারী-বিষয়ে নিছক সামাজিক প্রথা নয়, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি।

কিন্তু এই আলোচনার আর কোনো অগ্রগতি দেখা যায়নি 'ভারতী'র পাতায়, দ্বিজেন্দ্রনাথের আমলে। তরুণ রবীন্দ্রনাথও যুবক হলেন, আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকপদে বৃত হলেন, সংসারী হলেন, জমিদারির দায়িত্ব নিলেন। নারী-বিষয়ে তাঁর মনোভঙ্গি ততদিনে কতই না অন্য জাতের হয়ে উঠল—'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'র তুলনায়। তাঁর সেইসব মতামত প্রকাশ পেতে পেতে পালটে গেছে 'ভারতী'র সম্পাদকপদ, দ্বিজেন্দ্রনাথের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন স্বর্ণকুমারী, ১২৯১ সাল থেকে।

২.

স্বর্ণকুমারী যখন 'ভারতী'-সম্পাদনা শুরু করলেন, তখন তাঁর সম্পাদনার লক্ষ্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি নারী-আলোচনা বিষয়ে কোনো কথাই তোলেননি, তিনি নিজে নারী হওয়া সত্ত্বেও। কিংবা হয়তো তিনি নিজে নারী বলেই। মননের জগৎ একান্তভাবে পুরুষেরই জগৎ আর

মেয়েদের জগৎ হলো আবেগের জগৎ—নারী-পুরুষের এলাকার এই স্পষ্ট বিভাজন পশ্চিমী দুনিয়া থেকে আরম্ভ করে সভ্যজগতের সর্বত্রই ঘোষিত ছিল সে-সময়। হয়তো সেই কারণেই, এই বিভাজন যে পুরুষতন্ত্রের মনগড়া—এইটেই হয়তো দাখিল করতে চাইছিলেন স্বর্ণকুমারী। আট পৃষ্ঠা দীর্ঘ তাঁর সেই সম্পাদকীয়তে মাসিক পত্রিকার উদ্দেশ্য যে 'মানসিক সৌষ্ঠব বিধান', এইটুকুমাত্র নির্দেশ করে তার সূত্র ধরে স্বর্ণকুমারী একে একে মনের বিবিধ বিভাগ এবং তাদের অন্যতম যে জ্ঞান—তার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যে নারীকে পুরুষতন্ত্র জ্ঞান-রাজ্য থেকে বহিষ্কার করেছেন, সেই নারীরই সামর্থ্য রয়েছে জ্ঞানের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার—১২৯১ সালেই স্বর্ণকুমারী তার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। আর এইভাবে, নারী-আলোচনা সে সম্পাদকীয়তে না তুলেও, স্বর্ণকুমারী উনিশ শতকের নারী-আলোচনায় বিশেষ একটি স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন, স্থাপন করেছিলেন নারীর পত্রিকা সম্পাদনার ইতিহাসে বিশেষ একটি দৃষ্টান্ত।

জ্ঞানের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে স্বর্ণকুমারী জ্ঞানের তিনটি সোপান উল্লেখ করেছেন—প্রত্যক্ষ জ্ঞান, কাল্পনিক জ্ঞান আর সামান্য জ্ঞান। সেইসঙ্গে তিনি এও জানিয়েছিলেন—'তিনটির একসঙ্গে উন্নতি হয় বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে।' বিজ্ঞানচর্চার কথা বলছে কোনো মেয়ে! উনিশ শতকের পটভূমিতে এ কি একান্তই আশ্চর্য ঘটনা নয়? জ্ঞানচর্চায় তবু প্রাচীন ভারতের গার্গী-মৈত্রেয়ীর নাম শোনা আছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানচর্চায় আবার কবে কোন্ মেয়ে নিয়োজিত হয়েছে! মেয়েরা যে প্রকৃতি-স্বরূপিণী আর বিজ্ঞান যে প্রকৃতিবিরোধী! স্বর্ণকুমারী যখন তাঁর সম্পাদকীয়তে লেখেন : 'আমরা এখন হইতে বিজ্ঞানের মাত্রা কিছু বাড়াইতে ইচ্ছা করি—', তখন তার পিছনে, নারীর সাংস্কৃতিক লিঙ্গ-প্রতিমাকে আঘাত করার সচেতন প্রয়াস তাঁর ছিল বলেই মনে হয়। একথা অবশ্যই ঠিক, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো কোনো মৌলিক ভাবনা স্থাপন করার সামর্থ্য স্বর্ণকুমারীর ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রণালীকে তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করছেন, সাহিত্যের প্রণালীর সঙ্গে তার যেভাবে তুলনা করছেন, সাহিত্যের কল্পনার থেকে বিজ্ঞানের কল্পনা যে উচ্চতর—যেভাবে তা প্রতিষ্ঠা করছেন, তার স্পষ্টতা তাঁর বিজ্ঞানে গভীর প্রবেশ এবং অভিনিবেশেরই সাক্ষ্য দেয়। এই সম্পাদকীয়তে স্বর্ণকুমারী এও জানিয়েছিলেন, বিজ্ঞানের মাত্রা যে তিনি বাড়াতে চান পত্রিকায়, তা বিশেষভাবে 'ভারতবর্ষীয় মহিলাগণ'-এর কথা ভেবে যাঁরা বিদেশীভাষা জানেন না বলে 'বর্তমানকালের বিজ্ঞান-শিক্ষা করিতে অপারগ'। উনিশ শতকের নারীশিক্ষা আলোচনায় এইভাবে স্বর্ণকুমারী আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষার কথাও নিয়ে এলেন, যার প্রয়োজনীয়তা দূরে থাক, যে বিষয়ে প্রশ্ন তোলাও পুরুষেরা অনাবশ্যক বোধ করতেন।

৩.

নারীশিক্ষা-আলোচনা স্বর্ণকুমারী-সম্পাদিত 'ভারতী'তে শুরুতেই স্থান পেয়েছিল। লেখক-নামহীন 'বর্তমান শিক্ষা' নামে প্রবন্ধটিতে বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষাই ছিল আলোচ্য বিষয়। আর সেই কারণেই, হয়তো অনুমান করা যায়, স্বয়ং সম্পাদিকাই লিখেছিলেন প্রবন্ধটি। শুধু নারীশিক্ষাই নয়, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত প্রথম বছরের 'ভারতী'-তে বাল্যবিবাহের মতো সমাজ-প্রথা নিয়ে বিতর্কও স্থান পেয়েছিল। প্রথম প্রবন্ধটি রসিকলাল সেনের, যিনি মূলত বাল্যবিবাহের পক্ষেই ওকালতি করেছেন। তাঁর মতামতের বিরোধিতা করে প্রবন্ধ লিখেছেন হরকালী সেন। বাল্যবিবাহ

বিষয়ে এসব বাদ-প্রতিবাদে উনিশ শতকের গণমানসেরই প্রতিফলন দেখি আমরা, যা চলে আসছিল 'ভারতী'র জন্মের অনেক আগে থেকেই। যুগ-প্রচলিত নারী-আলোচনাকে যে সম্পাদিকা 'ভারতী'তে স্থান দিলেন, মনে হয় তাঁর কাছে নারী-আলোচনার গুরুত্ব ছিল বলেই।

এই আলোচনা-সূত্রে আমরা পালটে-যাওয়া রবীন্দ্রনাথকেও পেয়ে যাই। 'সমস্যা' নামে একটি প্রবন্ধে তিনি বলতে চাইলেন—বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা—এসব প্রথা নিরোধ বা প্রচলন সকলের জন্য একই নিয়মে বাঞ্ছনীয় নয়। কারো পক্ষে ভালো, কারো পক্ষে ভালো নয়—সেই বিচারটার জায়গা থাকা উচিত : 'সকল অবস্থাতেই আইনপূর্বক বাল্যবিবাহ বন্ধ করিলে সমাজে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতে পারে। অবস্থা নির্বিচাবে বিবাহার্থিনী বিধবামাত্রেরই বিবাহ দিতে গেলে অস্বাস্থ্যজনক উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। স্ত্রী মাত্রেরই স্বাধীনতা দিতে গেলেই বঙ্গীয় সমাজকে অপদস্থ হইতে হয়।' রবীন্দ্রনাথের এই পুরুষতান্ত্রিক মতামতের সঙ্গে সম্পাদিকার কোনো টিপ্পনী নেই দেখে বেশ অবাক লাগে। রবীন্দ্রনাথের ইয়োরোপের চিঠির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ তো তার সমালোচনা করতে ভোলেননি! স্বর্ণকুমারীর মতো প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী নারীর পক্ষে কি স্বাভাবিক ছিল না এই প্রশ্ন তোলা—হঠাৎ মেয়েদের বেলাতেই এমনতরো সব বিবেচনার কথা তোলা হয় কেন? 'অবস্থা নির্বিচারে' বিবাহার্থী পুরুষ (বিপত্নীক শুধু নয়, সপত্নীকও বটে!) যে বিবাহ করতে পারছে, তাতে' কি কিছু কম 'অস্বাস্থ্যজনক উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত' হয়েছে সমাজে? 'স্ত্রী মাত্রেরই স্বাধীনতা দিতে গেলেই' যদি 'বঙ্গীয় সমাজকে অপদস্থ হইতে হয়', তাহলে পুরুষ মাত্রেরই স্বাধীনতাও হরণ করা হয় না কেন, আলালের ঘরের দুলালরা তো 'বঙ্গীয় সমাজ'কে অপদস্থ করতে বিন্দুমাত্র লজ্জাও বোধ করে না। বাল্যবিবাহ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি সবচেয়ে বিস্ময়কর, বাল্যবিবাহর কুফল বিষয়ে তো তাঁর অন্তত ওয়াকিবহাল না থাকার কথা নয়। বাল্যবিবাহরই ফল বিপুল সংখ্যক বালিকা বিধবা, 'সমাজে দুর্নীতি'র তো সেটা যথেষ্ট বড় কারণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কন্যাদের বাল্যবয়সেই বিবাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু স্বর্ণকুমারী তো তা করেননি। তাই মনে হয় না রবীন্দ্রনাথের মতামত সম্পাদিকারও মতামত। এমন হতে পারে তিনি আলোচনাটি চালিয়ে যেতে চেয়েছেন, নিজেকে নিরপেক্ষ নীরবতায় রেখে।

১২৯১-৯২ সালের ভারতীতে নারী-আলোচনায় ঠাকুরবাড়ির যে পুরুষটির রবীন্দ্রনাথের খুব বিপরীতে অবস্থান ছিল, তাঁর নাম সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সরাসরি এসব সামাজিক প্রথা নিয়ে তিনি অবশ্য কোনো প্রবন্ধ লেখেননি, তিনি লিখেছিলেন 'প্রবাস পত্র' নাম দিয়ে মহারাষ্ট্রের নারীসমাজের রীতিনীতির কথা, আর তুলনায় থাকছিল বাঙালি সমাজ-প্রসঙ্গ। যেমন, বোম্বাইতে 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' দেখে তাঁর নতুন লেগেছে, ভালো লেগেছে আর সেইসঙ্গে তাঁর মনে জেগেছে বঙ্গীয় সমাজের 'অন্তঃপুর-প্রথা' : 'বলিতে কি অন্তঃপুর প্রথা আমার নিতান্ত অনিষ্টকারী কুপ্রথা বলিয়া মনে হয়, তাহাতে অবলাদের নিজের সুখ-স্বাস্থ্যের হানি, সামাজিক হানি। সমাজের অর্ধাঙ্গ অবরুদ্ধ ও বিকল হইলে অপরাধ কিরূপে সুশিক্ষিত, সুস্থ, সবল হইতে বল।...অবলাকে অন্তঃপুর-রুদ্ধ নিতান্ত 'অবলা' করিয়া রাখিলে কখনই আমাদের জাতীয়-ভীরুতা দূর হইবে না।' যে লেখা থেকে এই উদ্ধৃতি, সেটি প্রকাশিত হয়েছে ১২৯১ সালের চৈত্রমাসে। সে লেখায় জাতিভেদ-প্রথা, বাল্যবিবাহ-প্রথা, চির-বৈধব্য প্রথা ইত্যাদি নানারকম সামাজিক প্রথার সমালোচনা আছে, কিন্তু ১২৯২-এর জ্যৈষ্ঠমাসে প্রকাশিত 'প্রবাসপত্র'তে তিনি বাল্যবিবাহ বিষয়ে তর্কেই যোগ দিচ্ছেন সরাসরি। বিবাহ-বিষয়ে দুটি শর্ত দিচ্ছেন সত্যেন্দ্রনাথ—(১) 'দম্পতি যোগ্য বয়সে

জানিয়া-শুনিয়া ইচ্ছাপূর্বক বিবাহ করিবে'। (২) 'স্ত্রী-পুত্র ভরণ-পোষণের সামর্থ্য বুঝিয়া পুরুষ দারপরিগ্রহ করিবে।' এ শর্তদুটির বিরোধিতা কেউ আর করেননি বলে ধরে নেওয়া যায় বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত আলোচনায় এই শর্তদুটি মেনেই নেওয়া হয়। এই মাসেই রসিকলাল সেন 'বিধবাবিবাহ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, তাঁর 'বাল্যবিবাহ' বিষয়ে আলোচনার থেকে এ লেখার সুর অনেকটাই আলাদা, এখানে তিনি বিবাহ বিষয়ে 'বিধবাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা' দেওয়া কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছেন। 'ভারতী'র নারী-আলোচনার প্রভাবই এই সুর-বদলের কারণ—এমন অনুমান হয়তো অসঙ্গত মনে হবে না।

১২৯৪ সাল পর্যন্ত 'বিবাহ'-সংক্রান্ত নানারকম আলোচনা 'ভারতী'র পাতায় দেখা যায়, সম্পাদিকা যাদের বলতে চান 'সামাজিক প্রবন্ধ', যে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য : 'জনসাধারণের ক্ষণস্থায়ী মতের স্রোতে না ভাসিয়া যুক্তিদ্বারা সামাজিক গতিবিধি নির্ণয় করা।' ১২৯২-এর সম্পাদকীয়তে একথা বলেছিলেন স্বর্ণকুমারী, বলেছিলেন যে কোনো একটি 'প্রস্তাবিত বিষয়' নিয়ে 'তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে নানারূপে দেখা'-র আবশ্যকতার কথা। সেই 'আবশ্যকতা'-বোধেরই ফল বিবাহ-সংক্রান্ত আলোচনাগুলি। 'পঠদ্দশায় বিবাহ', 'বিবাহ', 'নিকট সম্পর্কে বিবাহ', 'বিবাহের জন্য পূর্ব অনুরাগ আবশ্যক কি না', 'হিন্দু বিবাহ' ইত্যাদি শিরোনামে নানা দিক থেকে দেখা হয়েছে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতিকে। এর মধ্যে 'হিন্দু বিবাহ' নামে প্রবন্ধটির লেখক রবীন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে এটি লেখা। চন্দ্রনাথ বসু দুটি প্রবন্ধে হিন্দু পত্নীর আদর্শ, হিন্দু বিবাহের নির্দিষ্ট বয়স, তার উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। বোঝা যায়, 'ভারতী'তে যে বিবাহ বিষয়ে এতরকম আলোচনা করা হচ্ছিল, তখনকার সমাজে নানাভাবে সেসব আলোচনা চালু ছিল বলেই।

কিন্তু নারীশিক্ষা আলোচনায় স্বর্ণকুমারী এমন কিছু প্রসঙ্গ আনলেন, যা সে সময়ের চালু আলোচনাগুলির অন্তর্গত নয়। ১২৯২ সালেই প্রকাশিত হয়েছিল 'একটি প্রস্তাব' নামে তাঁর একটি লেখা, যে লেখা মূলত 'সখিসমিতির'ই ইস্তেহার, আর 'সখি-সমিতি' ব্যাপারটাই তো বাঙালি সমাজে তখন একেবারেই নতুন। এই লেখাতে স্বর্ণকুমারী স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন পুরুষের জীবনে ঘরের শিক্ষার গুরুত্বের দিক থেকে। মেয়েলি গুণ বলে চিহ্নিত গুণগুলি যে আসলে মানুষেরই গুণ, পুরুষেরও সেসবের দরকার আছে, মেয়েদের নিন্দা-প্রশংসা যে পুরুষের কাজকে নির্ধারিত করে—স্বর্ণকুমারীর এসব অভিমত নারীশিক্ষা আলোচনায় নিতান্তই নতুন। শিক্ষা বলতে তিনি নিছক লেখাপড়া শেখার কথা ভাবেননি, মেয়েদের জীবনযাপনের পুরো ছাঁদটি যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা দাবি করে, স্বর্ণকুমারী সেই শিক্ষার কথা বলছিলেন : 'বর্তমান সমাজের যেরূপ বিপ্লবের অবস্থা, কালের স্রোতে যেরূপ সকলদিকে সকলে ভাসিয়া চলিয়াছেন তাহাতে দেশের উপযোগী করিয়া, দেশীয় ভাবের সহিত সাম্য রাখিয়া পুরাতন আচার-ব্যবহার কিছু কিছু ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া পিটিয়া না লইলে চলিতে পারে না।' 'পুরাতন আচার-ব্যবহার' বলতে সম্ভবত স্বর্ণকুমারী অবরোধ-এর কথা বলছে চেয়েছেন এখানে, যে প্রথা পালটানো দরকার। মেয়েদের বাইরে বেরোতে হবে, কিন্তু সেজন্যে যথাযথ পোশাক প্রয়োজন। সেইসঙ্গে শিখতে হবে পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে। প্রথমে মেয়েদের সঙ্গেই মেলামেশা করতে শেখা দরকার পরিবার-গণ্ডির বাইরে, তারই জন্য সখিসমিতি। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশাও যে শিক্ষার ব্যাপার, সেখানেও শোভনতার প্রয়োজন—নারী-শিক্ষা আলোচনায় এসব প্রথম বলা হলো। ১২৯৩ সালে স্বর্ণকুমারী লিখলেন 'আর একটি প্রস্তাব'। এ লেখাটিও সখিসমিতির সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু এখানে

নারীশিক্ষা আলোচনায় আরেকটি মাত্রা যোজিত হলো—দেশানুরাগ মাত্রা, বলা হলো : 'যে শিক্ষায় স্ত্রীলোকেদের মনে হিন্দুভাব বজায় রাখিয়া দেশানুরূপ প্রজ্বলিত করিয়া দিতে পারে, সেই শিক্ষাই এখন সর্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক। স্ত্রীলোকের মনে প্রবল দেশানুরাগ প্রজ্বলিত হইলে তাহা অতিদ্রুত দেশময় ছড়াইয়া পড়িবে।...হিন্দু বিধবারা যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া মূর্তিমতী দেশানুরাগের ন্যায় অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করুন...ইহাতে তাঁহাদের বৈধব্যোচিত ধর্মপালন হইবে।'—এ কথাগুলি নিছক স্বর্ণকুমারীর একলার কথা নয়। উনিশ শতকের শেষ ভাগে বাঙালি মানসিকতায় নারী-আলোচনার সঙ্গে যেভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে জড়ানো হয়েছিল, বিধবার ব্রহ্মচর্যের কঠোরতাকে যেভাবে হিন্দুত্বের মহিমায় মহিমান্বিত করা হয়েছিল—এ কথাগুলি অনেকটাই তো তারই প্রতিধ্বনি! তবু, 'স্ত্রীলোকের মনে প্রবল দেশানুরাগ প্রজ্বলিত হলে যে তা অতিদ্রুত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে—স্বর্ণকুমারীর এই বিশ্বাস, মেয়েদের ক্ষমতার উপর এই বিশ্বাস, তাঁর নিজেরই।

৪.

কিন্তু ১২৯৫ সালের শুরুতেই 'ভারতী'তে এমন একটি লেখা প্রকাশ পেল, যা উনিশ শতকের নারী-আলোচনায় যুগান্তর সূচনা করে। আর নারীশিক্ষা নিয়ে আলোচনা কিংবা নারী-সম্পর্কিত সামাজিক রীতিনীতির আলোচনা নয়, এ লেখায় প্রশ্ন তোলা হল নারী-পুরুষের সমতা নিয়ে। অধিকারের সমতা নিয়ে প্রশ্ন আগেও উঠেছে, এবারে সামর্থ্যের সমতা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। লেখাটির শিরোনাম—'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব'। লেখিকা—স্বয়ং স্বর্ণকুমারী। আজকের দিনে পুরুষ যে বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞানে নারীর থেকে শ্রেষ্ঠ—একথা মেনে নিয়ে স্বর্ণকুমারী বলতে চেয়েছেন এ শ্রেষ্ঠতার মূলে রয়েছে নারীর সুদীর্ঘকালব্যাপী সামাজিক অবদমন। সে অবদমন যদি সরিয়ে নেওয়া হয়, যদি কিছুকাল মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে বিদ্যাবুদ্ধি চর্চার সুযোগ পায়, তার পরেই না ঠিক ঠিক শ্রেষ্ঠতার পরীক্ষা নেওয়া সঙ্গত হবে। আসলে এই সমতার প্রশ্ন তখন পশ্চিমে নারী-আন্দোলন সূত্রে নানাভাবে আলোচিত হচ্ছে, বাদানুবাদ চলছে। তার কিছু কিছু স্বর্ণকুমারী এ প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধের সঙ্গে নাইন্‌টিনথ সেঞ্চুরি পত্রিকাতে প্রকাশিত জে. রোমানিস-এর 'স্ত্রী ও পুরুষের মানসিক পার্থক্য' নামে একটি লেখা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতিও রেখেছেন স্বর্ণকুমারী। সে উদ্ধৃতিতে 'so called woman's movement'-এর কথা আছে, বলা আছে—এ যুগে তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির অন্যতম বলে বিবেচিত হবে। এ আন্দোলনের প্রভাব যে পুরুষদের উপরেও পড়বে, একথাও লেখাটিতে বলা আছে, বলা আছে এর প্রভাব পড়বে—'not only in the nursery and the drawing-room, but also in the study, the academy, the forum, and the senate'. এইভাবে স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত 'ভারতী'তেই সম্পাদিকা স্বয়ংই প্রথম বাংলা আলোচনা-জগতে পশ্চিমী নারীবাদ এবং নারী-আন্দোলনের কথা হাজির করলেন।

এই প্রবন্ধটিতে স্বর্ণকুমারী রোমানিস-এর মত এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেকটাই আলোচনা করেছেন। সে-সূত্রে তিনি রোমানিস-এর একটি পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন—মেয়েদের মস্তিষ্কের ওজন পুরুষের তুলনায় ৫ আউন্স কম। পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তি এই কারণেই, তাঁর মতে মেয়েদের তুলনায় প্রখরতর। এ বিষয়ে স্বর্ণকুমারী নিজের কোনো মতামত দেননি

এ প্রবন্ধে। কিন্তু পরের মাসেই 'ভারতী' পত্রিকার 'মস্তিষ্কভার' নাম দিয়ে গোটা একটা প্রবন্ধই প্রকাশিত হল, যার বিষয়বস্তু অধ্যাপক রোমানিস-এর এই মতকে খণ্ডন করা। অবশ্য লেখিকা নিজে তা করতে পারেননি, মিস ফ্রান্সেস কর নামে ইংল্যান্ডের কোনো বিদুষী মহিলা তা করেছেন, আর স্বর্ণকুমারী তাকে বাংলা ভাষায় পরিবেশন করা জরুরি মনে করেছেন। মস্তিষ্কের ক্ষুদ্রতা যে বুদ্ধির ক্ষুদ্রতা প্রমাণ করে না, মিস কর তা নানাভাবে প্রমাণ করেছেন। তাঁর একটি যুক্তি হলো—অসামান্য বুদ্ধিসম্পন্না মিসেস সমারভিলের মাথাটি ছিল নিতান্তই ছোটো। এই লেখার সঙ্গে সম্পাদিকা মিসেস সমারভিলের পরিচয়ও দিতে ভোলেননি। ইনি উনিশ শতকের একজন 'বিজ্ঞানবিদ্ রমণী'। সূর্যকিরণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ইনি বিজ্ঞানজগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। এমন একজন নারীর পরিচয় জ্ঞাপন করতে পেরে স্বর্ণকুমারী যেন আরেকভাবে প্রকৃতি-বিরোধী বিজ্ঞান আর প্রকৃতিময়ী নারীর সমাজ-প্রতিষ্ঠিত বিপরীতমুখিতাকে অস্বীকার করতে চাইলেন।

৫.

'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব' এবং তার পরিপূরক লেখা 'মস্তিষ্কভার'-এর মধ্যে দিয়ে ইংরেজ লেখক রোমানিস-এর মত ও সিদ্ধান্তের সমালোচনা কিংবা প্রতিবাদ আসলে পুরুষতন্ত্রের লিঙ্গরাজনীতিরই প্রতিবাদ। কিন্তু একই বছরে, 'ভারতী'র পাতায় স্বর্ণকুমারীর প্রতিভাবান ভাইদের কোনো কোনো লেখায় লিঙ্গরাজনীতি বেশ খোলাখুলিভাবেই প্রকাশ পাচ্ছিল। 'সে কালের ইংরাজ স্ত্রী' নামে একটি লেখায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছিলেন—নারীর প্রতি অত্যাচার শুধু যে এ দেশে আছে এমন নয়, ইংরেজরাও সেকালে নারীনিগ্রহে দড় ছিল। সেইসঙ্গে নারীচরিত্র হননেও তাদের আগ্রহ কম ছিল না। অন্যদিকে ইংরেজ মেয়েদেরও স্বভাবে ছিল ক্রোধান্ধতা। এই সম্বন্ধে কোনো প্রসিদ্ধ ইংরেজ পণ্ডিতের মতামত জ্ঞাপন করে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলছেন—'এইরূপ মেজাজ বিগড়াইবার কারণও বোধহয় কতকটা পুরুষের অত্যাচার। আমরা দেখিতে পাই ছেলেদিগকে পিতামাতারা যখন এক-এক সময়ে অনিয়মিত আস্কারা দেন ও অকারণ প্রহার করেন তখন সেইসকল ছেলে বিগড়াইয়া যায়—মানবপ্রকৃতির নিয়মই এইরূপ। অর্থাৎ আপনার খেয়াল অনুসারে প্রভু যদি দাসের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করেন (অকারণে রুষ্ট ও অকারণে তুষ্ট হন), তাহা হইলে সেই দাসবৎ অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে কখনই তাহার চরিত্র প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে না। স্ত্রী যতদিন স্বামীর কষাঘাতের শাসনে থাকে ততদিন কখনই সে স্বামীর সখী ও সঙ্গিনীর পদবাচ্য হইতে পারে না।'—এই কথাগুলিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অত্যাচারিতা নারীর প্রতি সহানুভূতিই প্রকাশ করতে চাইলেন, অথচ পিতামাতা-ছেলেমেয়ে কিংবা প্রভু-দাসের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধের সমান্তরাল টেনে তিনি এ সম্পর্কের রাজনৈতিক চরিত্রই উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন। প্রভু ক্ষমতাবান আর দাস ক্ষমতাহীন, কিন্তু তাই বলে দাসের প্রতি অত্যাচার করা প্রভুর শোভা পায় না। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। একেই, Sexual Politics বইতে কেট মিলেট বলেছেন, 'শিভালরাস' মনোভঙ্গি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো রবীন্দ্রনাথেরও ছিল মেয়েদের বিষয়ে এই 'শিভালরাস' মনোভঙ্গিই। 'রমাবাঈ-এর বক্তৃতা উপলক্ষে পত্র'তে তিনি তাই যে মারাঠী বীরপুরুষেরা রমাবাঈ-এর বক্তৃতাসভা পণ্ড করে দিতে চেয়েছিল তাদের নিন্দা করলেও সেইসঙ্গে রমাবাঈ-এর বক্তব্যের তীব্র কঠোর

সমালোচনা করেন। মেয়েরা সব বিষয়েই পুরুষের সমান, কেবল মদ্য পানে নয়—রমাবাঈ-এর এই মন্তব্যই রবীন্দ্রনাথের উষ্মার কারণ। বোঝা যায়, 'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব' কিংবা 'মস্তিষ্কভার'-এর আলোচনা রবীন্দ্রনাথের কাছে কোনো মানই পায়নি। রবীন্দ্রনাথের এই লেখার প্রতিবাদ করে স্বর্ণকুমারী লিখলেন 'রমাবাঈ' নামে প্রবন্ধটি, যেখানে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করা হলো পুরুষ-স্ত্রীর প্রভু-দাস সম্পর্কের, বলা হলো—'কেবল দাস্যবৃত্তি ছাড়া তাহাদের (স্ত্রীলোকের) জীবনের গুরুতর উদ্দেশ্য আছে—নিজে মানুষ হইতে এবং অন্যকে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর করিতে তাহারও অধিকার আছে।'

বস্তুত, 'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব'তে যে নারী-আলোচনা শুরু হয়েছিল, তারই জের চলছিল রবীন্দ্রনাথ এবং স্বর্ণকুমারীর রমাবাঈ-এর বক্তৃতাসূত্রের লেখাদুটিতে। নারী-পুরুষের যে সমতার কথা বলতে চেয়েছিলেন 'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব' প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারী, রমাবাঈও তাঁর বক্তৃতায় সেই সমতার কথাই বলেছিলেন, আর তাতে বিরক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন মেয়েদের ধারণাশক্তি থাকতে পারে কিন্তু সৃজনীশক্তি নেই পুরুষের মতো। তার প্রতিবাদ করলেন স্বর্ণকুমারী ইংরেজ মহিলা ঔপন্যাসিকের শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টান্ত দিয়ে। স্বর্ণকুমারী রমাবাঈকেও স্ত্রী-পুরুষ সমতার নজির হিসেবে উপস্থিত করলেন, কিংবা আরেকটু এগিয়ে পুরুষের তুলনায় রমাবাঈ-এর শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন করতে চাইলেন : 'রমাবাঈয়ের মুখে একথা অশোভন নহে, বিশেষ স্ত্রীলোক যে বহিঃপ্রকৃতির সহিত সংগ্রামে সমর্থ, রমাবাঈয়ের নিজের জীবনই যখন তাহার একটি দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশের কোন পুরুষ তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে প্রণোদিত হইয়া সাতসমুদ্র ত্রয়োদশ নদী পারে গিয়া স্বকার্য সিদ্ধি করিয়া আসিয়াছেন?'

'রমাবাঈ' নামে স্বর্ণকুমারীর লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসে, আর ঐ বছরই ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হলো কৃষ্ণভাবিনী-এর 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ' নামে প্রবন্ধ, যাকে নারী-আলোচনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সুদীর্ঘ এই প্রবন্ধে নারী-পুরুষ সমতার ধারণাকে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করে প্রতিষ্ঠা দেবার প্রয়াস ছিল। পুরুষের গুণ এবং নারীর গুণ যে প্রকৃতপক্ষে সামাজিক নির্মিতি, লেখিকা সেদিকে গুরুত্ব দিয়েছেন আলোচনায়। মনে রাখা দরকার, আজকের দিনে আমাদের মধ্যে যে স্ত্রীলিঙ্গ-নির্মাণ নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলে, তার সূত্রপাত 'ভারতী'র পাতায় একশো বছর আগেই ঘটেছে। স্বর্ণকুমারীর সম্পাদক-পদ ছাড়া কি এ লেখা প্রকাশ পেতে পারতো, যে লেখায় বলা হয়েছে : 'স্ত্রীজাতি কেবল পুরুষের জন্যই সৃজিত হইয়াছে, ও ঐ উদ্দেশ্য ব্যতীত উহাদের জীবনের অন্য কোন অভিপ্রায় থাকিতে পারে না, এই অসভ্য ও ঘৃণিত ধারণা স্ত্রীদের সংসারে সাম্যজ্ঞান ও সম-অধিকার লাভের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ও সাংঘাতিক বাধা।'

কৃষ্ণভাবিনীর এই লেখা যে পুরুষ-প্রতাপে আঘাত দেবে, প্রতিবাদ উঠবে—এ তো অনুমান করাই যায়। ১২৯৭-এর বৈশাখের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হলো স্ত্রী ও পুরুষ বিষয়ে দুটি লেখা। একটি 'শ্রী যোঃ' স্বাক্ষরিত, অন্যটি বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে। বলেন্দ্রনাথের লেখাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রমাবাঈ-এর বক্তৃতা উপলক্ষে লেখাটির এতটাই মিল যে, মনে হয় বলেন্দ্রনাথের বকলমে রবীন্দ্রনাথেরই লেখা সেটি, অন্তত পুরোটা না হোক, সে-লেখার অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের কলম চালানো। দুটি লেখাতেই কৃষ্ণভাবিনীর নাম না করে তাঁর মতামতের বিরোধিতা করা হয়েছে, নারী-পুরুষের পৃথক গুণ পৃথক ক্ষেত্রের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। নারী-পুরুষের সমতার প্রশ্নটিকে এঁরা নস্যাৎ করতে চেয়েছেন।

'ভারতী' পত্রিকায় নারী-আলোচনাকে এরপর যিনি প্রসারণ দিলেন, তিনি কিন্তু কোনো নারী নন, পুরুষ। ১২৯৭ সালেই পৌষ মাসে প্রকাশিত সীতানাথ নন্দীর 'রমণীর শিক্ষা ও কার্য' লেখাটিতে এমন সব কথা রয়েছে, যা সে-যুগের কোনো পুরুষের কাছ থেকে শুনতে পাব— এ যেন ভাবনারও অতীত। ইনি মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন, যা তখন পুরুষদের মুখে বড় একটা শোনা যেত না। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, ইনি মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলেছেন : 'যতদিন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না লাভ করবেন, ভাতের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হবেন, ততদিন তাঁদের স্বাধীন বলার চেয়ে তীব্র ব্যঙ্গোক্তি আর কি হইতে পারে?' মেয়েদের রাজনৈতিক অধিকার থাকার আবশ্যকতার কথাও এই লেখায় রয়েছে। নারী-পুরুষের বৈষম্যের উপর যাঁরা জোর দেন, তাঁরা মেয়েদের মাতৃত্বের দোহাই দিয়ে থাকেন, রবীন্দ্রনাথের বহু লেখাতে এর নজির আছে। কিন্তু বাস্তব সত্যি কি এটাই নয় যে, শুধু স্তন্যদান ছাড়া আর সব কাজই বাবা-মা দুজনেই করতে পারেন? সীতানাথ নন্দী তাঁর লেখায় এই সত্যের কথাই বললেন। মেয়েদের জীবিকা-অর্জনের প্রশ্নে যাঁরা বিরোধিতা করেন, তাঁদের বক্তব্য—বাইরে বেরোলে মেয়েলি গুণগুলি, যেমন কোমলতা দয়ামায়া ইত্যাদি কমে যাবে মেয়েদের মন থেকে। সীতারাম নন্দী একেও ভ্রান্ত বলে জানালেন। সমাজের এক দ্বিমুখী রীতি নির্দেশ করলেন এই লেখক—মেয়েলি এসব গুণকে সমাজ একদিকে অবজ্ঞা করে, অন্যদিকে চায় মেয়েদের মধ্যে থাকুক এ গুণগুলি।

সীতানাথ নন্দীর এই লেখাটি প্রমাণ দিচ্ছে পুরুষমাত্রেই স্বাধীনচেতা আধুনিক মেয়েদের শত্রু বলে মনে করে না। এ কথাটা বলতে হলো এইজন্যে যে, কৃষ্ণভাবিনী 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ' প্রবন্ধে এই শত্রুভাবের কথাই বলেছেন : 'আজকাল স্ত্রীজাতির সাধারণ শিক্ষা ও উন্নতির প্রতি পুরুষদের ঘৃণা বা উপহাসের ভাব চলিয়া গিয়াছে কিম্বা যাইতেছে, কিন্তু তাহার পরিবর্তে এক ভয়ংকর শত্রুভাবের উদয় রইয়াছে।' 'ভারতী' পত্রিকায় তথা বাঙালি সমাজের নারী-আলোচনায় মেয়েদের তরফ থেকে কিন্তু কখনোই কোনো পুরুষ-বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি। যদিও পুরুষের আচরণের সমালোচনা যথেষ্টই করেছেন তাঁরা। এই সূত্রে ১২৯৮ সালের একটি লেখা উল্লেখ করব, যার শিরোনাম 'প্রেম', লেখকের নাম নেই। অনুমান করতে পারি স্বর্ণকুমারীরই লেখা এটি, কেননা তাঁর অনেক লেখায় যেমন দীর্ঘ ইংরেজি উদ্ধৃতি দেখি, এ লেখাটিতেও তেমনি আছে। উনিশ শতকের নারী-আলোচনায় এ লেখাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, 'চিত্রাঙ্গদা'-র যে-পংক্তিগুলি আজকে নারীবাদ-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করা হয়, সে-পংক্তিগুলি উক্ত লেখাটিরই প্রতিধ্বনি। শুধু নারীবাদ-গবেষণার জন্য নয়, রবীন্দ্র-গবেষণার কথাও মনে রেখে লেখাটি থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে চাই : 'জনসাধারণের সঙ্গে সঙ্গে রমণীগণও মস্তকোত্তোলন করিতেছেন, তাহারা আর পুরুষের সবল হস্তের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহাদের শুদ্ধ সেবাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা পুরুষের শীর্ষস্থ দেবী হইয়া পূজা গ্রহণ অপেক্ষা নিজের পায়ের উপর নির্ভর করিয়া পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সংসার সমরাঙ্গণে অগ্রসর হওয়া অধিক গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেছেন।...এই নারীপূজা কি প্রকৃত পূজা? না ভ্রান্তি? না, উৎকোচ? পুরুষ কি প্রকৃতপক্ষেই রমণীদের আপনাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীব বলিয়া মনে করেন?...যদি তাহাই হবে, তবে যখন জ্ঞানক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে রমণী পুরুষের সমকক্ষভাবে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন, তখন আপত্তির হস্ত উত্তোলিত হয় কেন? যে শ্রেষ্ঠ, তাহাকে আমরা সমান হইতে দিতে অনিচ্ছুক কেন? ইহার সদর্থ সহজেই

অনুমেয় ..যাঁহারা রমণীকে এই বিগতযুগের আদর্শক্ষেত্রে দণ্ডায়মানা রাখিয়া মৌখিক পূজা দিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে আজও রমণীর মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই ; আর যে রমণী পূজাতে সন্তুষ্ট, তিনিও আপনার প্রকৃত অধিকার, আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিতে পান নাই। রমণী পুরুষের পদপ্রান্তস্থিতা দাসীও নহেন, শীর্ষস্থা দেবীও নহেন,—তিনি পুরুষের পার্শ্বস্থ সখী। তাঁহারা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পরস্পরের সর্বপ্রধান বন্ধু, সর্বপ্রধান সহায়। তাঁহারা উভয়েই স্বাধীন, স্বতন্ত্র ব্যক্তি, অথচ প্রেমের সুমধুর বন্ধনে উভয়ে মিলিয়া এক, কেহ ছোট. কেহ বড় নাই, উভয়েরই সমান।' 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যের কয়েকটি পংক্তি যে এই লেখ থেকেই নেওয়া—এ তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। তবু, প্রেমের যে আদর্শ এখানে ব্যক্ত হচ্ছে, 'চিত্রাঙ্গদা'য় তা নেই, সেখানে 'চিত্রাঙ্গদা' অর্জুনের সমান বলে নিজেকে ভাবতে পানি, নিজেকে 'দাসী' বা 'সেবিকা' বলেছে সে। 'ভারতী'র নারী-আলোচনা যে সমতার স্ব দেখেছে, রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' সেখানে পৌঁছতে পারেনি।

এই সমতা যে স্বর্ণকুমারীর স্বপ্ন, এই সমতার ভিত্তিতে স্থাপিত নারী-পুরুষ সম্বন্ধ যে কুমারীর কাম্য—তা বুঝতে পারি কিছু কিছু বই-আলোচনা পড়েও। বিনয়কুমারী বসু নামে বালিকার লেখা কাব্যগ্রন্থ আলোচনা সূত্রে মেয়েদের কবিতা বিষয়ে উচ্ছ্বাস তো সেই স্বপ্নেরই চায়ক, লেখকের নাম না থাকলেও তাই স্বর্ণকুমারীর 'কলম চিনে নিতে আমাদের ভুল হয় : 'বিজ্ঞান জগতে বৈদ্যুতিক আলোকের ন্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য জগৎ সহসা এক অপূর্বালোকে সিত। পূর্বে কবিত্বজগতে পুরুষদিগেরি একাধিপত্য দেখা গিয়াছে এমনকি আমাদের শ্রেষ্ঠ ষাতেও কবি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ পর্যন্ত নাই তা বঙ্গভাষার কি কথা? সহসা ভাষার অর্থবিপর্যয় ইয়া তদ্দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের এবং দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই নেকগুলি রমণী অভ্যুদিত হইয়াছেন।' তখনকার রমণীকবিদের এত সম্মান আর কে দিয়েছে? গলচিত্র' নামে একটি উপন্যাসে আদর্শহীন এবং আদর্শ বধূর চিত্র রচনা করা হয়েছে। তার আলোচনা করতে গিয়ে লেখক রচিত আদর্শ বধূ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, নামহীন এই লেখাটিও স্বর্ণকুমারীর বলে অনুমান করি, কেননা এই আলোচক আদর্শ বধূর স্বামী-প্রেমকে কুক্কুরবৃত্তিপরায়ণতা' আখ্যা দিয়েছেন, এবং তাকে কাম্য বলেও মনে করেননি : 'স্বামীকে ভক্তিশ্রদ্ধা করা ভালো, কিন্তু সেইসঙ্গে স্বামীর জঘন্য অন্যায়াচরণের প্রতিও কি শ্রদ্ধাবতী হওয়া ভাল? তাহাতে কার মঙ্গল? স্বামীর, স্ত্রীর, না সমাজের? প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজের এরূপ হীনাবস্থা হইত না, যদি রমণীগণ তাঁহাদের সহৃদয়তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যায়ের প্রতি, অমনুষ্যোচিত আচরণের প্রতি অশ্রদ্ধাবতী, ন্যায়ানুরাগী, ওজস্বিনী হইয়া পুরুষদিগের হীনকর্মের বাধা দিতে সক্ষম হইতেন। সেই রমণীই আদর্শ রমণী, যিনি পুরুষকে মনুষ্যত্বে হাত ধরিয়া উঠাইতে সর্বদা সচেষ্ট সক্ষম।'—এসব কথা 'যুগলচিত্র'কে উপলক্ষ করে বলা হলেও আসলে নারী-পুরুষের সম্বন্ধের আদর্শকেই ব্যক্ত করতে চাওয়া।

নারীবাদের একটা প্রধান দিক—নারী-পুরুষ সমতার ভাবনা, যা স্বর্ণকুমারীর লেখায় এবং তাঁর সম্পাদিত কাগজে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, উনিশ শতকে তা অদ্বিতীয়ই। কিন্তু নারীবাদের একটি অন্য দিকও আছে, সে হলো নারীজাতির প্রতি সহানুভূতি—তার মঙ্গল-ইচ্ছা। স্বর্ণকুমারীর 'সখিসমিতি'র মূল কথা ছিল এইটেই। সখিসমিতির নানান কার্য এবং কার্যোদ্যমের খবর থাকতো ভারতীয় পাতায়, যার মধ্যে দিয়ে স্বর্ণকুমারীর নারীসমাজের জন্যে শুভেচ্ছা প্রকাশ পেত। এইদিকে তাঁর আদর্শ ছিলেন মহারাষ্ট্রের পণ্ডিতা রমাবাঈ। স্বর্ণকুমারী রমাবাঈ-

এর কথা, তাঁর কাজকর্মের বিবরণ নানাভাবে বলেছেন 'ভারতী'তে। 'রমাবাঈ' নামে লেখাটিতে তো বটেই, পুণা থেকে লেখা পত্রতেও (১২৯৮ মাঘ) রমাবাঈ-এর শারদাসদনের বিস্তারিত বিবরণ আছে, রমাবাঈ-এর একটি আলেখ্য আছে। এই লেখার শেষে স্বর্ণকুমারী বলছেন : 'হায়! বঙ্গে মহাত্মা পুরুষ উদয় হইয়াছেন সত্য, কিন্তু বঙ্গের মহাত্মা রমণী বঙ্গের রমাবাঈ কবে উদয় হইবেন? যিনি বঙ্গের নিরাশ্রিতদিগের দুঃখে হৃদয় শোণিতপাত করিতে সমর্থ হইয়া তাহাদিগের দুঃখ ক্ষালন করিতে পারিবেন! যতদিন না তাহা হইতেছে ততদিন হতভাগিনীগণ, তোমরা বুকফাটা কান্না কাঁদ, তোমাদের অশ্রু কেহ মুছাইবে না। ধন্য তুমি রমাবাঈ!' স্বর্ণকুমারী রমাবাঈ-এর সঙ্গে তুলনীয় নন ঠিকই, তবু, এই পংক্তিগুলিতে নারীসমাজের জন্যে যে বেদনাবোধ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর, তার জন্যেও বাংলার নারী-আলোচনার ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

১৯৯৯